হেমেন্দ্রলাল

পরিণয়-কাহিনী, সরমার সুখ প্রভৃতি প্রণেতা

শ্রীভবানীচরণ ঘোষ

প্রণীত

শ্রীগোপালচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

প্যারাগন যন্ত্রে

শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১৫

শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত

নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্,
শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের
পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

১। হেমেন্দ্রলাল (উপন্যাস)

উৎকৃষ্ট বাঁধাই সাত সিকা, ফ্যান্সি মলাট দেড় টাকা।

২। পরিণয়-কাহিনী (উপন্যাস)

দ্বিতীয় সংস্করণ

উৎকৃষ্ট বাঁধাই পাঁচ সিকা, ফ্যান্সি মলাট এক টাকা।

৩। সরমার সুখ (উপন্যাস)

উৎকৃষ্ট বাঁধাই পাঁচ সিকা, ফ্যান্সি মলাট এক টাকা।

৪। গীতি-কবিতা (কাব্য)

মূল্য ছয় আনা।

বিজ্ঞাপন

হেমেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে। ইতিহাসোক্ত কোন কোন চরিত্র এবং ঘটনার অবতারণা এই আখ্যায়িকায় দৃষ্ট হইবে। কিন্তু স্থানে স্থানে ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য রক্ষিত হয় নাই, কোন কোন স্থানে ইতিহাস অপেক্ষা কল্পনাই অধিক অনুসৃত হইয়াছে। সামাজিক চিত্র গ্রন্থকার সময়োপযোগী করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

১৩০৭ সনের বৈশাখ মাসে এই আখ্যায়িকা লেখা আরম্ভ হয়। ১৩০৮—৯ সনে অনেক দূর লিখিত হইয়া অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়াছিল। আজ সম্পূর্ণ অবস্থায় গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। দীর্ঘকাল পড়িয়া থাকায় অনেক দোষ, সুতরাং এ গ্রন্থে অনেক দোষ লক্ষিত হইবে।

কলিকাতা,
৫।২, জরিপ লেন ;
বৈশাখ, ১৩১৫ সাল।

গ্রন্থকার

যিনি জীবিত থাকিতে এই আখ্যায়িকার অতি অল্পাংশ-মাত্র লিখিত হইয়াছিল; যিনি তাহা পাঠ করিয়া এবং অবশিষ্টাংশ সংক্ষেপে আমার মুখে শুনিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন; যিনি এ দীনের কুটীর পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের আশীর্ব্বাদে স্বর্গবাসিনী হইয়াছেন; তাঁহার চিরমধুর পবিত্র নামে এই গ্রন্থ উৎসর্গ হইল।

গ্রন্থকার

হেমেন্দ্রলাল

প্রথম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

তখন হেমেন্দ্রলালের বয়স দুই বৎসর মাত্র। পিতা বিদেশে। মৃত্যু-শয্যাশায়িনী মাতার আধিক্লিষ্টা মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। জেষ্ঠ-তাতপত্নী মহামায়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে-ছেন। দুই বৎসরের শিশু—কিছু বুঝিতে পারে না, তথাপি যেন কোন ভাবী বিপদের আশঙ্কায় হেমেন্দ্রের কচি মুখ শুষ্ক ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠি-য়াছে। সেই অপরিমেয় স্নেহরাশি-মাখা শতকোটি অস্ফুট, অব্যক্ত সম্বোধন যে আর নাই; সংসারের সহস্র ভয়-ভীতি, দুঃখ-যন্ত্রণাপহারী সেই সুশীতল বক্ষে সেই কুসুমকোমল বাহুবিজড়িত আলিঙ্গন যে আর নাই, সেই অনিবারক্রম চুম্বনপরম্পরা যে আর নাই, সে সুখের নৃত্য সে আনন্দের হাসি যে আর নাই,—হরি! হরি!—আর যে থাকিবে না, শিশু কি তাহা বুঝিতে পারিয়াছে? হেমেন্দ্রলাল মাতার বিশীর্ণ বক্ষপ্রান্তে কপোল সংলগ্ন করিয়া রহিয়াছে।

মাতার জীবনদীপ নির্ব্বাণপ্রায়।

অতি ক্ষীণকণ্ঠে শয্যাশায়িনী বলিলেন;—

"দিদি, দেখা হইল না; আশা মিছা হইল।"

মহামায়া বলিলেন ;—

"নিরাশ হইও না, বোন, তিনি শীঘ্রই আসিবেন। তুমি সারিয়া উঠিবে।"

"না, দিদি, আর সে আশা নাই। আমি চলিলাম।" রোগিনী থামিলেন। তাঁহার জ্যোতিহীন চক্ষুতে অশ্রু দেখা দিল। তখন ক্ষীণ, কম্পিত কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন ;—

"আমি যাই ; হিমু তোমার হইল, দেখিও, দিদি !"

কিশলয়দলকোমল হিমুর হাত দুখানি ধরিয়া রোগিনী মহামায়ার হাতে দিলেন। মহামায়া শিশুকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। তখন মাতার আসন্নমৃত্যুমলিনমুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল।

কিছুকাল পরে দীপ নির্ব্বাণ হইল।

সে আজ অনেক দিনের কথা। মাতার মৃত্যুর এক বৎসর মধ্যেই হেমেন্দ্রলালের পিতারও অভাব হয়। কিন্তু জ্যেষ্ঠতাত ভৈরবচন্দ্র রায় ও জ্যেষ্ঠতাতপত্নী মহামায়ার অকৃত্রিম স্নেহে পিতৃমাতৃবিয়োগজনিত কষ্ট শিশু কখনও অনুভব করে নাই।

পূর্ব্ববঙ্গে জয়নগর গ্রামে ঘোষ বংশীয় কয়েক ঘর বঙ্গজ কায়স্থ বাস করিতেন। ইঁহারা জয়নগরের রায় বলিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভৈরবচন্দ্র রায়ের আমলে ইঁহাদের অবস্থা তত ভাল ছিল না। নবাবসরকারের প্রাপ্য খাজানা বাকী পড়াতে রায়দিগের অনেক ভূমি সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়া যায়। যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাতে কোনরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্রের লালন পালন শিক্ষায় ভৈরবচন্দ্র উদাসীন ছিলেন না। হেমেন্দ্রের জন্মের দুই বৎসর পূর্ব্বে মহামায়ার একটি পুত্র জন্মিয়াছিল। কিন্তু এক বৎসর বয়সের সময় মাতার ক্রোড় শূন্য করিয়া সে চলিয়া যায়। তাহার পর মহামায়ার

আর কোন সন্তান হয় নাই। দেবরপুত্রই মহামায়ার পুত্র হইল। হিমু তাঁহাকেই মা বলিয়া ডাকিত, এবং মা বলিয়া জানিত। পরে জ্ঞানোদয়ে যখন প্রকৃত কথা বুঝিয়াছিল, তখনও মহামায়াকে মাতার ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করিত, চিরকাল মা বলিয়া ডাকিত, এবং তাঁহার কাছেই যত কিছু আবদার করিত।

রায়মহাশয় হেমেন্দ্রের তৎসময়োচিত শিক্ষার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রলাল গুরুমহাশয়ের নিকট বাঙ্গলা লেখাপড়া, কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া নামতা প্রভৃতি গণিতবিদ্যা এবং মৌলবী সাহেবের নিকট পারস্য ও আরবীয় ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিল। অসামান্য মেধাসম্পন্ন বালক অল্প দিনের মধ্যেই শিক্ষনীয় বিষয়গুলি সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। এই মানসিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে আরও অনেক বিষয় শিক্ষা করিল। গ্রামের কোন বালক হিমুরায়ের সঙ্গে দৌড়িতে পারিত না, সাঁতারদিতে পারিত না, দুরারোহ বৃক্ষের অগ্রশাখায় উঠিতে পারিত না। অশ্বচালনায় হিমুরায় অদ্বিতীয়, নৌকাচালনায় অনেক প্রবীণ মাঝি হিমুর নিকট জব্দ হইত। ক্রমে কুস্তি, লাঠিখেলা, তলবার বন্দুক বর্শা চালনায় হিমুরায়ের অসাধারণ প্রতিপত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যেখানে ঝগড়া কলহ, মারামারি হাঙ্গামা, সেই খানেই দুর্ব্বল পক্ষের সাহায্যকারী হিমুরায়। এই সকল কার্য্যে হিমুর কায়মনোবাক্যে অনুসরণকারী তাহার ধাত্রীমাতা কল্যাণীর পুত্র রামমোহন। রামমোহনের কথা পরে হইবে। রায়মহাশয় অনেক সময় ভ্রাতুষ্পুত্রকে কঠোর শাসন করিতেন; কিন্তু মহামায়া হিমুর দোষ খুঁজিয়া পাইতেন না; ধাইমা কল্যাণী হিমুর কৃত সকল কার্য্যের সমর্থন করিত। সুতরাং জেঠা মহাশয় বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে হিমুরায়ের এই দুরন্তপনা বাড়িয়া উঠিল। স্নানের সময় স্নান নাই, আহারের সময় আহার নাই। যে কেহ হিমুরায়ের আশ্রয়ভিক্ষা করিত,

হিমুরায় তৎক্ষণাৎ তাহার সাহায্যে ছুটিত। ক্রমে গ্রাম ছাড়িয়া গ্রামান্তরে হিমুরায়ের প্রতাপ জারি হইতে আরম্ভ হইল।

রায়মহাশয় তাহার পর হিমুর 'দুরন্তপনা' দূর করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। উনিশবৎসর বয়সে হেমেন্দ্রলালের বিবাহ হইল। রায়মহাশয় বহু অনুসন্ধান করিয়া পরমাসুন্দরী লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বধূ করিয়া ঘরে আনিলেন; ভাবিলেন, কুসুমশৃঙ্খলে হিমুর দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি আবদ্ধ হইবে। লক্ষ্মীপ্রিয়ার বয়স তখন দশ বৎসর মাত্র, হেমেন্দ্র একদিন গভীর রাত্রিতে প্রদীপ জ্বালিয়া কলা পাতায় তাহাকে নীরবে 'ক' 'খ' শিখাইতে চাহিল। কিন্তু তাহার পুতুল খেলাই তখন শেষ হয় নাই। সুতরাং জেঠা মহাশয়ের উচ্চ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনেক বিলম্ব হইতে চলিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হিমুরায় বিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। পল্লীগ্রামে বাস করিয়া তাহার সলা সহবত, আদপ কায়দা কিছুই উচিত মত শিক্ষা হইল না। সাহসী সুচতুর, সবলকায় সুগঠন হিমুর নিশ্চেষ্ট হইয়া ঘরে বসিয়া থাকা ভাল দেখায় না। ঘরের অবস্থা ভাল নয়। বাহুতে বল থাকিলে এবং মাথায় মস্তিষ্ক থাকিলে সেকালে কাহারও অবস্থা খারাপ থাকিত না। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ মুপৈতি লক্ষ্মীঃ—একথা চিরকাল সত্য; কিন্তু আমরা যে আমলের কথা কহিতেছি, তখন উহার সার্থকতা যেন অধিক-তর নিশ্চয় ছিল। ভৈরবচন্দ্র রায় হিমুকে এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে

জাহাঙ্গীর নগর প্রেরণ করিলেন। জাহাঙ্গীর নগর (ঢাকা) তখন পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী এবং সমগ্র বঙ্গদেশ মধ্যে সমৃদ্ধি গৌরবে দ্বিতীয় সহর। জেষ্ঠতাত ভাবিলেন, রাজধানীতে হিমু নিজ ভাগ্য পরিবর্ত্তনের পথ নিজে আবিষ্কার করিতে পারিবে।

গ্রাম্য যুবক সহরে যাইয়া নূতন স্রোতে পড়িল। নবাব আমীর ওমরাহগণের ঐশ্বর্য্য গৌরব, সৈন্যসামন্তের শৌর্য্যোৎসাহ, ব্যবসা-বাণিজ্যের অধ্যবসায়, আদালত কোতোয়ালি ফাটকখানা, মশজিদ মাদ্রাশা, নৃত্যগীত, বাদ্য বাইজী দেখিয়া শুনিয়া হেমেন্দ্রলাল বিস্মিত স্তম্ভিত হইল। তখন সে বুঝিতে পারিল যে, পল্লীগ্রামে রায় মহাশয়-দিগের মিছা গরিমা। সামান্য জোত জমির কোণ কিনারা লইয়া ঝগড়া রণরঙ্গ নহে; পিরু বরকন্দাজের হাঁকাহাঁকি ফৌজদারের রুদ্র প্রতাপ নহে; আর গতৈকপ্রহর নিশিতে ধাইমা কল্যাণীর মুখনিঃসৃত মধুমালার গীত কলকণ্ঠা কাদেরজান বাইজীর কানেড়া রাগিণীর আলাপ নহে। হেমেন্দ্রলালের তীক্ষ্ণ মেধা; অনেক দেখিল অনেক শিখিল। কিছু কিছু উপার্জ্জনও করিতে আরম্ভ করিল। আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাইয়া রায়মহাশয়ের আশার সঞ্চার হইল।

হেমেন্দ্রের কণ্ঠস্বর মন্দ ছিল না। মালসী, আগমনি, আখড়াই, টপ্পা প্রভৃতি গানে তাহার কিছু কিছু গ্রাম্য প্রতিপত্তিও ছিল; কিন্তু রীতিমত শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে সে স্বর গঠিত, মার্জ্জিত, এবং সূক্ষ্ম লয়ানুযায়ী হয় নাই। রাজধানীতে আসিয়া সে অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকার সঙ্গীত শুনিল। শুনিয়া শুনিয়া তাহার অন্তর্নিহিত অস্ফুট স্বাভাবিক শক্তির স্বতঃ বিকাশ আরম্ভ হইল।

খাঁসাহেব আহমেদ করিমখাঁ সে সময় রাজধানীর সর্ব্বপ্রধান কালো-য়াত ছিলেন। খাঁ সাহেব কাহারও বেতন ভোগী ছিলেন না, কিম্বা অর্থ গ্রহণ করিয়া কোন মজলিসে যাইতেন না। নবাব বাহাদুরের বিশেষ

মরজি জানিতে পারিলে তাঁহাকে কখন কখন গান শুনাইয়া আসিতেন মাত্র। রাজধানীতে তাঁহার বিশেষ মান্য ছিল। তাঁহার বহু শিষ্য এবং প্রশিষ্য ছিল; তাহারা এক এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়া তৎকালে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একজন পরিচিত লোকের সঙ্গে হেমেন্দ্র-লাল এক দিন খাঁ সাহেবের বাড়ী গেল। খাঁ সাহেব তখনও বৈঠকখানায় উপস্থিত হন নাই, এবং শ্রোতা, আত্মীয় ও শিক্ষানবিসেরা সকলে আগত হন নাই। হেমেন্দ্র ও তাহার সঙ্গীয় লোকটি সুবিধামত বসিবার স্থান পাইল। বৈঠকখানার সাজ সরঞ্জাম সামান্য; কিন্তু সেই সামান্য শয্যায় সহরের অনেক আমির ওমরাহ উপবেশন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। তম্বুরা সারঙ্গ, সেতার এসরাজ, বীণ বাঁশী, মৃদঙ্গ পাখোয়াজ. তবল তাউস্ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে গৃহ পরিপূর্ণ। ক্রমে আরও লোক আসিল; শেষে পক্কশ্মশ্রু, গম্ভীর মূর্ত্তি সুরক্ষিতদেহ খাঁ সাহেব আহমেদ করিম খাঁ মজলিশে উপস্থিত হইলেন।

তখন যন্ত্রে সুর বাঁধা আরম্ভ হইল, দু একটি কুশল প্রশ্ন হইল। খাঁ সাহেবের ইঙ্গিতে এক জন সাগরেদ্ জয়জয়ন্তীর আলাপ আদায় আরম্ভ করিল। সাগরেদ্ নূতন, কিন্তু বড়ই হুসিয়ার। খাঁ সাহেব বড় খুসী হইলেন এবং আলাপকারীকে বাঁচিয়া থাকার আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বয়ং তম্বুরা হাতে লইলেন। হেমেন্দ্রের বন্ধু পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল, ওস্তাদজীর পক্কশ্মশ্রু পরিঘূর্ণনের ভয়ে এই অবসরেই সে চলিয়া গেল। খাঁ সাহেব প্রথমে মৃদু মৃদু, পরে গ্রাম হইতে উচ্চগ্রামে, শেষে জলদগম্ভীরস্বরে জয়জয়ন্তী, কানেড়া, কেদার, মেঘ, নটনারায়ণ প্রভৃতি পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র-লাল মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিল; সমস্ত বাহ্য জগৎ ভুলিয়া কেবল সেই উন্মাদকারী স্বরমহিমার অভিভূত হইয়া রহিল। ভাবিল, মেঘে বুঝি এমন গম্ভীর গর্জ্জন হয় না; গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গে তটপ্রান্তে বুঝি এরূপ আঘাত-

স্ফূর্ত্তি হয় না; বৈশাখের বনদহনশীল দুর্ব্বার বহ্নিতে বুঝি এমন রুদ্র তেজ নাই।

কিছুকাল পরে রাজধানীর সর্ব্বপ্রধান গায়িকা বাইজী কাদের জান বিবি ওস্তাদজীকে শেলাম করিবার জন্য সেখানে উপস্থিত হইল। রাজধানীর প্রসিদ্ধ গায়ক গায়িকারা প্রায়শঃই এইরূপ খাঁ সাহেবের সম্মান করিত। খাঁ সাহেব কাদেরজানকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, কাদেরজান তাঁহার প্রধানা শিষ্যা।

খাঁ সাহেব। "মায়ীজী আসিয়াছ, ভাল হইয়াছে। মজলিশ বড় গরম, বড় চড়া হইয়াছে, কিছু মিঠা আমদানী কর।"

কাদেরজান। (শির অবনত করিয়া) "বাঁদী হাজীর; হুকুম এখনই তামিল হইবে।"

বিপুলতম্বী তম্বুরার দিকে কাদেরজানের কাতর দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া খাঁসাহেব সারঙ্গ বাঁধিবার আদেশ দিলেন। তখন পাখোয়াজের পরিবর্ত্তে তবলের সঙ্গতে সেই সমঝদার শ্রোতার মজলিশে ওস্তাদের সম্মুখে অবিগতবিংশবর্ষা বাইজী গীত আরম্ভ করিল। প্রথমে মৃদু আলাপঝঙ্কার, পরে সারঙ্গে স্বীয় স্বরসংযোগ সূচক ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গি, শেষে সেই অবিরল মধুবর্ষী কমকণ্ঠের সঙ্গীতলীলা! লুম ঝিঁঝিট, সিন্ধু খাম্বাজ, বসন্ত বাহার, সোহিনী বেহাগ! হেমেন্দ্রলাল ভূতভবিষ্যত ভুলিয়া গেল, আত্মহারা হইল; ভাবিল—বসন্তে কোকিলকণ্ঠে বুঝি পঞ্চম নাই; নীরব নিশিথে শ্যামল শষ্পশিরে স্ফুট শেফালিকা সম্পাত বুঝি এত সুখস্পর্শ হয় না; নন্দন কাননজয়ী পারস্যের রাজোদ্যানজাত পক্কদ্রাক্ষা বুঝি এমন হৃদয়-মনোমোহন মধুরস ঢালিয়া দেয় না!

রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল, গান থামিয়া গেল; শ্রোতা, শিষ্য অনুশিষ্য অনেকে চলিয়া গেল। মুগ্ধ, স্তম্ভিত হেমেন্দ্রলাল সেইখানেই বসিয়া রহিল। দেখিয়া খাঁ সাহেব বলিলেন;—

"বাবু সাহেব, তুমি কে ?"

হেমেন্দ্র চমকিয়া উঠিল, দাঁড়াইয়া শেলাম করিয়া বলিল ;—

"আমার নাম শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।"

"তুমি গান ভালবাস ?"

হেমেন্দ্র উত্তর দিতে পারিল না।

"তুমি গায়িতে পার ?"

"না।"

"যেরূপ মনোযোগ দিয়া গান শুনিতেছিল, তাহাতে বুঝিয়াছি, তুমি গান ভালবাস। কিছু গায়িতে পার কি ?"

"খাঁ সাহেব অনুগ্রহ করিলে আমার এক প্রার্থনা আছে।"

"কি কথা ?"

"বলিতে সাহস হয় না।"

"ভয় কি ? বল।"

"আপনার অনুগ্রহ হইলে আমি গান শিখিতে পারি।"

খাঁ সাহেব দেখিলেন, হেমেন্দ্রের কথার স্বর ওজস্বী, পরিষ্কার এবং স্বভাবমধুর, সঙ্গীত বিকাশের উপযোগী বটে। বলিলেন ;—

"কিছুই গায়িতে পার না ?"

হেমেন্দ্রের সুগঠিত, বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহ কিঞ্চিৎ কম্পিত হইল, তাহার গৌর মুখমণ্ডল আকর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল হেমেন্দ্র বলিল ;—

"সে কিছুই না।"

"কিছুই না কেমন করিয়া জান্‌লে ? গাও।"

খাঁ সাহেব স্বয়ং সেই উচ্চগ্রামনিবদ্ধ তম্বুরায় ঝঙ্কার দিতে আরম্ভ করিলেন। স্মিত অধরে কাদেরজান বলিল ;—

"লজ্জা কি, বাবুসাহেব ?"

বাইজীর উদ্দীপনী মধুর দৃষ্টিতে হেমেন্দ্রের সাহস হইল ; তখন সে

ধীরে ধীরে মৃদু তান ধরিল ; খাঁ সাহেব মুহূর্ত্ত মধ্যে তম্বুরার স্বর এক গ্রাম নামাইয়া বাঁধিলেন। হেমেন্দ্র একটী পুরাতন মালসী গান করিল। খাঁ সাহেব দেখিলেন. হেমেন্দ্রের রাগিণী বিমিশ্র কিন্তু লয় পরিগ্রহ আছে, স্বরে তেজ আছে, কণ্ঠে জড়তা নাই, তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। বাইজী "তোফা আওয়াজ!" বলিয়া প্রশংসা করিল।

সেইদিন হইতে হেমেন্দ্রলাল খাঁ সাহেবের শিষ্য হইল। অনন্যমনে পরিশ্রম করিয়া পাঁচ বৎসর মধ্যে হেমেন্দ্রলাল ওস্তাদের অনুগ্রহে সঙ্গীতে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। পাখোয়াজ তবল, সারঙ্গ এস্‌রাজে তাহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এদিকে জ্যৈষ্ঠতাত ভৈরবচন্দ্র রায় সংসার লইয়া বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ; আর পারিয়া উঠেন না। প্রাচীন ঘর ; ক্রিয়া কাণ্ড, পূজা অর্চ্চনা, অতিথি অভ্যাগত, বন্ধু বান্ধব সকলই আছে, কিন্তু অর্থ নাই। মান সম্ভ্রম আর বজায় থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে বিদেশে যাইয়া উপার্জ্জনের চেষ্টাও অসম্ভব।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ দুর্ব্বার বৈরী বর্গীর উৎপীড়নে দিবারাত্রি বিপর্যাস্ত ছিলেন। মনকরার প্রশস্ত প্রান্তরে মহারাষ্ট্রদলনেতা লুণ্ঠনলোলুপ ভাস্কর পণ্ডিত নিহত হইবার পর স্বয়ং রঘুজী ভোঁসলা একদিক দিয়া বঙ্গদেশে উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বালাজি বেহার প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া অপর দিক

দিয়া বঙ্গ সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রায় সমস্ত বঙ্গদেশ চৌথ আদায়ের উৎপীড়নে ছারখার হইতেছিল। এদিকে সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ, সিপাহসলার মিরজাফর খাঁ, আতাউল্লা খাঁ, সমসের খাঁ, সদ্দার খাঁ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক সেনানায়কেরা ক্রমে স্ব স্ব কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়া বৃদ্ধ নবাবের রাজ্যভার বিষম কষ্টবহ করিয়া তুলিয়াছিলেন। বর্গী, মগ, ফিরিঙ্গীর অত্যাচারে রাজ্য রক্ষা, সুশাসন অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রজার মান সম্ভ্রম, জাতিকুল আর থাকে না। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ, চাষ আবাদ বিরল, রাস্তা ঘাট নগর গ্রাম অরক্ষিত, চতুর্দ্দিক হাহাকারময় হইয়া উঠিল। ধনাঢোরা পালোয়ান, লাঠিয়াল, তীরন্দাজ রাখিয়া স্ব স্ব সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা আরম্ভ করিলেন; নির্দ্ধন ভদ্র সম্প্রদায় বিষম সমস্যায় পড়িলেন, মান প্রাণ আর থাকে না; সাধারণ দরিদ্র চাষী গৃহস্থ বন জঙ্গলে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে রাজকোষ শূন্য। কয় বৎসর যাবৎ অবিশ্রান্ত যুদ্ধ ব্যাপারে অগণিত অর্থ ব্যয় হইয়াছে। ন্যায্য রাজস্বের উপর অনেক আবওয়াব বার হইল; জমিদারগণ মহা বিপদে পড়িলেন। নবাব সরকারে দেওয়ার পর যাহা হাতে থাকে তাহা মহারাষ্ট্রীয়েরা নেয়; মহারাষ্ট্রীয়েরা লইয়া গেলে যাহা থাকে তাহা নবাব সরকারে দিতে হয়। না দিলে ফাটক খানায় বাস করিতে হয়, একের জমিদারী অন্যের হস্তে যায়। বাণিজ্য ব্যবসায় আর চলে না; বাদসাহ-সহকারে সনদ পাইয়া ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি; বিনা সনদে অথচ বিনা শুল্কে ইংরেজ, ফরাসী দিনামার, পর্ত্তুগিজ বাণিজ্য আরম্ভ করিল। দেশীয় বণিকদল উৎসন্ন যাইতে লাগিল। দেশের নিদারুণ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।

মান সম্ভ্রম আর থাকে না। ভৈরবচন্দ্র রায় সংসার লইয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন।

একদিন আহারান্তে রায়মহাশয় মাধ্যাহ্নিক নিদ্রা যাইতে ছিলেন।

অন্তঃপুরে রমণীমহলে "দশ-পঁচিশ" খেলার ঘটা। সম্পর্কে রায় মহাশয়ের পিসী রক্ষাকালী ঠাকুরাণী, প্রতিবেশীনী তারা ও নবদুর্গা আর বধূ লক্ষ্মীপ্রিয়া দরদালানে কোট আঁকিয়া খেলায় বসিয়াছেন। গৃহিণী মহামায়া কাছে বসিয়া খোকার জন্য কাঁথা শেলাই আরম্ভ করিয়াছিলেন ; কিন্তু খেলায় অপরিপক্কা নবদুর্গা ও বধূর কোটগণনায় অযথাবিলম্ব ও গুটি চালনায় অপরিণামদর্শিতা দেখিয়া সূচ সূতা পরিত্যাগ করিয়া স্বতঃ প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহাদের দিকে অধ্যক্ষতা করিতেছেন। কল্যাণী পা ছড়াইয়া বসিয়া 'দুই' 'চার' 'দশ' 'পঁচিশ' ইত্যাদি ডাক হাঁকের সঙ্গে চরকার বাঁধা সুরে তান দিতেছিল। পাড়ার বামা, কালীতারা ও মাণিকের মা দর্শক বেশে তথায় বসিয়াছিল।

লক্ষ্মীপ্রিয়ারই বড় বিপদ। একে তো তাহার আচিবুক মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠনে ঢাকা ; তাহাতে কেবল রসনা ও তালুসংযোগে অপরূপ অব্যক্ত শব্দবিশেষ ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা মনের সমস্ত ভাব প্রকাশ করিতে হইতেছে ; তাহার মধ্যে আবার আঠারমাসের খোকা ছুটিয়া ছুটিয়া কাছে আসে, কোলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া স্তন্যপান করে! থাবা দিয়া দা'নের কড়ি ধরে, পা দিয়া কোটের গুটি বাহিরে ছড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। বড় দুষ্ট ছেলে। ঠাকুরমা শাসন করিলে দৌড়াইয়া—দৌড়ানের কি ত্রিভঙ্গিম ঠাম!—দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহার পিঠে কিল মারে ; 'আবার মার, বলিলে আবারও মারে ; গলা জড়াইয়া ধরিয়া পিঠের উপর ঝুলিয়া পড়ে ; নথ ধরিয়া টানে ; শেষে মুখ পাতিয়া এক রাশি চুম্বন পাইলে থল্ থল্ করিয়া হাসে। বড় দুষ্ট ছেলে ; স্বয়ং ভৈরবচন্দ্র রায় দশ বারে আটবার যাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না, প্রতিবার তাঁহাকে জব্দ করে। অন্য সময় মায়ের কোল ছাড়িয়া হাসিয়া খেলিয়া কল্যাণীর কোলে যায়, কিন্তু ঘরে কড়ি খেলার আয়োজন দেখিলে আর ঘর ছাড়িয়া যায় না। বড় বিপদ, বড় বিপদ!

খেলা বড়ই জমিয়া গিয়াছে। বধূ ও নবদুর্গার জয় হয়-হয় হইয়াছে; নবদুর্গা ঠাকুর বাড়ীতে চিনিকলা মানসা করিয়াছে। মাথার কাপড় সরাইয়া ফেলিয়া খোকা যে চুল ধরিয়া টানিতেছে; সে দিকে লক্ষ্মী-প্রিয়ার লক্ষ্য নাই; দু এক দা'নেই খেলা শেষ হয়। প্রগল্ভা পিসী ঠাকুরাণী সম্পর্কে নাতিনী নবীনা নবদুর্গাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন, "তোদের সঙ্গে পারিয়া উঠিবার কাল কি আর আমাদের আছে!"—এমন সময় বড় গোলযোগ উপস্থিত হইল, অসময়ে কর্ত্তার ক্রোধসূচক উচ্চস্বর অন্তঃপুর পর্য্যন্ত পৌঁছিল। গৃহিণী চমকিয়া উঠিলেন; দা'নের কড়ি হাতে লইয়া নবদুর্গা শঙ্কিত নেত্রে দ্বারের দিকে চাহিল; দা'ন আর দেওয়া হইল না! গর্জ্জন করিতে করিতে রায় মহাশয় ভিতর বাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন।

হেমেন্দ্রলালের বয়স ২৭।২৮ বৎসর, এ পর্য্যন্ত একটি পয়সা উপার্জ্জন করিয়া সংসারের সাহায্য করে নাই। অত কাল জাহাঙ্গীর নগরে থাকিয়া কিছু করিতে পারিল না; তাহার পর বাড়ীতে থাকিয়া কেবল অন্নধ্বংস, আর, রাজ্যের যত গোলমাল, ঝগড়া, মারামারি, লাঠালাঠির নায়কত্ব! ঋণভারগ্রস্থ ভৈরবচন্দ্র আর পারিয়া উঠেন না। কোথায় বিদেশে যাইয়া দুপয়সা উপার্জ্জন করিবে, না কেবল ঘরের খাইয়া পরের মারামারিতে যোগ দিয়া বেড়াইবে। কর্ত্তা হেমেন্দ্রের বিদেশে যাওয়ার প্রস্তাব উঠাইলে গৃহিণী পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতেন;—চোর ডাকাত, বর্গী বরকন্দাজ, ঠগী গামোছামোড়া কত কি! কোন্ বিদেশ, রাস্তা ঘাটে তাহাকে মারিয়া ফেলিবে! কচি বয়স, এখনই কি হইয়াছে?—বাঁচিয়া থাকুক, ঘরের ধন ঘরে থাকুক, না হয় ভিক্ষা করিয়া খাইবে! কর্ত্তা গৃহিণীর সঙ্গে পারিয়া উঠিতেন না; সুতরাং হেমেন্দ্রলালের আর বিদেশে বাহির হওয়া ঘটে নাই।

আজ বিষম অনর্থ উপস্থিত। বংশের মান মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া

চলিতে হয়। প্রায় এক বৎসর হইল হেমেন্দ্রের শিশু পুত্রের অন্নাশন উপলক্ষে রায় মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৃহৎ ঘটা করিয়াছিলেন। অনেক ঋণও করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধের সময়ও চলিয়া গিয়াছে। আজকাল বলিয়া মহাজনকে অনেক দিন আশা দিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার বড় বিপদ। চালানি পাঁচ খানি নৌকা কলিকাতা যাত্রা করিয়াছিল, পথি মধ্যে জলদস্যু তাহা লুট পাট করিয়া জলমগ্ন করিয়া দিয়াছে; এদিকে টাকা না দিলে দাদনি মাল আমদানী করিতে পারিতেছে না। মহাজন মহা বিপদে পড়িয়া অসময়ে রায় মহাশয়ের নিদ্রাভঙ্গ করিয়া কাঁদিয়া তাহার পায়ে পড়িয়াছে। এ সময় টাকা না পাইলে সে সপরিবারে উৎসন্ন যায়। রায় মহাশয় তহবিল শেষ করিয়া যাহা পাইলেন, তাহা দিলেন; তবুও মহাজনেয় কতক টাকা বাকী রহিল। সেকালে সাক্ষী তমঃসুকের তত আবশ্যক হইত না; কেবল ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া উত্তমর্ণ অনেক সময় অধমর্ণকে টাকা দিত এবং অধমর্ণও প্রাণপণ করিয়া নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা পরিশোধ করিত। উপযুক্ত সময়ে টাকা পরিশোধ করিতে না পারিয়া রায় মহাশয় মর্ম্মান্তিক মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন। উপযুক্ত ভ্রাতুষ্পুত্র ঘরে বসিয়া অন্নধ্বংস করে, আর এই বৃদ্ধবয়সে অর্থাভাবে রায় মহাশয়ের এই অপমান ও লাঞ্ছনা! ভৈরব রায় গর্জ্জন করিতে করিতে ভিতর বাড়ীর আঙ্গিনায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নবদুর্গা ও বধূ প্রভৃতি অল্প বয়স্কারা তাড়াতাড়ি অপর দিক দিয়া ঘর হইতে পলায়ন করিল; পিসী ঠাকুরাণী সেই খানেই বসিয়া রহিলেন, গৃহিণী ঘরের বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি হইয়াছে?"

"সোহাগ দিতে দিতে ছেলের মাথা খাইয়াছ, দেখিতে পাও না!"

"বলি আজ আবার কি হইল?"

"আমার মাথা আর মুণ্ডু হইয়াছে। তোমার জন্যই যত হইতেছে।"

"হিমু বাড়ীতে আছে ?"

"না, আজ সকাল বেলায় বিনোদপুর গিয়াছে ; রাত্রিতে আসিবে—আমাকে বলিয়া গিয়াছে।"

"তোমাকে বলিয়া গিয়াছে! কেন, আমি কি বাড়ীতে ছিলাম না ?—বিনোদপুরের আখড়ায় আজ সহরের পালোয়ানের কুস্তি হইবে, তামাসা দেখিতে গিয়াছে ;—কোন পালোয়ানে হতভাগার হাত পা ভাঙ্গিয়া দেয়, তবে—"

"রাম্! রাম! তুমি ক্ষেপিয়াছ না কি ?"

"ছেলে যে অধঃপাতে যাইতেছে সে জ্ঞান তোমার নাই। সারাদিন বাড়ী ঘর বলিয়া খোঁজ নাই, খাবার বেলায় থালাপিঁড়ি!—শোন, আমার আজ্ঞা,—আজ খাইতে আসিলে খাবার ছাই দিও।" বলিয়া রায়মহাশয় বেগে বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। গৃহিণী আর উত্তর দিবার সময় পাইলেন না। এমন একতরফা হা'র গৃহিণীর আর কোন দিন হয় নাই। কর্ত্তার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া আজ তিনি কিঞ্চিৎ ভীতই হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর হেমেন্দ্রলাল বাড়ীতে আসিল,—সঙ্গে রামমোহন। রায় মহাশয়ের বাহির বাড়ার ঘরগুলি খড়ের ছাইনি, দরমা পাটীর ঝাপ, কাঠের শরদল-করা কপাট চৌকাঠ, জানালা দরজা। বৈঠক-খানা ঘর হেমেন্দ্র ব্যবহার করিত। রায় মহাশয় ঠাকুর দালানের পার্শ্ববর্ত্তী আর একখানা ঘরে বসা-মেলা করিতেন; প্রজা লোকের দরবার, সমাজিক তর্ক, বিষয় ব্যাপারের মীমাংসা সেখানেই করি-তেন। অনেক দিন হইল প্রকৃত বৈঠকখানা ঘর হেমেন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সন্ধ্যার পর হেমেন্দ্র গ্রামস্থ সমবয়স্কদের সঙ্গে সেই ঘরে গান বাজনা, সাময়িক রাজনৈতিক সমালোচনা, নবাব ওমরাহের গল্প, বর্গীর অত্যাচারের কথা, চোর ডাকাত ভূত প্রেতের কাহিনী অথবা প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল সর্দ্দার ওস্তাদ পালোয়ানের কায়দা কৌশলের কথা ইত্যাদিতে সময় কাটাইত।

দাবা ব'ড়ে ও কড়ি সতরঞ্চের আমদানিও কোন কোন দিন হইত। রাত্রি জোৎস্নাময় হইলে মালকোচা বাঁধিয়া ইতর ভদ্র অবিচারে বিস্তৃত আঙ্গিনায় কোন কোন দিন লাঠি খেলার ধুম পড়িয়া যাইত। রাত্রি ছয়দণ্ড এক প্রহর হইলে হেমেন্দ্র ভিতর বাড়ী যাইয়া আহার করিত, আহারের পর নিজের শয়ন ঘরে যাইত।

সেদিন অনেক পথ হাঁটিয়া আসিয়া হেমেন্দ্র কিছু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল; বৈঠকখানায় আর বেশি বিলম্ব করিল না। বাড়ীতে যে এত গণ্ডগোল হইয়া গিয়াছে, সে তাহার কিছুই জানে না। প্রতি-দিন যেরূপ করে আজ ও সেইরূপ রান্নাঘরের কাছে যাইয়া বলিল;—

"মা, রান্না হইয়াছে ?"

মহামায়া বলিলেন ;—

"কখন বাড়ীতে এলি, হিমু ?"

"এই কিছুকাল আসিয়াছি। বড় ক্ষুধা পাইয়াছে মা ?"

"বোস্, এই পাত পিঁড়ি হইয়াছে। কাল খোকার অসুখ করিয়াছিল, তাই বৌমার ভাত আগে দিয়াছি।"

কল্যাণী জলের ছিটা দিয়া ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠাঁই করিয়া দিয়াছে ; হেমেন্দ্র পিঁড়ির উপর গিয়া বসিল। মহামায়া থালে অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইতে সাজাইতে বলিলেন ;—

"হিমু, আজ সারাদিন তুই কোথায় ছিলি !"

"বিনোদপুর গিয়াছিলাম।"

"সেখানে কেন ?"

"সহরের চারি পাঁচ জন ডনগির আসিয়াছিল, তাহাদের কুস্তি দেখিতে গিয়াছিলাম।"

"তোর এত বয়স হইল, এখনো কি এই ভাবে খেলিয়া বেড়িয়ে তামাসা দেখিয়ে দিন কাটাবি ?

"আজ তো বাড়ীতে কোন কাজ ছিল না।"

"বাড়ীর কাজ কবে থাকে না ?—তুই দেখিস্ না, কোন তত্ত্ব করিস্ না; তাই বুঝিস্ না।"

"আজ আমার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে কি না, তাই তুমি নানা কথায় ভাত দিতে বিলম্ব করিতেছ।"

"না, বোস্ ;—এই আনিতেছি।"

মহামায়ার স্বর যেন কেমন ক্ষীণ, কেমন যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা ! ভাতের থালা হিমুর সম্মুখে রাখিবার সময় তাঁহার হাত যেন কাঁপিয়া উঠিল। হেমেন্দ্র আহারের উৎযোগ করিল।

"মা, কালো কালো এগুলি কি ?"

"ওগুলি থাক্—ফেলিয়া দে।"

"কি এগুলি ?"

প্রদীপের নিকট ধরিয়া হেমেন্দ্র দেখিতে পাইল—জলে ধোয়া কয়েক খানা পরিষ্কার অঙ্গার !

"মা, এগুলি যে কয়লা ! কেমন করিয়া থালায় আসিল ?"

"কেমন করিয়া যেন পড়িয়া থাকিবে ; তা ওগুলি ফেলিয়া দে।"

মহামায়া অগ্রসর হইলেন ; ইচ্ছা, থালা হইতে কয়লা কয়েক খানা ফেলিয়া দিবেন। হেমেন্দ্র বারণ করিল, বলিল ;—

"না, মা ; এগুলিতো হঠাৎ পড়ে নাই ; বেশ ধোয়া পরিষ্কার কয়লা, থালার কিনারে রহিয়াছে ;—কেমন করিয়া আসিল ?"

মহামায়ার মুখে আর বাক্য সরে না, তাঁহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়াছে।

"মা কি হইয়াছে ?"

মহামায়া ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন ;—

"হিমু, তুই এখন আর ছেলে মানুষ ন'স্ ; এখন বড় হইয়াছিস্, লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিস্—"

"তাই কি, মা ?"

"তিনি প্রাচীন হইয়াছেন, নানা কষ্ট-যন্ত্রণায় দিবারাত্রি দগ্ধ হইতেছেন ;—আর পারিয়া উঠেন না। তুই কিছু দেখিস্ না ; কেমন করিয়া এই সংসার চলে—কিছু ভাবিস্ না—"

হেমেন্দ্র অনিমিষনেত্রে মাতার দিকে চাহিয়া রহিল।

"তুই খাইয়া নে ; এই বলিতেছিলি—তোর বড় ক্ষুধা পাইয়াছে ! এখন খা।"

"না, মা ; কি বলিতেছিলে, বল।"

"কি আর বলিব ?—তোর এখন সকল বিষয় দেখিয়া শুনিয়া চলা উচিত ; দুপয়সা রোজগারের চেষ্টা দেখা উচিত ;—তা তুই কিছুই বুঝিস্ না. কোন দিকে তোর দৃষ্টি নাই !"

"এ সকল কথা আজ এখন কেন, মা ?"

"তিনি আজ বড় রাগ করিয়াছেন ; তাঁহারই বা দোষ কি ? তুইও ভাবিয়া দ্যাখ্,—প্রাচীন হইয়াছেন, আর কয় দিন বাঁচিবেন ?—তীর্থ নাই, ধর্ম্ম নাই ; দিবারাত্রি সংসারের চিন্তা, সংসারের ভাবনা।"

"মা, জেঠা মহাশয় কি বলিয়াছেন ?"

"তা তাঁর দোষ আর কি দিব ? কে—কোন মহাজন যেন টাকা চাহিয়াছিল ; হাতে টাকা নাই ; তাই রাগ করিয়া সকলকে গালাগালি দিয়াছেন।"

"আমার কথা কিছু বলিয়াছেন ?"

"রাগ করিয়া বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া কি করিবি ?—ক্ষুধা পাইয়াছে, বাবা, এখন খা।"

"মা, জেঠা মহাশয় কি বলিয়াছেন, তাহা আমাকে বল।"

মহামায়ার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, দর দর করিয়া তাঁহার চক্ষুর জল পড়িতেছিল।

"মা, তিনি রাগ করিয়া কি আমার পাতে ছাই দিতে বলিয়াছেন ? —অকর্ম্মা মানুষকে তো লোকে ছাই ভস্ম দিতে বলে।"

মহামায়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। স্বামীর আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ: মহাপাপে পড়িতে না হয়, এই মনে করিয়া যে পতিব্রতা উনন হইতে তিন চারি খানি অঙ্গার তুলিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া থালার এক কোণে রাখিয়াছেন, গদগদকণ্ঠে তখন আংশিক ভাবে তাহা হেমেন্দ্রকে জানাই-লেন ; বলিলেন ;—

"তোর পাতে কোন প্রাণে আমি ছাইভস্ম তুলিয়া দিব, হিমু !"

হেমেন্দ্র অন্নস্পর্শ করিয়াছিল; হাত ধুইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া দৌড়িয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন; বলিলেন ;—

"তুই আসন ছাড়িয়া উঠিলি!"

"মা, আমি খাইব না।"

"খাইবি না! তোর পেটে যে দারুণ ক্ষুধা!"

"না, মা; আমার ক্ষুধা মিটিয়াছে, আমি আর খাইব না। যে দিন নিজে উপার্জ্জন করিয়া আনিব, সেই দিন এ বাড়ীতে ভাত খাইব।—পারি তো রূপার থালে, সোণার বাটীতে খাইব; নতুবা আর না।"

"এ বাড়ী! এ বাড়ী কাহার? কাহার এ ঘর বাড়ী, দালান কোঠা?—তুই কাহার খা'স্? তোরই তো সব! তুই খাইবি না তো কে খাইবে?—আমার মাথা খা'স্, বোস্।"

মহামায়া হাত ধরিয়া টানিলেন, হেমেন্দ্র বসিল না। অনেক বলিলেন, অনেক সাধিলেন, অনেক কাঁদিলেন; হেমেন্দ্র স্বীকার হইল না। মাতার পদপ্রান্তে জলপূর্ণ আবখোড়া স্পর্শ করাইয়া সেই এক আবখোড়া জল পান করিল, শেষে সেই চরণযুগলে প্রণাম করিয়া হেমেন্দ্র ঘরের বাহির হইল।

মহামায়া অবাক্ অবরুদ্ধকণ্ঠা, চেতনাশূন্যবৎ সেই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। দৌড়াইয়া পাছে পাছে যাইয়া কল্যাণী ডাকিল ;—

"হিমু! হিমু!"

হেমেন্দ্র ফিরিল না; একেবারে বাহির বাড়ী বৈঠকখানা ঘরে প্রবেশ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বৈঠকখানা ঘরে রামমোহন অপেক্ষা করিতেছিল। হেমেন্দ্র বলিল ;—

"রামা, কাল ভোরে আমি সহরে যাত্রা করিব—"

রামমোহন চমকিয়া উঠিল !

"চারিদিকে চোর ডাকাত, বর্গী বরকন্দাজের ভয় ; তুই বাড়ীতে রহিলি, দিবারাত্রি খুব হুসিয়ার থাকিবি ?"

রামমোহন বাক্যশূন্য।

"উত্তর দিস্ না যে ?"

"আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?"

"তোর আবার কি অপরাধ ?—কি বলিতেছিস্ ?"

"এবারও আমাকে সঙ্গে নিবে না, দাদাবাবু ? তুমি সে বার বলিয়াছিলে,—আবার সহরে যাইতে আমাকে সঙ্গে নিবে !"

হেমেন্দ্র দেখিতে পাইল না,— কিন্তু রামমোহনের দুই চক্ষু জলে ছল্ ছল্ হইয়া উঠিল।

"রামা, তুই সঙ্গে যাবি ?"

"সঙ্গে যাব !—তুমি যাবে, দাদাবাবু ?"

"কাল ভোরে যাইব।"

"আমাকে সঙ্গে নিবে !"

"তুই কি যাবি ? যদি যা'স্, দুজনে একত্রে যাইব।"

রামমোহন বসিয়াছিল, উঠিল ; পরিধানের কাপড় কসিয়া পরিল ; জিহ্বা বাহির করিয়া মুখের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দুই তিন বার সঞ্চালিত করিল ; শেষে অনতিক্ষুদ্র এক লম্ফ প্রদান করিয়া বাম পদের উপর ভর রাখিয়া একবার ঘুরিয়া ঠিক হইয়া দাঁড়াইল।

সঙ্গে সহরে যাইবার জন্য কতবার দাদাবাবুর সাধ্যসাধনা করিয়াছে, রামার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। সহর! সেখানে কত পেয়াদা বরকন্দাজ কোতোয়াল, ফৌজ সেপাহি সরদার, তোপ কামান, দোকান-পসার, গানওয়ালা নাচওয়ালী, হাতী ঘোড়া, নাজীর পেস্কার, নবাব!—রামমোহনের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ মুখ অস্বাভাবিক গোলাকার ধারণ করিল।

"কি রামা, যাবি ?"

অতি আনন্দে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়াছিল; হর্ষকুঞ্চিতনেত্রে ঘন নিমেষ পাত করিয়া রসনার সাহায্যে রামমোহন মুখগহ্বরে এক অদ্ভুত শব্দ সৃষ্টি করিল।

"তবে সব ঠিক্ ঠাক্ কর্; খুব ভোরে—চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে বাড়ীর বাহির হইব।"

রামমোহন কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

"সঙ্গে কি কি লইব ?"

"কি আর নিবি!—দু এক খানা কাপড়, গামোছা আর তোর লাঠি গাছা।"

"ঢাল খানা লইব না ?"

"আমরা তো আর লড়াই করিতে যাইতেছি না!"

"গুলাল বাঁশ খানা ?"

"পিঠে ফেলিয়া নিতে পারিবি ?"

রামমোহন দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিজের বিশাল বামস্কন্ধে এক চপেটা-ঘাত করিল।

"আচ্ছা; আমি এখন শয়ন করি গিয়া। রাত্রি থাকিতে বাহির হইয়া আসিব। তুই প্রস্তুত থাকিস্।" হেমেন্দ্র উঠিল। রামমোহন মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল;—

"দাদাবাবু, মাকে কি বলিব ?"

হেমেন্দ্রের মুখ তখন গম্ভীর হইল। বাড়ী হইতে বাহির হইবে; অদৃষ্টের পরীক্ষা করিবে; যতদিন সুদিনের মুখ না দেখিবে, তত দিন ফিরিবে না;—এ সকল তো স্থির করা হইয়াছে; কিন্তু জেঠা মহাশয়কে বলিয়া যাইবে কি, না বলিয়াই যাইবে, তাহা কিছুই তো হেমেন্দ্র ঠিক করিতে পারে নাই। রামমোহনের প্রশ্নে মহা চিন্তায় পড়িল। রামমোহন বলিল;—

"বুড়িকে বলিয়া আর কি হইবে ?—বলিলে হাউ মাউ করিয়া কান্না যুড়িয়া দিবে।"

হেমেন্দ্র রামমোহনের কথার উত্তর না দিয়া ভাবিতে লাগিল—বলিব কি! বলিলে মা কি যাইতে দিবেন ?—লক্ষ্মীপ্রিয়া!—

"বুড়িকে বলিব না। কি বল, দাদাবাবু! তোমার সঙ্গে যাইব তা আর বলিবার দরকার কি ?"

হেমেন্দ্র চিন্তা করিয়া একটা বুদ্ধি স্থির করিয়াছিল, বলিল;—"তুই না বলিয়া চলিয়া গেলে ধাইমা কাঁদিবে না ?"

"তুমি গেলেও তো কাঁদিবে।"

"তা ঠিক। বলিয়া কাজ নাই। আমি এক খানা পত্রে সকল কথা লিখিয়া রাখিয়া যাইব; আমরা চলিয়া গেলে সকল কথা পত্রে প্রকাশ পাইবে। কেমন রামা, তাহা হইলে হইবে না ?—আমাদের যাওয়ারও বাধা হইবে না; কোথায় গেলাম, কি জন্য গেলাম তাহাও সকলে জানিতে পারিবে!"

রামা জানিত—লেখাপড়া, বিদ্যাবুদ্ধি, বলবীর্য্য, কলকৌশল, সভা সহবৎ—জ্ঞাতব্য সর্ব্ববিষয়ে দাদাবাবুর মত আর একজন লোক সংসারে আছে কি না সন্দেহ। এই পত্র লিখিয়া যাওয়ার বুদ্ধি কি যাহার তাহার মাথায় খেলিত ?

রামমোহন বলিল ;—

"ঠিক বুদ্ধি বাহির করিয়াছ, দাদাবাবু।"

বাস্তবিক মাতার নিকট বিদায়-গ্রহণরূপ বিষম বিপত্তির সম্মুখীন হওয়া অপেক্ষা না বলিয়া কহিয়া পলায়নই তাহার নিকট সুপরামর্শ বলিয়া বোধ হইতেছিল।

হেমেন্দ্র আপনার শয়ন ঘরে গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে রায় মহাশয়ের বড় বিলম্ব হইল। মহাজনের টাকা সমস্ত পরিশোধ করিতে না পারিয়া তিনি বড় মনস্তাপ পাইয়া ছিলেন। গোমস্তা পাটওয়ারি ডাকাইয়া আদায় তহশীলের কাগজপত্র, জমাবন্দী, করচা, জমাওয়াশীলবাকা দেখিয়া শুনিয়া বাকী বকেয়ার একটা খতিয়ানি করিতে অনেক রাত্রি হইল। রাত্রি দেড় প্রহরের পর তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন। অত রাত্রে লোক জনের আহারাদি শেষ হইয়াছে; বাকী আছেন কর্ত্তা ও গৃহিণী। কর্ত্তার আহার না হইলে মহামায়া কোন দিন আহার করেন না। শয়ন ঘরের পাশের কুঠরীতে উভয়ের অন্ন-ব্যঞ্জন আনিয়া রাখা হইত; কাজকর্ম্ম সারিয়া কর্ত্তা ভিতর বাড়ীতে আসিয়া আহার করিলে মহামায়া প্রসাদ পাইতেন।

রায় মহাশয় শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মহামায়া শয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; রায় মহাশয় বিস্মিত হইলেন। গৃহিণীর কি কোন অসুখ হইয়াছে! আহারের পূর্ব্বে শয়ন তো মহামায়া কোন দিন

করেন না! স্বামীর আহারের সময় কাছে বসিয়া পাখা দিয়া বাতাস করেন (এখন গ্রীষ্মকাল); এটুকু খাও, ওটুকু খাও বলিয়া জেদ করেন; ঘরের কথা, পাড়ার কথা—কত বিষয়ের সমালোচনা করেন;—আজ একি? রায় মহাশয় বলিলেন;—

"কি গো, শয়ন করিয়া যে! কোন অসুখ করিয়াছে?"

মহামায়া উত্তর দিলেন না; পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন।

"আজ রাত অনেক হইয়াছে; খাওয়া দাওয়া হবে না?"

"হবে না কেন?—সব প্রস্তুত খাও গিয়া।"

সে কি? তুমি উঠিবে না?—কি হইয়াছে?"

উত্তর নাই। কল্যাণী বারান্দায় ছিল; কর্ত্তা ডাকিলেন;—

"কি হইয়াছে, কল্যাণি?"

কল্যাণী বলিল, "মা খাবেন না; ডাকিতেও নিষেধ করিয়াছেন।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

তখন মহামায়া বলিলেন;—"হবে আর কি?—রাগ হইলে তো আর জ্ঞান থাকে না! এমন নির্ঘাত বাক্যও মানুষের মুখ দিয়া বাহির হয়!"

"ব্যাপারটা কি, কল্যাণি, জানিস্!"

কল্যাণী বলিল;—"হিমু রাগ করিয়া খায় নাই।"

"খায় নাই! কেন খায় নাই?"

মহামায়া বলিলেন;—"খাইতে আসিলে মাথায় ছাই দিতে বলিও! কেন খায় নাই?"

"একেবারে বয়ে গেল, তাই গালাগালি করিয়াছি।"

"ভাল করিয়াছ। এখন মনের সুখে নিজে খাও দাও!—বাছা আমার খিদে খিদে করিয়া খাইতে আসিয়াছিল! আমার পোড়া কপাল, যম আমাকে ভুলিয়া গিয়াছেন।"

"হিমু রাগ করিয়া খায় নাই!—তুমি উঠ, তাহাকে ডাকিয়া আন।"

"আমি পারিব না; তুমি গালি দিয়াছ, তুমি যাও।"

"না, উঠ; সে না খাইয়া রহিল, আমরা কেমন করিয়া খাইব?"

"তা তুমি সকলই পার!"

"না, উঠ। তাহাকে কিছু খাওয়াইতেই হইবে; উঠ।"

কর্ত্তা গৃহিণীর হাত ধরিলেন; গৃহিণী তখন উঠিলেন। বিকাল বেলার বিষম পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য গৃহিণী যে এই অভিমান প্রদর্শন করিলেন, তাহা নহে। বাস্তবিক মুখের আহার ফেলিয়া হিমু অনাহারে চলিয়া যাওয়াতে মহামায়া হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইয়াছিলেন। স্বামীর ওরূপ অসঙ্গত কঠোর আদেশ আজি কালির কোন গৃহিণী পালন করিতেন কি না, বলিতে পারি না। কিন্তু আমরা যে কালের কথা বলিতেছি, তখনও এমন গৃহিণী দেখা যাইত, যাঁহারা স্বামীর আজ্ঞা লঙ্ঘনরূপ পাপকে বড় ভয় করিতেন; তবে বুদ্ধি পরিচালনা করিয়া করিয়া ওরূপ আদেশের কাঠিন্য পরিহার করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। হিমু অবোধ ছেলে নয়, সকলই বুঝিতে পারিয়াছিল।—মনোদুঃখে মহামায়ার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল; ক্ষোভে অভিমানে গৃহিণী শয্যায় পড়িয়া ছিলেন; স্বামীর সাধনায় উঠিলেন।

"হিমু খায় নাই?—কেন খায় নাই?"

"কেন খায় নাই?—আথার ছাই খাইবে?"

"সে কি!"

"কেন, খেতে এলে তুমি তো তাহাকে আথার ছাই দিতে বলিয়াছ! মুখের ভাত ফেলিয়া বাছা চলিয়া গিয়াছে!—আমার মরণ নাই!—যাও, তুমি খাও গিয়া, ভাত ঢাকা রহিয়াছে।"

"হিমু খাবে না?"

"এত রাতে কি সে আর ভাত খাবে?"

"সে না খেয়ে থাকিবে, আমরা খাব ?"

"কেন, ভাত কি গলায় ঠেকিবে ?"

গৃহিণী বোধ হয় এইবার অপরাহ্নের এক তরফা হা'রের প্রতিশোধ লইলেন। তখন আরও কিছু কথা কাটাকাটির পর মহামায়া খাটের নীচু হইতে ডালা-ভরা চিনি কলা, চিড়া মুড়ি, মোয়া মুড়কি, লাড়ু, বাতাসা বাম হাতে ; আর বৃহৎ বাটী-ভরা ক্ষীরের ন্যায় ঘন দুধ ডানহাতে লইয়া ঘরের বাহির হইলেন। কল্যাণী আলো ধরিল। মহামায়া হিমুর শয়ন ঘরের দ্বারে যাইয়া ডাকিলেন ;—

"হিমু, হিমু, দরজা খোল্ ;—বৌমা, দুয়ারটা খোল তো।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া গৃহের এক কোণে গিয়া দাঁড়াইল ; তাহার মুখ আচিবুক অবগুণ্ঠনে ঢাকা। গৃহে প্রদীপ জ্বলিতেছিল। খাটে শয্যায় শুইয়া খোকা অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল।

হিমু বলিল—"কি মা ; এত রাত্রিতে কেন ?—তোমার হাতে ওসব কি ?

মহামায়া একপাশে মুড়ি মুড়কির ডালা ও দুধের বাটী নামাইয়া বলিলেন ;—"বৌমা, একখানা যায়গা কর।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া মেঝেতে জলের ঝিটা দিয়া হাত দিয়া মুছিয়া ঠাঁই করিল, কাঁঠালের প্রশস্ত পিঁড়ি পাতিল, পাত্রে ভরিয়া জল রাখিল ; শেষে পুনরায় কোণে গিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া পিঁড়ির সম্মুখে দুধের বাটি রাখিয়া হিমুকে ডাকিলেন।

হিমু বলিল ;—"না, মা ; আমি খাইব না।"

"খাবি না ! তুই খাবি না, তিনি উপবাসে থাকিবেন ? তুই না খাইলে যে তিনি খাইবেন না।—কল্যাণী পর্য্যন্ত না খাইয়া রহিয়াছে। —আয়, বোস্ এসে।"

হিমু দাঁড়াইয়া রহিল। মহামায়া তখন উঠিয়া গিয়া হিমুর হাত ধরিলেন। হিমু থাকিতে পারিল না; তথাপি বলিল ;—

"এত রাত্রে খাইলে আমার অসুখ করিবে।"

"আমি দিতেছি, তোর কোন অসুখ করিবে না। বোস্ গিয়া।"

হিমু বসিল। মহামায়া তখন কাছে বসিয়া সেই দুধের বাটিতে কলা ছাড়াইয়া দিলেন. মুঠে মুঠে চিনি বাতাসা, আঁচলা ভরিয়া মুড়ি মুড়কি দিতে লাগিলেন। হিমু "আর না! আর না!" বলিয়া অনেক আপত্তি করিল, মহামায়া তাহা শুনিলেন না; শেষে সেই রাশীকৃত চিড়া মুড়ি খোয়া মুড়কি হিমুর প্রায় নিঃশেষ করিতে হইল। হিমুর আহার হইলে মহামায়া বলিলেন;—

"হিমু, তিনি বুড়ো হইয়াছেন, আর পারেন না; তাই রাগ করেন। সংসারের বোঝা এখন হইতে তুই কাঁধে নে; আর আলস্যে দিন কাটা'স না।"

হেমেন্দ্র উত্তর দিতে চাহিল, কথা ফুটিল না। তাহার হৃদয় আজ প্রবল বেগে আন্দোলিত, উচ্ছ্বসিত হইতেছিল; বৃহৎ উদ্দেশ্যে হিমু মন বাঁধিতেছিল। শেষে বলিল;—

"মা, তুমি চিন্তা করিও না; আমি ঘরের সকল দুঃখ দূর করিব।"

"তা তুই পারিবি। একবার মনটা ঠিক কর্।"

"আজ হইতে মন ঠিক করিয়াছি।"

"ঠাকুর তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন!"

মহামায়া তখন খোকার সুখসুপ্ত সুন্দর কচি মুখ চুম্বন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন। অত রাত্রিতে শাশুড়ী ঘরে আসিয়াছেন, বাহির হইবার পূর্ব্বে লক্ষ্মীপ্রিয়া শ্বশ্রূর চরণযুগলে প্রণাম করিল। সে কালের বধূরা এইরূপই করিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

শেষ রাত্রিতে হেমেন্দ্র লক্ষ্মীপ্রিয়ার নিকট শেষ-বিদায় প্রার্থনা করিল। সারা রাত্রি স্বামী স্ত্রী কাহারও নিদ্রা হয় নাই; কথা অনেক হইয়াছে। অকুলন সংসারের উন্নতিকল্পে স্বামী বিদেশে যাইতেছেন, শ্বশ্রূ-শ্বশুর-শাসিত গৃহে ষোল সতের বৎসরের কুলবধূ, সে কি আর বাধা দিতে পারে?—কেবল নীরবে কাঁদিয়া, অবিরল অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া বিষম বিকলচিত্তে রাত্রি যাপন করিয়াছে। কত ভাবিয়াছে, কত চিন্তা করিয়াছে,—বিদেশে বিপাকে কত বিপদ; রোগ শোক, দুঃখ কষ্ট, সাপ বাঘ, ভূত পিশাচ, চোর ডাকাত, বর্গী বরকন্দাজ, কত কি!—লক্ষ্মীপ্রিয়া নীরবে কাঁদিয়া, অনিবার অশ্রুবর্ষণ করিয়া, ক্ষণসুপ্ত স্বামীর মুখের দিকে অনিমেষে চাহিয়া, স্বামীর পদ সংবাহন করিয়া, বক্ষে ধারণ করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। আর হেমেন্দ্র? তাহার হৃদয়ে তো তুমুল ঝড় বহিতেছিল। এই বলিষ্ঠ কর্ম্মিষ্ঠ বিশাল দেহ লইয়া নিশ্চেষ্ট নিরুদ্দমে গৃহে বসিয়া থাকা; বৃদ্ধের মাথার উপর দিয়া যত ঝঞ্ঝাট; ঘরের অবস্থা, দেশের অবস্থা!—বৃথা দেহ, বৃথা সামর্থ্য!—তীব্র মর্ম্মভেদী আত্মগ্লানি তাহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। গৃহের বাহির হইতে হইবে, অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে হইবে, সংগ্রাম করিতে হইবে, হয় হইবে শরীরের পতন! ধনধান্য ভরা বসুন্ধরা চিরকাল বুদ্ধি বীর্য্য, উৎসাহ উদ্যমের আজ্ঞাকারীণী! দুর্নিবার, দুর্জ্জয় অভিমান তাহার হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দেবতা আছেন, ঈশ্বর আছেন, স্ত্রী-পুত্র রক্ষা করিবেন।

তবুও, লক্ষ্মীপ্রিয়া! খোকা!—হেমেন্দ্রলালের বিশাল দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল, চক্ষে অশ্রু সঞ্চরিত হইল। হেমেন্দ্র বলিল;—

"এখন আসি।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না; চাহিয়া কি করিবে? বাষ্পভরে চক্ষু তো দৃষ্টিহীন হইয়াছে! সাবধানে সন্তর্পণে খোকার সুপ্তমুখে শত চুম্বন হেমেন্দ্র দিয়াছে; বিদেশ-গমনোপযোগী সাজ-সজ্জা হেমেন্দ্র করিয়াছে। সজ্জা সামান্য। পায়ে নাগরা জুতা, পরিধানে প্রসিদ্ধ করজনার ধুতি, গায় মেরজাই, কোমরে জড়ান আত্তাই, মস্তকে কুঞ্চিত তরঙ্গায়িত বাবরী চুল চাপিয়া বাঁধা চাদর! সেই শয়নঘরেও ঢাল, তরবার, শর্কী, লাঠি, গুপ্তি, বন্দুক, রামদা সাজান ছিল; হিমু সকল পরিত্যাগ করিয়া বাঁশের গোড়ানি লাঠি একখানা সঙ্গে লইবার জন্য নির্ব্বাচন করিয়াছে, তাহার প্রান্তভাগে বিঘত প্রমাণ তীক্ষ্ণধার শাণিত লৌহগুপ্তি লুক্কায়িত ছিল। হেমেন্দ্র আবার বলিল;—

"সময় হইয়াছে, এখন আসি। রাত্রি প্রভাত হইতেছে।"

হরি! হরি! প্রভাত হইতেছে; দিঙ্‌মণ্ডল আলোকিত হইয়া উঠিবে!—ঘনতর অন্ধকার অভাগিণীর ক্ষুদ্র জগৎ তমিস্রময় করিতে আসিতেছে!

দরবিগলিত অশ্রুধারা-পরিপ্লাবিত মুখে লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র দুই হস্ত তাহার কোমল স্কন্ধে রাখিয়া অশ্রু-সিক্ত অধরদল পরিচুম্বিত করিল। তখন লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। সময় নাই! সময় নাই! হেমেন্দ্র হাত ধরিয়া তাহাকে উঠাইল; আপনার বিশাল বক্ষে তাহার প্রফুল্ল কমলতুল্য মুখ খানি রাখিয়া সেই বিস্রস্ত কেশরাশি মৃদুহস্তে বিন্যস্ত করিতে করিতে অনেক সান্ত্বনা করিল। শেষে, শেষে আর গৌণ করিল না; সেই পদ্মপলাশরক্ত স্ফুরদধরে শেষ-চুম্বন দিয়া হেমেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইল।

নিশিথে নীরবে যেমন পত্র হইতে পত্রান্তরে নীহারবিন্দু পতিত হয়

শেষবিদায় সময়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার আরক্তগণ্ডে তেমনি দুই বিন্দু অশ্রু পতিত হইল ; সে অশ্রু বুঝি বা তাহার নিজের চক্ষু হইতে পড়ে নাই !

শয়ন গৃহ হইতে বাহির হইয়া, কোণ ঘুরিয়া হেমেন্দ্র ভিতর বাড়ীর বড় আঙ্গিনায় প্রবেশ করিল। পাশেই জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের শয়নঘর। হেমেন্দ্র সেই ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল, মাথার চাদর খুলিয়া গলায় দিল ; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঘরের দরজার পাশে মাথা নত করিয়া নিদ্রিত জ্যেষ্ঠতাত এবং মাতার চরণোদ্দেশে বার বার প্রণাম করিল। তাহার পর আঙ্গিনা পার হইয়া দেউরিঘরে প্রবেশ করিল। দরজা খোলার শব্দ শুনিয়া দেউরির প্রহরী রাধামোহন জিজ্ঞাসা করিল ;—"কে ?"

হেমেন্দ্র বলিল,—"আমি !"

"বাবু !—দরজা খুলিয়া দিব ?"

"না ; আমিই খুলিতেছি। রাত প্রায় ভোর হইল।"

হেমেন্দ্র বাহির হইয়া ঠাকুর ঘরের সম্মুখে যাইয়া গৃহ-দেবতা মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া বরাবর বৈঠকখানায় গেল। সে ঘরে রামমোহন সারা-রাত্রি জাগিয়া কাটাইয়াছে। সঙ্গে লইবার সমস্ত আসবাবপত্র একটা বৃহৎ বটুয়ার মধ্যে ভরিয়াছে ; কোমরে গামোছা বাঁধিয়া, হাতের কাছে লাঠি রাখিয়া রামমোহন সহরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়াছিল। সহর !—রাত আর যায় না ! দাদাবাবু আর কত দেরি করিবে ?

এমন সময় হেমেন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইল। রামমোহন লাঠি ও বটুয়া লইয়া দাঁড়াইল।

"কি, দাদাবাবু, সময় হইয়াছে ?"

"হাঁ, রামা ; তুই হাত মুখ ধুইয়াছিস্ ?"

"আমি ঘুমাই নাই, দাদাবাবু !"

"সে কিরে ?"

"বিছানায় গিয়া শুইয়াছিলাম, অমনি রসুলপুরের মিঞাদের মুরগীর ডাক শুনিয়া ভাবিলাম, রাত আর নাই; সেই হ'তে বসিয়া আছি।"

"মোরগ যে দুপুর রাতেও ডাকে।"

"আমি ভাবিয়াছিলাম ভোরের ডাক।"

"তবে এখন চল্।"

রামমোহন তো প্রস্তত। তখনই পিঠে বটুয়া ঝুলাইয়া লাঠি হাতে করিয়া মুখে 'শ্রীদুর্গা!' বলিয়া দরজা খুলিল, উভয়ে ঘরের বাহির হইল। দুপাশে ফুল বাগান, মধ্য দিয়া পথ। বেল, যূঁই, যাতি, কামিনী রজনীগন্ধার সৌরভে সেই নিদাঘ শেষ রাত্রির শীতল মৃদু বায়ু ভরপুর সুরভিত হইয়াছিল; অন্ধকার, দেখা যায় না, কোথায় কোন্ গাছের ডালে বসিয়া যেন উৎকণ্ঠায় আকুল পিকদম্পতী ডাকিয়া ডাকিয়া সুপ্ত দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিতেছে। ফুলের বাগান ছাড়াইয়াই পুকুর, পুকুরের পার ছাড়াইয়া দুইজনে মাঠের সরাই পথে পৌঁছিল। আগে হেমেন্দ্র, পাছে রামমোহন। খানিকদূর যাইয়া রামমোহন বলিল;—

"দাদাবাবু একটু দাঁড়াও।"

"কেন রে, কিছু ফেলিয়া আসিয়াছিস্?"

"না, একটা কাজ বাকি রহিয়াছে।"

এই বলিয়া লাঠি বটুয়া মাটিতে রাখিয়া, বাড়ীরদিকে মুখ করিয়া মাথা নত করিয়া রামমোহন বার বার প্রণাম করিতে লাগিল।

"এই কর্ত্তাকে প্রণাম; এই কর্ত্তামাকে প্রণাম; এই বৌদিদিকে প্রণাম; এই খোকা——"

"কি রে খোকাকেও প্রণাম করিবি নাকি?"

রামমোহনের স্বর ক্ষীণ, বিষণ্ণ হইয়াছে। হাত দিয়া নিজের স্কন্ধ নির্দ্দেশ করিয়া বলিল;—

"না, দাদাবাবু, এই খোকাকে কাঁধে লইলাম। রাতভোরে 'নাম-

মোন্‌কা!' বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া যখন খোকা আমাকে পাইবে না, তখন কে তাহাকে কাঁধে করিয়া বেড়াইবে? ঘোড়া সাজিয়া, হাতী সাজিয়া পিঠে চড়াইয়া কে তাকে খেলা দিবে?—আমার চোখে জল আস্‌ছে, দাদাবাবু!"

হেমেন্দ্রের নিজের চক্ষু তখন ভাসিয়া যাইতেছিল। এই অকপট-চিত্ত অশিক্ষিত ধাত্রীপুত্রের অকৃত্রিম হৃদয়শালীতা দেখিয়া তাহার হৃদয় আরও উচ্ছ্বসিত হইল। অতিকষ্টে সেই উদ্বেলিত চিত্ত প্রশমিত করিয়া হেমেন্দ্র বলিল;—

"সহরে যাইতেছি; ভাল ভাল, বড় বড় হাতী ঘোড়ার খেলনা আনিয়া খোকাকে দিব। রামা, আমরা বিদেশে চাকরী করিয়া, বড় মানুষ হইয়া আসল জীবন্ত হাতী ঘোড়া আনিয়া খোকাকে চড়াইব। রসুলপুরের মিঞাদের কাছারিতে কেমন দাঁতাল হাতী আনিয়াছে, দেখিস নাই?"

রামমোহনের কল্পনাস্রোত এই সুখগম্য নূতন খাদে পরিচালিত হওয়ায় তাহার মুখ কিছু প্রফুল্ল হইল। তখন সে বলিল;—

"দাদাবাবু আমি খোকার জন্য খুব বড় দেখিয়া একটা রামছাগল কিনিয়া আনিব? দক্ষিণবাড়ীর ছাগলটা দেখ্‌লে, খোকা 'নেব!' 'নেব!' করে।"

"তা আনিস্। রামা, সকলকে প্রণাম করিলি, ধাইমাকে করিলি না?"

"বুড়িকে?—প্রথম রাতেই তাহাকে ফাঁকি দিয়া প্রণাম করিয়া রাখিয়াছি।"

"ফাঁকি দিয়া প্রণাম কি রে?"

"সহরে যাইতেছি, সে কথা বলিয়া প্রণাম করিলে কি বাড়ীর বাহির হইতে পারিতাম?—হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া বাড়ীশুদ্ধ সকলকে জানাইয়া ফেলিত। তা' হলে আমাদের সকল পরামর্শ মিছা হইত।"

"তা ঠিক; বলিলে বিষম গোলযোগ হইত।—তা তুই কি করিলি?"

"বিদেশে যাইব; কত দিনে ফিরিব, ঠিক নাই। বুড়িকে প্রণামটা না করিয়া গেলে পাপ হইবে ভাবিয়া ঘরে গেলাম। একথা সেকথার পর পাশ দিয়া চলিয়া আসিবার সময় টিপ্ করিয়া বুড়ির পায়ে একটা প্রণাম করিলাম। বুড়ি বলিল—'ও কি রে?' আমি বলিলাম—'কিছু না, তোর পায়ে পা লাগে নাই তো?' বুড়ি বলিল—'না।' 'তবে আমি এখন আসি।'—এই বলিয়াই আমি সে ঘর হইতে প্রস্থান।"

"এই ফাঁকি?"

"হাঁ, দাদাবাবু। আমার তো কোন দোষ হয় নাই?"

"কিছু না। মাকে প্রণাম করিতে আবার দোষ কি? চল্, ফর্সা না হইতে হইতে নদী পার হইতে হইবে।"

রামমোহন লাঠি বটুয়া উঠাইল। তখন নিজের স্কন্ধে এক চপেটাঘাত করিয়া বলিল;—

"যাঃ! গুলল বাঁশটা তো আনি নাই, দাদাবাবু!"

"তা থাকুক; সহরে কত গুলল বাঁশ পাওয়া যায়, ভাল দেখিয়া এক খানা কিনিয়া নিস্।"

"বছর ভরিয়া তেলে তেলে এখানা পাকাইয়াছিলাম!"

"আবার এক খানা পাকাইয়া নিস্। চল্, তাড়াতাড়ি চল্।"

উভয়ে পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। এমন সময় প্রকাণ্ড একটা কুকুর পশ্চাৎ হইতে দৌড়িয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে, পাশে, উভয়ের মধ্যে পড়িয়া অদ্ভুদ লম্ফ ঝম্প এবং আশ্চর্য্য অস্ফুট শব্দ করিতে লাগিল। রামমোহন বলিল;—"দাদাবাবু, বাঘা আসিয়াছে!"

বাঘা পেছনের দুই পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া নৃত্য আরম্ভ করিল; তাহার পর সম্মুখের দুই পা রামমোহনের বুকের উপর তুলিয়া দিয়া তাহার গতি রোধ করিল। বাঘাকে তাড়াইবার জন্য দুই জনে অনেক

চেষ্টা করিল, বাঘা যায় না। লাঠি উঠাইয়া মারিতে চাহিলে সরিয়া যায়, আবার লেজ নীচু করিয়া কাছে আসে, পা চাটে, লাফায়, কত কি করে ; যায় না ! রামমোহন বলিল ;—

"দাদাবাবু, বাঘাকে সঙ্গে লইয়া গেলে হয় না ?—ও তো বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে চায় না !"

"দূর্, পাগল ! সহর কি কাছের পথ ? তুই, আমি দুজনেই আসিলাম, বাড়ীর পাহারা দেয় কে ?—আর, বাঘাকে না দেখিয়া খোকা যে কাঁদিবে ?"

রামমোহন তখন লাঠি উঠাইয়া ভয় দেখাইয়া বাঘাকে অনেক দূর পশ্চাতে তাড়াইয়া দিল ; বাঘা মানিল না, ফিরিয়া আসিল। রামমোহন মাঠের ঢিল কুড়াইয়া লইয়া বাঘার দিকে ছুড়িতে লাগিল। এবার বাঘা অনেক দূর সরিয়া পড়িল।

ক্রমে দুইজনে নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিল। পাটুনি ঘাটে খেয়া-নৌকা বাঁধিয়া রাখিয়া গ্রামে বাড়ীতে শয়ন করিতে গিয়াছে। পল্লীগ্রামে সামান্য ছোট নদী, সারারাত পারাপারের আবশ্যক হয় না। দূরে তিমিরাবগুণ্ঠিতা পল্লীর উচ্চ বৃক্ষগুলি তারাখচিত নীল আকাশের গায় বিরাটাকার দৈত্যদলের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। হেমেন্দ্র সজল চক্ষে অন্ধকার ভেদ করিয়া পিতৃপিতামহের অবস্থান-পবিত্র সেই পুরাতন বাড়ীর দিকে বার বার চাহিল। পুকুর পারে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শিব-মন্দিরের অস্পষ্ট ছায়া যেন তাহার চক্ষে পড়িল। তখন হেমেন্দ্র জ্যেষ্ঠ-তাত, মাতা, স্ত্রীপুত্রের সহিত সেই আজন্মপ্রিয় প্রাচীন গৃহের সকলকে কুশলে রাখার জন্য দেবাদিদেবের উদ্দেশে করযোড়ে কাতর প্রার্থনা করিল।

পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল, বৈশাখের, শুক্লা ত্রয়োদশীর অস্তগামী চন্দ্র পশ্চিমাকাশ-প্রান্তে অন্তর্হিত হইতেছে। আকাশের গায়ে উড়িয়া উড়িয়া

দুই চারিটি চঞ্চল চকোর সেই ম্লান চন্দ্রালোকে খেলা করিতেছে। দূর গ্রামে কুহরিত মত্ত কোকিল-কণ্ঠধ্বনি দিগন্ত নিনাদিত করিতেছে। অচিরজাত শ্যামদূর্ব্বাদলপরিশোভিত বেলাভূমির অনেক দূর পর্য্যন্ত বর্ষার নবজল-সমাগমে খরস্রোতা কান্তিমতী নদীর মনোহর শোভা হইয়াছে। প্রভাতমলয়োৎক্ষিপ্ত বীচিভঙ্গে গ্রহ চন্দ্র তারকার শত শত উজ্জ্বল ছবি নদীবক্ষে শতধা চূর্ণিত হইতেছে। হেমেন্দ্র আর বিলম্ব করিল না।

উভয়ে সেই ক্ষুদ্র নৌকার বন্ধন বিমুক্ত করিয়া অপর তীরাভিমুখে ছাড়িয়া দিল।

হেমেন্দ্র ভাগ্য পরীক্ষা জন্য সেই অরুণোদয় সময়ে নদী উত্তীর্ণ হইয়া বিদেশে যাত্রা করিল।

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখের শেষ। পদ্মা তখনও কূলে কূলে ভরা নহে, কিন্তু নূতন বর্ষার নূতন জল প্রবল বেগে বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। নদীর মধ্যস্থ চরভূমি, দুপাশের বালুভূমি,—সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থানে গর্ভস্থ উচ্চভূমিতে বাধা পাইয়া স্রোতের জল ফাঁপিয়া উঠিতেছে; কোন কোন স্থানে "পাক" পড়িতেছে; কোন কোন স্থানে পদ্মার ভয়াল "মশিনা" বৃত্তাকারে তরঙ্গভঙ্গ করিতে করিতে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ক্রমে নদীস্রোতে বিলীন হইয়া যাইতেছে, আবার নূতন স্থানে আরও ভয়ঙ্কর বেশে সমুদ্ভূত হইতেছে। অনেক নৌকা যাইতেছে, অনেক নৌকা আসিতেছে;—কোনখানি পা'ল তুলিয়া দিয়া, কোন-খানি গুণ টানিয়া উজাইতেছে; কোনখানি ভাঁটা ছাড়িয়াছে, দাঁড় বাহিতেছে।

অতি সাবধানে, ধীরে ধীরে একখানি প্রকাণ্ড ঘোড়দৌড় নৌকা পদ্মা উজান বাহিয়া যাইতেছিল; আগে পাছে আরও তিন চারিখানি ছোট নৌকা; সকলগুলিতেই পাল। বাতাসের বেগ বেশী ছিল না; নৌকাগুলি ধীরে ধীরে চলিতেছিল। তীরস্থ মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া রাখালেরা নৌকার দিকে চাহিয়াছিল। নদীতীরে সুবিধামত স্থান পশন্দ করিয়া গ্রামের মৎস্যশীকারী প্রচণ্ড রৌদ্রতেজ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাথায় গামোছা জড়াইয়া অনুদ্দিত সুতরাং অদৃশ্য মাছের আশায় "ঘুতি" উচ্চ করিয়া মনোনিবেশে স্রোতে ভাসমান বড়শীবিদ্ধ

মাছের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বসিয়া রহিয়াছে! ঘাটে ঘাটে গ্রাম্য লোক স্নান করিতেছে। বালকেরা তীরের অত্যুচ্চভাগ হইতে লাফ দিয়া জলে পড়িতেছে; বালিকারা ক্ষুদ্র মৃৎকলসীতে ভর রাখিয়া পা ছুড়িয়া সাঁতার শিখিতেছে; গৃহিণী নববধূর চুলে খইল মাখিতেছেন, বধূ গ্রীবা বক্র করিয়া ভাসমান নৌকাশ্রেণীর গতি দেখিতেছে; অচিরস্নাতা যুবতীরা ভরা কলসী কক্ষে লইয়া সিক্তচুল ভিজাকাপড়ে দুরারোহ উচ্চ তীরভূমি অধিরোহণ করিতেছেন,—প্রতি পদক্ষেপে পতনের ভয়; যে যুবতী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়াছেন, তিনি নিজের কলসী নামাইয়া রাখিয়া পশ্চাৎবর্ত্তিনীকে হাত ধরিয়া তুলিতেছেন। শ্রীহস্তে হাত ভরা শাঁখা, শ্রীঅঙ্গে প্রশস্ত লালপেড়ে শাড়ী!

ঘোড়দৌড় নৌকা নিকটে আসিলে বালক বালিকা যুবতী বৃদ্ধা সকলে বিস্ফারিতনেত্রে তাহার বিশাল পা'ল, তরঙ্গায়িত দীর্ঘ নিশান, রঙ্ করা খড়খড়ে দরজা জানালা দেখিতেছে—একজন আর একজনকে দেখাইতেছে।

নৌকা চলিতে লাগিল। বেলা অনেক হইল, দুই প্রহর অতীত হইল। একটা ভাল স্থান পশন্দ করিয়া নাবিকেরা সেই প্রকাণ্ড নৌকা বাঁধিল। সেখানে পূর্ব্বে লোকের বসতি ছিল, পদ্মার প্রবল স্রোতাভিঘাতে তাহার অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক খড়ের ঘর তৈজস-পত্র লইয়া দূরে গিয়াছে। কয়েকটা ভিটা এখনও শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। আম, জাম, কাঁঠালের কয়েকটা গাছ রহিয়াছে। একপাশে ভাণ্ডি, বেত, কাশের একটি ক্ষুদ্র জঙ্গল নদীর জল পর্য্যন্ত নামিয়া পড়িয়াছে। শাদা, লাল, নীল, পীত নানা রঙের স্ফুট অস্ফুট ফুলের ভরে নতাঙ্গী লতাগুলি জঙ্গল বেড়িয়া রহিয়াছে। লতার সকুসুম অগ্র-ভাগ মৃদুবায়ুস্পর্শে দুলিতেছে; দুলিতে দুলিতে বার বার নদীস্রোত স্পর্শ করিতেছে। প্রবল জল তরঙ্গের বেগ ক্রমে কমিয়া পড়াতে উচ্চ তীর

ভূমির নীচে চর পড়িয়াছে। প্রথম বৈশাখের মেঘ-জলস্পর্শে সেই সমস্ত ভূভাগ অচিরজাত দূর্ব্বাদলে শ্যামলবেশ ধারণ করিয়া মনোজ্ঞ, সুন্দর হইয়াছে। কিছু দূরে একটি অতি বৃহৎ পুরাতন অশ্বত্থ গাছ বিশাল শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিশাহারা নৌযাত্রীদিগের পথ প্রদর্শকরূপে দাঁড়াইয়া ছিল।

সেই ফুল্লপুষ্প লতাময় জঙ্গল উজানে রাখিয়া তাহার পাশে, আম কাঁঠাল গাছের ছায়ায় মাঝিরা প্রকাণ্ড নৌকা তারলগ্ন করিয়া বাঁধিল, নোঙ্গর করিল, নৌকার কাছি আমগাছের শিকড়ের সঙ্গে দৃঢ় করিয়া বাঁধিল। সঙ্গীয় তিন চারি খানি ছোট নৌকা সেই ঘোড়দৌড়ের কিছু দূরে ভাঁটার দিকে রাখিল। অনেক লোক জন নৌকা হইতে নামিল। বড় নৌকার সিঁড়ি ফেলিয়া তীরে নামিবার সুবিধা করিল। সেই ক্ষুদ্র জঙ্গল একপাশে রাখিয়া পরদা কানাত দিয়া প্রায় বুক জল হইতে উপরে বৃক্ষমূল পর্য্যন্ত স্থানটা ঘিরিয়া ফেলিল। নৌকা হইতে একজন সম্ভ্রান্ত পুরুষ নামিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইবে; দীর্ঘ পক্ক শ্মশ্রু, বিস্তৃত ললাট, গৌর দেহ—জাতিতে মুসলমান। নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া বৃদ্ধ সেই কানাত-বেষ্টিত স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তীর ভূমিতে উঠিলেন। দুই তিনটি পরিচারিকা নামিল।

শেষে সেই পরিচারিকাধৃত পরদার আড়ালে আড়ালে দুইজন স্ত্রীলোক নামিলেন। বাহির হইতে তাঁহাদের দেহ পরিলক্ষ্য হইল না। নৌকা হইতে তীরে অবরোহণ সময়ে সিঁড়ির উপর তাঁহাদের অলক্তক-রক্তবৎ চরণ মাত্র ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইল। যিনি অল্প বয়স্কা, তাঁহার চঞ্চল, লঘুপদস্পর্শে সিঁড়ি ঈষৎ কম্পিত হইল মাত্র; যিনি বয়স্কা, তিনি নিশ্চয়ই ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন না, ধীরে ধীরে নামিলেন; তাঁহার প্রতি পদ-ক্ষেপে সিঁড়ি ঈষৎ নমিত হইতে লাগিল।

বয়স্কা বলিলেন;—"সুরত, দাঁড়া; আমি আসি।"

নবীনা বলিল ;—"এস না ; ভয় কি ? এখানে জল বেশি নয় ; পড়িয়া গেলেও তো ডুবিয়া যাইবে না !"

তখন দুইজনের মধুর মৃদু হাস্যধ্বনি কানাতের বাহির পর্য্যন্ত পৌঁছিল।

চির পিঞ্জর নিবদ্ধা হরিণী যেমন ক্ষণিক স্বাধীনতা পাইলে চঞ্চলপদে দৌড়াইতে চায়, অথচ অনভ্যস্ত পদ প্রতিবিক্ষেপে স্খলিত হইতে চায়, নবীনার তাহাই হইল ;—মুখ ভরা হাসি, চোখ ভরা চলৎ বিদ্যুৎ, সর্ব্ব শরীর ভরা স্ফুরৎ লাবণ্য লইয়া সেই বৃক্ষচ্ছায়া-শীতলা, দূর্ব্বাদল-শ্যামলা তীর-ভূমির লতা কুঞ্জের ধারে, উচ্চ তীরে, গাছের নীচে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। দূরে গ্রাম ; আম, কাঁঠাল, জাম, তাল, তেঁতুল গাছের শ্যামল শোভা। বিস্তৃর্ণ মাঠ ; বেগবতী পদ্মার বহুদূর বিস্তারী জলোচ্ছ্বাস দেখিয়া নবীনার উৎসাহফুল্লমুখ জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল। বয়স্কা পারিয়া উঠিলেন না ; গাছের তলায় বসিয়া পড়িলেন।

নবীনা। "লোকে এমন সকল স্থান ফেলিয়া সহরের অন্ধকারে, বাঁধা ফাটকে থাকে কেন ?"

বয়স্কা। "মণিমাণিক্য হীরা জহর মাটির নীচে, পাহাড়ের কোণে অন্ধকারে থাকে, শুনিস্ নাই কি ?"

নবীনা। "জ্বলুক্ গিয়া ! এই খোলা হাওয়ায় দম ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচিয়া উঠে।"

বয়স্কা। "খোলা যায়গায় ঝড় তুফানের ভয়।"

নবীনা। "দড়ি কাছি, থাম খুটি ঠিক থাকিলে ঝড়ের ভয় কি ?"

বয়স্কা। "পক্ষিণীর মত উড়িয়া বেড়াইবার তোর সাধ ! তাই কি মিরজাদের পিঞ্জরায় ঢুকিতে চাহিস্ নাই !"

নবীনা। "তা, অন্ধকারেই তো শয়তানের ভয়।"

বয়স্কা। "কাহাকে তুই শয়তান দেখিলি ?—মিরজা গোষ্টী বুনিয়াদি ঘর ; বহু পরিবার, দান খয়রাতে জেরবার হইয়াছে।"

নবীনা মুখভঙ্গি করিয়া বলিল ;—"শয়তানের বুনিয়াদ !"

বয়স্কা। "মৌলবী মিরজা কুদরত আলি পরম ধার্ম্মিক ছিলেন।"

নবীনা। "তাঁহার বংশে কি আর কুলোক জন্মিতে পারে না ?"

বয়স্কা। "কুলোক !"

নবীনা। "নয় কেন ?—পিতার ঐশ্বর্য্য অপব্যয়ে ক্ষয় হইয়াছে, যশ কলঙ্কে ছাইয়াছে !—করিমন্ বিবি বিষ খাইয়া মরিল কেন ? "

বয়স্কা। "সে পাগল হইয়াছিল।"

নবীনা। "পাগল ?—কেন পাগল হইল ?"

বয়স্কা। "সংসারে যার সহিষ্ণুতা নাই, সে হয় ত পাগল হয়, নতুবা আত্মহত্যা করে। স্ত্রীলোক, অনেক সহিয়া থাকিতে হয়।"

নবীনা। "বুকে ছুরি মার, সহা যায় ; অন্তরে সূচীর আঘাতও যে কতজন সহিতে পারে না !"

বয়স্কা। "মিরজা গোলাম আলির কি বা বয়স ; ও বয়সে কত পুরুষের উচ্ছল প্রকৃতি থাকে, দু দিনে তাহা সুধরাইয়া যায়।"

নবীনা। "শুনিয়াছি, বয়স প্রায় চল্লিশের কাছে কাছে হইয়াছে।"

বয়স্কা। "তা'তেই কি হইয়াছে ?"

"কিছু হয় নাই, দিদিমা !"—বলিয়া নবীনা অগ্রসর হইল ; বয়স্কার পৃথুল স্কন্ধে আপনার সুগোল সুললিত বাহু স্থাপন করিয়া তাঁহার ললাটদেশ পরিচুম্বিত করিল এবং তন্মুহূর্ত্তেই বন্ধনমুক্তা হরিণীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহার কর্ণিকারকুসুমতুল্য ক্ষুদ্র কর্ণবিলম্বী মণিময় দুল বিকম্পিত হইয়া চারুগণ্ড, অংশদেশের লাবণ্য আরও উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। নবীনা বলিল ;—

"দিদিমা, চল না ; উপরের দিকটা একবার দেখিয়া আসি।"

বয়স্কা। "তোর সঙ্গে তো আর দৌড়াইয়া পারিব না ! তুই যা, আমি আসিতেছি।"

নবীনা চঞ্চল চরণে তটভূমি অধিরোহণ করিতে লাগিল। বয়স্কাও উঠিলেন; মনে মনে কহিলেন ;—

"ঈশ্বর জানেন, এ চঞ্চলা হরিণী কোন মায়াবীর মোহমন্ত্রে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবে!"

নৌকা হইতে একজন দাসী পাণ লইয়া আসিল। বয়স্কা সোণার ডিবা হইতে পাণ গ্রহণ করিলেন এবং তটাধিরূঢ়া নবীনাকে দেখাইয়া দিয়া স্বয়ং মন্থরগমনে দাসীর অনুসরণ করিলেন। সেই ক্রমোন্নত ভূমিভাগ অতিক্রম করিয়া তটে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইতে তাঁহার বিলম্ব হইল। নিকটে যাইয়া দেখিলেন, দাসী পাণ পাত্র হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, নবীনা কানাতের অন্তরাল হইতে মুগ্ধনেত্রে কি যেন দেখিতেছে। বয়স্কা মৃদুপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অনতিদূরে এক পুরাতন বটবৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াইয়া নবীনার পিতা একটী যুবকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। যুবকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ সুগঠিত গৌরদেহ, বিশাল বক্ষ, পুরুষোচিত দৃঢ় মাংসপেশী সমন্বিত শৌর্য্য লাবণ্যশালী বাহু, নবোদিত নিবিড় কৃষ্ণ গুম্ফ, বায়ুভরে কম্পিত স্ফীত বাবরী কেশ। দেখিয়া বয়স্কা মনে মনে স্বীকার করিলেন,—যুবক যেই হউক না কেন, তাহার দেহৈশ্বর্য্য চিত্তমুগ্ধকারীই বটে। তখন হঠাৎ নবীনার পৃষ্ঠস্পর্শ করিয়া কহিলেন ;—

"কিলো, শেষে কি পথে ঘাটে চিত্ত বিকাইবি নাকি!" অতর্কিত সম্বোধনে নবীনার গৌর মুখমণ্ডল আকর্ণ আরক্ত হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নবাব সুজাউদ্দিনের আমলে তিন জন উদ্যোগী পুরুষ ভাগ্য পরীক্ষার্থে বঙ্গদেশের রাজধানীতে আগমন করেন। তিন জনই সম্ভ্রান্ত বংশীয়, শিক্ষিত এবং উদ্যমশীল লোক ছিলেন। তিন জনেই প্রায় এক সময়ে নবাব সরকারে প্রথম প্রবেশ করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজী আহম্মদ খাঁ নবাব সরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালে ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় আলীবর্দ্দী খাঁ সমস্ত বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার নবাব হইলেন। তৃতীয় ব্যক্তির নাম আহম্মদ কাশেম আলি খাঁ। তিনি নবাব সরকারে তত প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতিগতিও সেদিকে ছিল না। ঢাকা জালালপুর অঞ্চলে বৃহৎ এক জমিদারী প্রাপ্ত হইয়া তাহার শাসন সংরক্ষণ, ধর্ম্মচর্চ্চা এবং বিদ্যালোচনাতে তিনি দিন অতিবাহিত করিতেন। নবাব আলী-বর্দ্দী খাঁর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল। মুরসিদাবাদের অনেক আমীর ওমরাহের সঙ্গে তাহার বন্ধুতাও ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে মুরসিদাবাদ যাইয়াও বাস করিতেন।

আলীবর্দ্দী খাঁ যখন স্বীয় দৌহিত্র মিরজা মহম্মদ খাঁকে ভাবী উত্তরা-ধিকারী স্থির করেন তখন তাঁহার অন্যতর জামাতা ঢাকার শাসনকর্ত্তা নোয়াজেস মহম্মদ খাঁ নিজের ভাবী উন্নতি পক্ষে বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত দেখিয়া দেওয়ান হোসেন কুলিখাঁর প্রতি ঢাকার শাসন ভার রাখিয়া স্বয়ং অধিকাংশ সময় মুরসিদাবাদ থাকিতেন। পেস্কার রাজবল্লভই ঢাকার প্রকৃত শাসনকর্ত্তা হইলেন। রাজবল্লভ স্বীয় প্রভুর স্বার্থসিদ্ধি

পক্ষে গোপনে নানা চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য নবাব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া কাশেম আলি খাঁ ঢাকায় অবস্থিতি করিতেছিলেন।

সংসারে কাশেম আলি খাঁর একমাত্র সন্তান কন্যা সুরত-উন্নিসা। পাঁচ বৎসরের কন্যা রাখিয়া সুরতের মাতা পরলোক গমন করেন; কাশেম আলি খাঁ আর বিবাহ করেন নাই। তাঁহার দূরসম্পর্কীয়া এক পিতৃস্বসা সেই হইতে বালিকাকে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিতা নবীনাই এই সুরত উন্নিসা এবং বয়স্কাই তাহার প্রতিপালিকা সরিফ্‌উন্নিসা বেগম। লোকে তাঁহাকে সরিফন বেগম বলিত। সুরত সরিফন বেগমকে দিদিমা বলিয়া ডাকিত।

সুরত পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। পিতা একরূপ সংসারত্যাগী, দিবা রাত্রি জপতপে, ধর্ম্ম চর্চ্চায় নিযুক্ত; কন্যা যে বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিয়াছে, সেদিকে তাঁহার তত দৃষ্টি ছিল না। বিশেষতঃ একমাত্র সন্তান, বিবাহ দিলেই পরের ঘরে যাইবে, তখন তো শূন্য গৃহ একেবারে শ্মশান তুল্য হইয়া উঠিবে। সুরতের বিবাহে বড়ই বিলম্ব হইতে চলিল।

এদিকে সুরতের অসামান্য রূপের কথা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অন্তপুরঃ হইতে অন্তঃপুরে বার্ত্তাবাহিনী দাসী বাঁদীর বাক্‌পটুতায় সুরতের রূপ গুণ, শিক্ষা, স্বভাবের কোন কথা অপ্রচারিত রহিল না। অনেক স্থান হইতে তাহার বিবাহের প্রস্তাব আসিতে লাগিল, কোনটাই খাঁ সাহেবের মনঃপূত হইল না।

একদিন বিকাল বেলায় একজন স্ত্রীলোক খাঁ সাহেবের অন্তঃ-পুরে প্রবেশ করিল। তাহার বয়স ত্রিশ বৎসর হইবে। কতকটা গৌরবর্ণাই বটে, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব এবং ঈষৎ স্থূলাঙ্গী। হাত পায়ের নখ মেহেদি পাতার রসে রঞ্জিত, স্থূলাধর তাম্বুলরক্ত। সুরত উন্নিসার

বাঁদী পিয়ার বারান্দায় বসিয়া স্বীয় কর্ত্রীর একগাছা হার নূতন করিয়া গাঁথিতেছিল। স্ত্রীলোকটী সেখানে উপস্থিত হইল। পিয়ার বলিল ;—

"তুমি কে গা ?"

স্ত্রীলোকটী তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিয়া পিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিয়ার আবার জিজ্ঞাসা করিল ;—

"তুমি কে ?"

স্ত্রীলোকটী পিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়াই বলিল ;—

"না ; সেই মুখই বটে ; অনেক দিনের কথা।—তুমি পিয়ার বিবি !"

তখন পিয়ারও আর একটুকু মনোযোগের সহিত স্ত্রীলোকটীর মুখের দিকে চাহিল,—তাহার শরীর কাঁটা দিয়া উঠিল, বলিল ;—

"সে কি ! পান্না নাকি ?"

"চিনিয়াছিস্ ! আমার কত ভাগ্য !"

পিয়ার মনে মনে বলিল ;—"এখনো জাহান্নমে যাও নাই, পোড়ার-মুখী !" প্রকাশ্যে—"তোকে চিনিব না ?—তুই না মুরসিদাবাদে ছিলি ?"

"সেখানে পাঁচ ছয় বৎসর ছিলাম। মন টিকিল না, আবার এখানে ফিরিয়াছি।"

"এখানে কোথায় আছিস্ ?"

"মিরজাদের ছোট তরপে। আমি এখন মিরজা গোলাম আলির অন্দরের বাঁদী।"

"কেমন আছিস্ ? বেগমের নেক্ নজর আছে ?"

"আমার মনিব বেগম হুনিয়া ছাড়িয়াছে।"

"করিমন বেগম ?—জহর ?"

"হাঁ।"

"বোস্ না।"

"তোর মুখে গুল, গুলাববৃষ্টি হউক ; বসিতে বলিলি ! তোর রাগ কি এখনো যায় নাই ?"

"চালাকি ছাড়্। তোর উপর রাগ রাখ্‌বো, তুই কি সেই যোগ্যের লোক ?"

"বড় পিয়ারা বাঁদী হইয়াছিস্ কি না ? তা বলিতে পারিস্।"

"কাহার পিয়ারা বাঁদী ? খাঁসাহেব কাশেম আলি খাঁ আমার বাবজানের তুল্য। আমি বিবি স্নরত-উন্নিসার বাঁদী।"

"কার এ কণ্ঠমালা ?"

"মনিবের।—তুই কোথায় যাইতেছিলি ?"

"এখানেই আসিয়াছি।"

"কেন ?"

পান্না পিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল ;—

"নূতন মনিব খুঁজিতে।"

"এবাড়ীতে যে নূতন বাঁদীর দরকার পড়িয়াছে তাহা তো শুনি নাই।"

পান্না হাসিয়া বলিল ;—

"তোর খোদকস্তে সরিকি চাই না। মিরজা সাহেবের জন্য বেগম খুঁজিতে বাহির হইয়াছি।"

"বেগম খুঁজিতে ! কোথায় বেগম ?"

"এ কার মালা,গাঁথিতেছিস্ ?"

"বিবি স্নরত-উন্নিসার।"

"কেমন সুন্দরী ?"

"এমনটি আর দেখিস্ নাই।"

"কত বয়স ?"

"পোনের যোল।"

এমন সময় উপর হইতে মৃদু বায়ুস্রোতে এস্‌রাজের সঙ্গে মৃদু মধুর গীতিধ্বনি সেখানে পৌছিল।

পান্না জিজ্ঞাসা করিল ;—"কে বাজায় রে ?"

"স্বর্গের পরী।"

"একবার দেখিতে পারি ?"

"পারবি না কেন ? তুই কি কাণা হইয়াছিস্ ?—একটুকু বোস্, মালা ছড়াটা সেরে নি।—পাণ খা।"

পিয়ার নিকটস্থ পাণের ডিবা পান্নার হাতে দিল। পান্না পাণ খাইতে খাইতে একবার সেই জ্যোতির্ম্ময় বহুমূল্য স্বর্ণ হারের দিকে, আর বার সেই বাড়ীর চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। পিয়ার মনে মনে কহিল ;—"ও পোড়ারমুখী, রাজ্যে আর মানুষ পাও নাই। যে ঘরে তুমি ডাইনী পেয়ারা বাঁদী, সেই ঘরে সুরত বিবিকে নিবে ?"—প্রকাশ্যে বলিল ;—

"পান্না, তোর মর্‌জি কি, বল্ দেখি।"

"মরজি কি আর বুঝিতে পারিস্ নাই ?—সহরে রাষ্ট্র, সুরত বিবির মত সুন্দরী আর বঙ্গদেশে নাই। মিরজা সাহেব তাই এতবার বিবিকে দেখিয়া যাইতে ফরমাইস্ করিয়াছেন।"

"মিরজা সাহেব কি আবার বিবাহ করিবেন ?—ঘরে তো এখনো তিন বেগম আছে।"

"তাহারা সুরত বিবির বাঁদী হইবে।—বাসি ফুলের কি আর আদর থাকে !"

পিয়ার মনে মনে কহিল ;—"আর তুই পোড়ারমুখী সকলের উপর সরফরাজ হইবি ?—সুরত বিবি রাজী হইবে ? মতির মালা—গলায় পরিবে ?" প্রকাশ্যে বলিল ;—

"আর আমার দশা কি হইবে ?"

"তুই সঙ্গে যাবি ; পরম সুখে থাক্‌বি।"

পিয়ার মনে মনে কহিল ;—"তোমার মুখে আগুন। মিরজা মহলে তোমার কর্ত্তৃত্ব, তোমার তাবে আমি !"

তখন মালা গাঁথা শেষ হইল। পিয়ার বলিল ;—

"চল্, উপরে যাই। কোন দেশে যা দেখিস্ নাই, তা দেখ্‌বি এখন।"

উভয়ে সিঁড়ি দিয়া উপরের বারান্দায় উঠিল। বারান্দায় প্রবেশমাত্র তাহাদের কর্ণে অমৃতবর্ষণ হইতে লাগিল। পার্শের এক কক্ষ হইতে এসরাজের মৃদুমধুর স্বরলয়যুক্ত মধুবর্ষী এক গদ্গদ গীতধ্বনি তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাহারা আরও অগ্রসর হইয়া কক্ষ দ্বারের নিকট দাঁড়াইল। তখন সেই মধুর কণ্ঠের চিত্তদ্রবকারী গীত পদগুলি স্পষ্ট শ্রুত হইল ;—

"বাদসাহা জোরমে মারা দর্‌গোজ্জার।
মা গোণাহগারেম্ তু আমর্‌জগার॥"

* * * *

পিয়ার কক্ষে প্রবেশ করিয়া পান্নাকে ইঙ্গিত করিল, পান্নাও প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখিল, মুক্ত জানালার নিকট দুগ্ধশুভ্র আস্তরণে আচ্ছাদিত সুকোমল শয্যায় বসিয়া এস্‌রাজের সঙ্গে এক তরুণী একান্ত-চিত্তে গান করিতেছেন। তাঁহার নিবিড়কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশদাম পৃষ্ঠ, অংশ, গণ্ডদেশ পর্য্যন্ত ছাইয়া পড়িয়াছে। সুন্দর গৌর মুখমণ্ডল কৃষ্ণকেশপাশসান্নিধ্যে সদ্য মেঘমুক্ত চন্দ্রবিম্বের মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। সঙ্গীতের ভাবতরঙ্গে মজ্জমান তরুণীর আয়ত নয়ন দ্বয় ঈষৎ নিমীলিত, দীর্ঘ পক্ষ্মশ্রেণী গলদশ্রুকণায় অবনমিত। তাঁহার মণিময় কর্ণাভরণ কৃষ্ণকেশপাশের অন্তরালে মেঘপ্রান্তে বিদ্যুৎবিভ্রম জন্মাইতে-ছিল। গীতানুরোধে ঈষদ্বিভিন্ন রক্ত অধরৌষ্ঠ মধ্যে কুন্দশুভ্র, অবিরল-

সন্নিবেশ দন্ত-পুংক্তির আংশিক শোভা মৌক্তিক লাবণ্য বিকীরিত করিতেছিল। নিভৃতে স্বচ্ছন্দাবস্থিতা তরুণীর ঈষৎ অসংবৃত ক্ষীণদেহের লাবণ্যবৈভব দেখিয়া পান্নার চক্ষু মুগ্ধ হইল; সে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল, এই স্বর্গসম্ভবা তরুণী বিবি সুরত-উন্নিসা!

তরুণীও পিয়ারের সঙ্গে আগত সেই অপরিচিত স্ত্রীলোকটীকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। এস্‌রাজ শয্যার উপর রাখিয়া দিলেন, গণ্ডে, বক্ষে বিক্ষিপ্ত কেশরাশি সরাইয়া, অসংবৃত দেহে যথা-যোগ্য বস্ত্র বিন্যস্ত করিয়া বলিলেন;—

"পিয়ার, এ কে?"

"ইহার নাম পান্না, আমার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়। অনেক কাল পরে আজ দেখা হইল।"

সুরত মধুর কণ্ঠে পান্নাকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

"তুমি এই সহরেই থাক?"

পান্না। "হাঁ; আমি মিরজা সাহেবদের অন্দরের বাঁদী

সুরত। "এ পাড়ায় কোন কাজ ছিল?"

পান্না। "কাজ আর কিছু নহে; মিরজা মহলে শুনিয়াছি, আপনার মত সুন্দরী সহরে নাই; তাই একবার দেখিতে আসিয়াছি।"

সুরতের গৌর মুখ রক্তিমাভ হইয়া উঠিল।

পিয়ার। "কেমন দেখিলি?"

পান্না। "দেখিলাম,—দুনিয়ার এমনটী আর নাই; স্বর্গে থাকিতে পারে।"

পিয়ার। "তুই কি দুনিয়ার সকল সুন্দরীকেই দেখিয়াছিস্?"

পান্না। "এমন সুন্দরী দুনিয়ায় থাকিলে মুরসিদাবাদে নবাবের অন্তঃপুরে অবশ্যই দেখিতে পাইতাম। সেখানেও এমনটী নাই।"

পিয়ার। "মিরজাদের অন্দরে?"

পান্না। "ইঁহার বাঁদী হইবার যোগ্য আছে।"

আরও অনেক কথা হইল। বাক্‌বিদগ্ধা পান্নার চাটুবাক্যে সুরত লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইল। অবশেষে পান্না উঠিল, তরুণীকে সেলাম করিয়া বলিল ;—

"আজ যাই, বিবিসাহেবা; দেখিতে আসিয়াছিলাম, দেখিলাম; চক্ষু সার্থক হইল। ঈশ্বর করিলে আরও দেখিব।" পিয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল ;—"প্রথম আসিয়াছি, পথ চিনিতে পারিব না। একবার সিঁড়ির পথটা দেখাইয়া দিবি ?"

অন্দরের দরজায় পৌঁছিয়া পান্না বলিল ;—

"আজ চলিলাম, ঈশ্বর করিলে কতবার আসিব। তুই এখানে আছিস্,—তুই তো দেখিতেছি, এ পরীর সোণার কাঠি রুপার কাঠি, তুই সাহায্য করিবি তো ? মিরজা সাহেবেরা বড় মানুষ; বড় মানুষ খুসি হইলে এমদাদ্ বখ্‌সিস্ প্রচুর। আজ যাই, আমার কথা মনে রাখিস্।"

পান্না চলিয়া গেল। সেই খানে দাঁড়াইয়া পিয়ার মনে মনে কহিল ;—

"ও পোড়ারমুখী, তোমার কথা মনে রাখিব ?—দেখি আগে সুরত বিবির কি মত। আমার নাম পিয়ার-উন্নিসা, এমদাদের লোভে এমন সোণার পরীকে দৈত্যদানার হাতে তুলিয়া দিব আমি ?"

কিছুকাল পরে উপরের ঘরে পিয়ার সুরতের চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, সম্মুখে বৃহৎ আরসী। মুকুরে প্রতিবিম্বিত নিজ মুখের ছবি দেখিতে দেখিতে সুরত বলিল ;—

"কে ও স্ত্রীলোকটা আসিয়াছিল রে, পিয়ার ?"

"ও মিরজা মহলের বাঁদী।"

"ওর সঙ্গে তোর পরিচয় আছে ?"

"অনেক দিন আগে ছিল।"

"লোকটা কি রকম রে ?"

"মাগী ভারি বজ্জাত।"

"কেন আসিয়াছিল।"

"তোমাকে দেখিতে।"

"আমাকে দেখিতে !—কেন ?"

"ও যে মিরজা গোলাম আলির বাঁদী।"

"তাই কি ?"

পিয়ার সম্মুখস্থ মুকুরে প্রতিফলিত সুরতের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল ;—

"মিরজা গোলাম আলির বেগম যে মরিয়াছে, তা শুন নাই কি ?"

"শুনিয়াছি ; বিষ খাইয়া মরিয়াছিল, অনেক কথা তখন শুনিয়াছিলাম। অত অপমানে এত দিন যে বাঁচিয়া ছিল তাহাই আশ্চর্য্য।"

পিয়ার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল ; সুরত বলিল ;—

"চুপ করিলি যে ?"

"মিরজা আবার বিবাহ করিবে।"

"আরও তো বেগম আছে।"

"তিনটি।—পান্না আসিয়াছিল তোমাকে দেখিতে।"

"অভিপ্রায় ?"

তখন চুল বাঁধা শেষ হইয়াছিল। পিয়ার বলিল ;—

"অভিপ্রায় ?—সহরময় তোমার রূপের কথা রাষ্ট্র। মিরজা পান্নাকে পাঠাইয়াছিল পরীক্ষা করিতে। মিরজার ইচ্ছা—তোমাকে—তোমাকে বেগম করিবে।"

পিয়ার মুকুরাভ্যন্তরে চাহিয়া দেখিল ;—সুরতের উজ্জ্বল সুন্দর মুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে চকিত হইয়া উঠিল, তাহার দুই চক্ষে ঘৃণাসূচক নিমেষক্ষেপ

হইল, অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত হইল,—হঠাৎ সমীপাগত অপবিত্র দ্রব্য সংস্পর্শ-ভয়ে মানুষ যেমন গাত্র সঙ্কুচিত করে, সুরতের ফুল্লদেহলতা যেন তেমনি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। পিয়ার কতকটা আশ্বস্ত হইল, বলিল ;—

"মিরজা সাহেবেরা জাহাঙ্গীর নগর মধ্যে গণ্যমান্য বুনিয়াদি লোক।"

সুরত মুখ ফিরাইয়া পিয়ারের দিকে স্নিগ্ধনেত্রে চাহিল, অতি কোমলকণ্ঠে বলিল ;—

"পিয়ার, তোকে কি আমি দাসী বাঁদীর মত দেখি ?"

পিয়ারের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে বলিল ;—

"তুমি তাহা ভাব না, জানি। কিন্তু আমি কায়মনোবাক্যে তোমার বাঁদী, চিরকাল তোমার বাঁদীই থাকিব। তোমার বাঁদী হইয়া আমার যে সুখ, সাহজাদী—বাদসাহের বেগম হইলেও সে সুখ আমি পাইতাম না।"

চুল বাঁধা শেষ হইল। সুরত উঠিয়া দাঁড়াইল, মধুর করুণ চক্ষে পিয়ারের মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া শেষে বলিল ;—

"ও স্ত্রীলোকটা যেন আর আমার কাছে না আসে।"

"তোমার অনিচ্ছা, তার সাধ্য কি আর এবাড়ীতে প্রবেশ করে ?"

সুরত সেই নবরচিত কবরীভূষিত আপনার ক্ষুদ্র মস্তক পিয়ারের স্কন্ধে স্থাপন করিয়া নিঃসঙ্কোচ নির্ভরে তাহাকে আলিঙ্গন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময় জাহাঙ্গীর নগরের মিরজা গোষ্ঠীর অন্যতর বংশধর মিরজা গোলাম আলি আমিরী-আনাতে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। অল্প বয়সে অতুল সম্পত্তির অধিকারী; স্বার্থপর আত্মীয়পরিজনবর্গের সংসর্গে তাঁহার চরিত্র ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রধানা স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। সুরত-উন্নিসার অসামান্য রূপলাবণ্যের কথা শুনিয়া গোলাম আলি তাহার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব কাশেম আলিখাঁর নিকট উপস্থিত করাইলেন। মিরজা গোষ্ঠী বিশেষ সম্ভ্রান্ত ঘর, সম্পত্তির অনেকাংশ নষ্ট হইলেও যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। কাশেম আলি খাঁ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন। কন্যা বড় হইয়াছে, মিরজা গোষ্ঠীও অকরণীয় ঘর নহে। কিন্তু গোলাম আলির উচ্ছৃঙ্খল চরিত্র ও তৎপরিবারের অশান্তি বিসম্বাদের কথা তিনি সকলই শুনিয়াছিলেন। মন কোন মতেই অগ্রসর হয় না। শেষে এক দিন সরিফন বেগমকে বলিলেন;—

"সুরতের বিবাহের কি করা যায়?"

সরি। "কি আর করিবে?—তাহার যে বিবাহ দিতে হইবে, সে কথা কি তোমার মনে হয়?"

"কেন? কত চেষ্টা করিতেছি, ভাল ছেলে তো দেখি না।"

"কত সংবাদ আসে শুনি, কোন খানেই তো ঠিক হয় না।"

"যেখানে সেখানে তো করিতে পারি না। মিরজা গোলাম আলি প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া পাঠাইয়াছে; তোমার কি মত?"

"মিরজা গোলাম আলি? তার সঙ্গে করিতে কি আপত্তি হইতে পারে? প্রাচীন ঘর, অত বড় সম্পত্তি;—সকল রকমেই ভাল।"

"তার চরিত্রের কথা কি কিছুই শুন নাই ?"

"পুরুষের চরিত্রে কি আসে যায় ? নূতন বয়স, দুদিন পরেই শুধ্‌রে যাবে। এই খানেই কর। মেয়ে বড় হইয়াছে, আর কত দিন ঘরে পুষিবে ?"

"সুরত রাজী হইবে ?"

"তার রাজী গররাজীতে কি আসে যায় ?—তুমি যেখানে ভাল বুঝিবে, সেই খানেই করিবে।"

"সুরত বড় হইয়াছে, লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে ; তাহার মনের ভাব জানিতে পারিলে ভাল হইত। গত বৎসর সৈয়দ আহমদের পুত্রের সহিত কথা উপস্থিত হয়, সুরতের বাঁদী আমার কাছে তাহার কত নিন্দা চর্চ্চা করিল, তাহা তো শুনিয়াছ।"

"এই বাঁদীগুলোর জ্বালায় কোন কাজ হইবে না। সহরের যত খবর তিলে তাল করিয়া সুরতের নিকট দরপেস্ করে। বজ্জাতী-গুলোকে ঝেঁটা মারিয়া তাড়াইতে হয়।"

"তা পার, তাড়াইও। এখন কোনরূপে সুরতের মনের ভাব কিছু বুঝিতে পার কি না, দেখ।"

সরিফন বেগম সেখান হইতে উঠিয়া নিজের ঘরে যাইতে সিঁড়ির ঘরে নীচে একটা গোলযোগের শব্দ শুনিয়া দাঁড়াইলেন। পিয়ার বলিতেছিল ;—

"মিরজা সাহেবকে বলিস্, সুরত বিবির বাঁদী তোকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিল না।"

একটি স্ত্রীলোক বলিল ;—"বাঁদীর এতদূর বুদ্ধি ?"

পিয়ার। "—বলিস্, আসমানের চাঁদ খাটো হাতে ধরা যায় না।"

স্ত্রীলোক। "কার খাটো হাত বল্‌ছিস্ রে পোড়ার মুখী ?—সাত পুরুষের পুণ্য তোদের—মিরজা সাহেব পশন্দ কোরেছে !"

পিয়ার। "দূর হ, হতভাগী।—কে আছিস্ রে, মাগীকে ঝেঁটাপেটা ক'রে দে তো।"

উপর হইতে সরিফন বেগম বলিলেন,—

"কিরে পিয়ার, কার সঙ্গে ঝগড়া কচ্চিস্?"

স্ত্রীলোক। "আচ্ছা; আমার নাম পান্নাবিবি, আমাকে তুই চিনিস্, এর শোধ এক দিন লইব। আসমানের চাঁদ মিরজা সাহেবের পায় গড়াগড়ি যাইবে।"

পিয়ার। "কিরে হারামজাদী, দাঁড়া, দেখাচ্ছি।"

তখন খিড়্কির দরজা জোরে বন্ধ হইয়ার শব্দ শ্রুত হইল। আরক্ত মুখ কম্পিত কলেবরে পিয়ার সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিল। সরিফন বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কিরে পিয়ার, কি হইয়াছে? কা'র সঙ্গে ঝগড়া করিতেছিলি?"

পিয়ারের রাগ তখনও পড়ে নাই, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল;—

"সেই মাগী আজ আবার আসিয়াছিল!"

"কে আসিয়াছিল?"

"পান্না।"

"পান্না কে?"

"মিরজা গোলাম আলির বাঁদী।"

"তাহার সঙ্গে ঝগড়া!—কেন? সে কি আর কোন দিন এ বাড়ীতে আসিয়াছিল?"

"আসিয়াছিল। সুরত বিবিকে দেখিয়া গিয়াছে। আজ আবার আসিয়াছিল। বিবি মানা করিয়াছে, তাই আজ মাগীকে বাড়ীতে ঢুকিতে নিষেধ করিলাম। বজ্জাতী জোর করিয়া উপরে আসিতে চায়!"

"কেন? সুরত মানা করিয়াছে কেন?"

পিয়ার তখন সকল কথা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া বেগম পিয়ারকে

অত্যন্ত ভৎসনা করিলেন। বেগম তাহার পর সুরতের ঘরে প্রবেশ করিলেন। সুরত এ গোলযোগের কথা কিছুমাত্র শুনে নাই; শয্যায় পড়িয়া একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছিল। বেগমসাহেবাকে দেখিয়া পুস্তক রাখিয়া দিয়া উঠিয়া বসিল, বলিল ;—

"কি দিদিমা, আজ বিকালে যে তোমাকে দেখিতেই পাই নাই। কোথায় গিয়াছিলে?"

সরিফন বেগম সুরতের নিকটে শয্যায় বসিলেন। তাহার সরল প্রফুল্ল মুখ দেখিয়াই বেগম সাহেবার রাগ অনেক কমিয়াছিল; তিনি বলিলেন ;—"একা একা কি করিতেছিলি?"

"পড়িতে ছিলাম।"

"পড়িয়া পড়িয়া চোক্ দুটি যে খোয়াবি দেখ্‌ছি!"

"সুরত প্রফুল্ল চক্ষে দিদিমার দিকে চাহিল। সেই চক্ষু! নিবিড় কৃষ্ণ তারকা-সমন্বিত সেই দীপ্তিময় চক্ষু ;—সুর্ম্মা-সংলেপে তাহার জ্যোতি যেন আরও উজ্জ্বল হইয়াছে।—দীর্ঘ কোমল পক্ষ্ম কেমন ঘন, কেমন প্রগাঢ় কৃষ্ণ! তাহার উপর সেই বালেন্দুবক্র ভ্রূ! দেখিয়া দিদিমার রাগ একেবারে চলিয়া গেল। তিনি দুই হাতে সুরতের দুইগণ্ড মৃদু চাপিয়া ধরিয়া সেই সুন্দর মুখ কাছে আনিলেন; সে মুখ বার বার চুম্বন করিয়া বলিলেন ;—

"পড়িয়া শুনিয়া তো একটা মৌলবী হইয়া উঠিলি। আর কি কোন কাজ নাই? এখন তো বড় হইয়া উঠিয়াছিস্, ঘর সংসার করিবি না? —একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।—মিরজা গোলাম আলীর একটা বাঁদী কি একদিন এখানে আসিয়াছিল?"

সুরতের হাসিময় মুখ অকস্মাৎ চমকিত হইয়া উঠিল। সরিফন বেগম তাহা দেখিতে পাইলেন। সুরত একটুকু ক্ষীণ স্বরে বলিল ;—

"একদিন একটী স্ত্রীলোক বেড়াইতে আসিয়াছিল।"

"তাকে কি পুনরায় এ বাড়ীতে আসিতে মানা করিয়াছিলি ?"

"তাকে কিছু বলি নাই।"

"পিয়ারকে বলিয়াছিলি ?"

সুরত। "লোকটা ভাল নয়।—বড় বেশি কথা বলে।"

সুরতের গণ্ডবিক্ষিপ্ত, বেণীভ্রংশ ছোট ছোট অবাধ্য চুলগুলিকে মৃদু হস্তে অপসারিত করিয়া সরিফন বেগম বলিলেন ;—

"মিরজা গোলাম আলির নাম শুনিয়াছিস্?—বড়লোক, সহরে বিখ্যাত আমির। আজ চারি পাঁচ দিন হইল মিরজা সাহেবের এক আত্মীয় তোর পিতার কাছে আসিয়াছিলেন।"

সুরত-উন্নিসা মুখ নত করিয়া রহিল।

সরি। "নবাব নোয়াজেস মহম্মদ মিরজা সাহেবকে বিশেষ অনুগ্রহ করেন।"

সুরতকে নীরব নতমুখী দেখিয়া বেগম চিবুক ধরিয়া তাহার মুখ উচু করিলেন ; দেখিলেন, তাহার জলভরপরিনম্র স্থির চক্ষু বর্ষাকালের জলপূর্ণ সরসীবৎ টল্ টল্ করিতেছে। বেগম বুঝিলেন ; তথাপি বলিলেন ;—

"তুই বড় হইয়াছিস্, এখন সকল বুঝিতে পারিস্। কতকাল আর তোর পিতা এই দুনিয়ার বেগার খাটিবেন ? তাঁর ইচ্ছা, যত শীঘ্র পারেন, দুনিয়ার মায়া পরিত্যাগ করিয়া কাবা সরিফে যান। কিন্তু তোর জন্য পারিতেছেন না।"

সুরত সেই জলভরা চক্ষু তুলিয়া দিদিমার দিকে চাহিল, বলিল ;— "আমার জন্য পারিতেছেন না ?"

"তোকে উপযুক্ত পাত্রে দিতে পারিলেই তিনি যাত্রা করিতে পারেন।"

"কেন আমাকে ফেলিয়া যাইবেন ? আমিও যাইব।"

"তুই যাবি! পাগল হইয়াছিস্?—যাবি বৈকি; যখন এই মেঘের মত কাল চুল শাদা হইবে, ফুলের মত কচি মুখ পাকা শুষ্ক হইবে, নাতি-পুতির কলরবে ঘর পূর্ণ হইবে, তখন যাবি। তার অনেক দিন বাকী আছে। এখন মিরজা সাহেব যে প্রস্তাব—"

সুরত পুনরায় মুখ নত করিল। দিদিমা তাহাকে আরও কাছে টানিয়া আনিলেন; আনিয়া তাহার ললাট চুম্বন করিলেন। অমনি দর বিগলিত অশ্রুরাশি সুরতের গণ্ড, বক্ষ অভিষিক্ত করিয়া ফেলিল। সরিফন বেগম দেখিলেন, মিরজার নাম করিতেই সুরত ভীত চকিত হইল, প্রসঙ্গ করিতেই কাঁদিয়া আকুল;—বুঝিতে আর বাকী রহিল না। মাতার ন্যায় স্নেহ, মাতার অধিক আদরে শিশুকাল হইতে লালন পালন করিয়া সুরতকে মানুষ করিয়াছেন, সেই সুরতের চক্ষু জলে ভাসমান দেখিয়া বেগমের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি বলিলেন;—

"তুই কাঁদিয়া ফেলিলি! পাগল তুই! তোর যেখানে অনিচ্ছা, আমরা সেখানে তোর বিবাহ দিব?—বেলা গিয়াছে; ওঠ্, সন্ধ্যার হাওয়ায় ছাদের উপর বেড়াইবি আয়।"

সুরত মুখ ফিরাইল না, ক্ষীণকণ্ঠে বলিল;—

"তুমি যাও, আমি একটুকু শুইয়া থাকিব।"

সরিফন বেগম ক্ষীণ মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রবিম্ববৎ সুরতের ম্লান গৌর মুখ চুম্বন করিয়া সেঘর হইতে চলিয়া গেলেন। সুরত শয্যায় শুইয়া পড়িল। তাহার ভীত, চকিত, সন্ত্রস্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু চিন্তায় উদ্বেলিত হইতে লাগিল।

সরিফন বেগম পিয়ারকে ডাকিয়া বলিলেন;—

"বেশ করিয়াছিস্; ফের যদি সে মাগীটা আসে, আমায় জানা'স্; মাগীকে ঝেঁটা পেটা করিয়া দিব।"

শুনিয়া পিয়ারবিবির উজ্জ্বল চক্ষু আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

কাশেম আলি খাঁ অবস্থা শুনিলেন। জাহাঙ্গীর নগরে কন্যার বিবাহ দিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার মুরসিদাবাদ যাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল। কিছু দিন পরে সরিফন বেগম ও কন্যা সুরত উন্নিসাকে লইয়া মুরসিদাবাদ যাত্রা করিলেন। নবাব নিজামের রাজধানীতে কত আমির ওমরাহের বাস, সেথানে সুরতের উপযুক্ত বর অবশ্যই মিলিবে। খাঁসাহেবের ইচ্ছা, সুরতের বিবাহ দিয়া মুরসিদাবাদ হইতেই মক্কা সরিফে যাত্রা করিবেন। কিন্তু পিতার সঙ্গে মক্কা সরিফে যাইবার ইচ্ছা সুরত পিতাকে ইতিপূর্ব্বে দুই বার জানাইয়াছে। ছেলেমানুষের কথা, পিতা তাহাতে বিচলিত হন নাই। মুরসিদাবাদের পথে পদ্মাতীরে বটবৃক্ষের শীতল ছায়ায় খাঁসাহেব কাশেম আলির সঙ্গে পাঠকের দেখা হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল। বৈশাখ মাস, কাল-মাহাত্ম্যে কোন্ মুহূর্ত্তে ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইবে, কে বলিতে পারে? নদী গঙ্গা। তাই বেলা থাকা সত্ত্বেও সেখান হইতে নৌকা খুলিয়া দেওয়া অসঙ্গত বিবেচনায় সেদিন সেইখানেই থাকা পরামর্শ হইল। মাঝিরা আরও দড়ি কাছি দিয়া নৌকাগুলি ভাল করিয়া বাঁধিল। নৌকায় নৌকায় মাঝি-মাল্লা খানসামারা রান্নার আয়োজন করিতে লাগিল। কতক লোক তীরে নামিয়া কাঠ, বাঁশ চিড়িতে লাগিল। লোক-কোলাহলে দূর গ্রামবাসী দুই চারিটী কুকুরও সেখানে উপস্থিত হইল। তেওয়ারি ঠাকুরদের নৌকা অন্যান্য নৌকার উজানে। তাহারা সেই ক্ষুদ্র জঙ্গল ভাগের অপর দিকে তীর ভূমি পরিষ্কার করিয়া রান্নার উৎযোগ করিল। বাতাস উঠিয়াছে; নৌকার ঝাপ খুলিয়া, উননের তিন দিকে তাহা বাঁশের খুঁটিতে বাঁধিয়া আগুন রক্ষা করিবার সুবিধা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বৈশাখের প্রখর সূর্য্য পশ্চিমাকাশ আরক্ত করিয়া পদ্মার বিশাল জলগর্ভে ম্লান তেজে মগ্ন হইয়া পড়িল। ঝাঁকে ঝাঁকে শত শত পাখী আকাশ ছাইয়া সুদূর আশ্রয় স্থলাভিমুখে চলিল। কোন কোন ঝাঁক বিস্তারিত পক্ষে নদী বক্ষ প্রায় স্পর্শ করিতে করিতে দ্রুতবেগে উড়িয়া উড়িয়া দূরবীচিভঙ্গের পশ্চাতে অদৃশ্য হইতে লাগিল। সঙ্গীহারা দু একটী পাখী আগতপ্রায় সন্ধ্যার অন্ধকারে যেন সেই অকূল পাথারে দিশাহারা হইয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে ডাকিতে চলিয়া গেল। সন্ধ্যা হইল। দূরবর্ত্তী কোন কোন নৌকায় গাজীর গান, কোন নৌকায় রূপ-যৌবন-গর্ব্বিতা সোণাভানের অপূর্ব্ব কাহিনী, কোন

নৌকায় ভাটিয়ারি রাগিণীতে প্রিয়-বিরহ-বিধুরা অজ্ঞাতকুলশীলা কোন গ্রাম্য সুন্দরীর পরিতাপগীতি সমস্বরে গীত আরম্ভ হইল।

ঘোড়দৌড় নৌকার ছাদের উপর হইতে এক জন নিগাহমান বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করিয়া বহরে উপযুক্ত হাতিয়ারবন্দ প্রহরী থাকার কথা নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীদিগকে জানাইল।

সেই প্রকাণ্ড নৌকার এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া সরিফন বেগম জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"শুনিলাম, আজ না কি এক জন হিন্দুযুবককে পাইয়াছ ? তাহাকে না কি সঙ্গে করিয়া মুরসিদাবাদ নিবে ?—কে সে ?"

কাশেম আলি খাঁ উত্তর দিলেন ;—

"তার নাম হেমেন্দ্রলাল রায়। বাড়ী জয়নগর, আমাদের রসুলপুরের কাছাড়ী হইতে চারি দণ্ডের পথ হইবে।"

"তোমার সঙ্গে পরিচয় ছিল ?"

"না। জয়নগরের রায়েরা বড় মানুষ না হইলেও সম্ভ্রান্তবংশীয় বটে। লোকমুখে তাহাদের কথা কিছু কিছু শুনিয়াছি।"

"পরিচিত নহে, তবে সঙ্গে লইলে কেন ?"

কাশেম। "লইলাম কেন তা ঠিক বলিতে পারি না। ছেলেমানুষ, বয়স সাতাস আটাসের বেশী হইবে না। পিতা মাতা নাই। বোধ হয় বাড়ী হইতে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়াছে। ইচ্ছা, সহরে যাইয়া নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবে।—দেখিয়া শুনিয়া মায়া হইল। সাহস উদ্যম খুব ; সুযোগ পাইলে উন্নতি করিতে পারিবে। সুন্দর চেহারা—"

"আমরা তাহাকে দেখিয়াছি।"

"দেখিয়াছ !—কেমন করিয়া দেখিলে ?"

"তুমি যখন গাছের তলায় তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছিলে, তখন আমরা কানাতের আড়াল হইতে দেখিয়াছি।"

"সু-চেহারা নয় ?"

"বেশ চেহারা।—মা বাপ নাই ?"

"না। লেখা পড়ায় খুব লায়েক, আদপ কায়দা খুব। আমার সঙ্গে অল্প ক্ষণের আলাপ; কিন্তু তাহাতেই বুঝিয়াছি, সহায় পাইলে কালে নিজের অবস্থা ভাল করিতে পারিবে। তেওয়ারিদের নৌকায় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি। আহার-অন্তে ডাকিয়া আনিয়া আরও আলাপ করিব।"

" মাতা পিতা নাই, শুনিয়া প্রাণটা যেন কেমন করে।"

কাশেম আলি খাঁ কিছুকাল নীরব হইয়া রহিলেন। অনেক দিনের কথা বৃদ্ধের মনে পড়িয়াছিল। সেই যে পাঁচ বৎসরের শিশু, কাঁচা সোণার রং, মাখনের মত কোমল শরীর, কচি মুখের সেই চিত্ত উৎফুল্লকর হাসি, আর, সেই হাসিময় চক্ষু—সকল কথা বৃদ্ধের মনে পড়িয়াছিল। খাঁ সাহেব মনে মনে বলিলেন ;—"বাঁচিয়া থাকিলে এমনটাই বা হইত !"

খাঁসাহেবের একমাত্র পুত্র পাঁচ বৎসর বয়সে ইহলোক ছাড়িয়া গিয়াছে। সে অনেক দিনের কথা। তখনও সুরত-উন্নিসার জন্ম হয় নাই। গাছের তলায় হেমেন্দ্রকে দেখিয়া কেন যেন কাশেম আলিখাঁর স্মৃতিপটে সেই শিশুর মুগ্ধ মূর্ত্তি উদয় হইয়াছিল। পথের ধারে অপরিচিত হেমেন্দ্রকে দেখিয়া কেন যে তাহাকে সঙ্গে করিয়া সহরে লইয়া চলিলেন, তাহা কাশেম আলি নিজেই ঠিক করিতে পারেন নাই। কিন্তু হেমেন্দ্রকে দেখিয়াই সেই বহুদিন লুপ্ত কচি মুখের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। সরিফন বেগম কোন কথা বলিলেন না। কিছুকাল পরে খাঁ সাহেব বলিলেন ;—

"সুরত কোথায় ?—সুরত, আমার তস্‌বীছড়া দাও, মা।"

সুরত নিকটেই পাশের কক্ষে বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিল ;

উঠিয়া আসিয়া বাক্সের মধ্য হইতে জপের মালা বাহির করিয়া পিতার হাতে দিল। কাশেম আলি ঈশ্বরোদ্দেশ্যে অবনত মস্তকে শেলাম করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জপ আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

গাছের তলায় খাঁ সাহেবের সঙ্গে যখন হেমেন্দ্রের প্রথম দেখা ও কথাবার্ত্তা হয় তখন রামমোহন সেখানে উপস্থিত ছিল না। সেই গাছের ছায়ায় ক্ষুদ্র শতরঞ্চি পাতিয়া হেমেন্দ্রের বিশ্রামার্থ শয্যা করিয়া দিয়া রামমোহন গ্রামাভিমুখে গিয়াছিল। গুটিকয়েক পাকা আম, কতকটী কালজাম এবং একটী তরমুজ রামমোহন সংগ্রহ করিয়াছিল। ইহার কোনটাই রামমোহন মূল্য দিয়া ক্রয় করে নাই। রামমোহন অনেক সময় সরাই পথ পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করিত; এবং স্থান বিশেষে প্রার্থনা, স্থান বিশেষে ভয় প্রদর্শন দ্বারা বাঞ্ছিত দ্রব্য সংগ্রহ করিত। কোন কোন স্থানে মালিকের অনুপস্থিতি সুতরাং অজ্ঞাতসারে আবশ্যকীয় ফল মূলাদি সংগ্রহ করিতেও রামমোহন অতি-সঙ্কুচিত হইত না।

কিছুকাল পরে রামমোহন ফিরিয়া আসিল। কটিলগ্ন কাপড়ে বাঁধা আম আর জাম, বাঁ হাত দিয়া বগলে চাপা সেই তরমুজ, ডান হাতে মজবুত বাঁশের লাঠি। রামমোহন দেখিল, হেমেন্দ্রকে ঘিরিয়া অনেক গুলি অপরিচিত লোক; তাহারা মুসলমান; লম্বা লম্বা দাড়ি, বলিষ্ঠ শরীর—পেয়াদা বরকন্দাজ অথবা বর্গী ডাকাতই বা হইবে। পাঁচ সাত জন লোক দেখিয়া হটিবার লোক রামমোহন নহে, বিশেষতঃ

হিমুরায় স্বয়ং সেখানে উপস্থিত। রামমোহন তরমুজটা ভূমিতে নামাইল, হাতের লাঠি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া একবার ভাঁজিয়া লইল এবং এক এক বার হেমেন্দ্রের দিকে, এক এক বার অন্যান্য লোকদিগের দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইল। রকম দেখিয়াই হেমেন্দ্র তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং হাসিয়া বলিল ;—

"কিছু না, রামমোহন! ইঁহারা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত লোক ;—"

কাশেম আলি খাঁকে দেখাইয়া বলিল ;—"শেলাম কর ; ইনি নবাব সরকারের বিখ্যাত আমির, রসুলপুর পরগণার মালিক।"

ছেলেবেলা হইতে আমির, ওমরাহ, চোপদার বরকন্দাজের কথা শুনিতে শুনিতে এই সকল মহা প্রতাপশালী লোক সম্বন্ধে রামমোহনের মনে ভীতিমিশ্র এক অদ্ভুত ধারণা জন্মিয়াছিল। আজ চক্ষুর সম্মুখে তাহার একজনকে দেখিয়া রামমোহনের বুদ্ধির বিপর্য্যয় হইল। হাতের লাঠি ভূমিতে রাখিয়া দিয়া যুক্ত করে রামমোহন খাঁ-সাহেবকে নমস্কার করিল। তখন সেখানে হাসির শব্দ শ্রুত হইল। হেমেন্দ্র কহিল ;—"ও কিরে, রামা!—শেলাম কর্।"

রামমোহন দাঁতে জিভ্ কাটিয়া দুই হাতে খাঁ সাহেবকে শেলাম করিল ; পেয়াদা, বরকন্দাজ প্রত্যেকের মুখের দিকে এক এক বার চাহিয়া দুই হাতে তাহাদের প্রত্যেককে শেলাম করিল ; অবশেষে স্বয়ং হেমেন্দ্রলালকেও শেলাম করিয়া ফেলিল। খাঁ সাহেবের অনুচরেরা হাসি থামাইতে পারিল না, হেমেন্দ্রলালের মুখও হাসিময় হইয়া উঠিল। খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে এ?

হেমেন্দ্র। "আমার সঙ্গের লোক ; নাম—রামমোহন, আমার ধাইমার ছেলে—আমার দুধ-ভাই বড় ভাল লোক।"

কাশেম। "আমাদিগকে কি ডাকাত সাব্যস্ত করিয়াছিলে, রাম-

মোহন ?” রামমোহনের যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি ছিল, তাহা তখন পদ্মার অপর পারে বিচরণ করিতেছিল। সে বলিল ;—

“বরকন্দ—আমির সাহেব—নবাব জোনাব—”

চারিদিকে টিটকারীর ধ্বনি শ্রুত হইল। রামমোহন বুঝিতে পারিল যে, তাহার দ্বারা অবশ্যই একটা কিছু হাস্যকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু কি যে হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিল না। লজ্জায় তাহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দুই পদ পশ্চাৎ সরিয়া দাঁড়াইল। তন্মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল যে, লাঠা-লাঠির কোন একটা সূত্র পাইলে বরকন্দাজ সাহেবদের হাসির রোলটা সে সহজেই থামাইতে পারিত। খাঁ সাহেব বলিলেন ;—

“বেশ লোক। রামমোহনও আমাদের সঙ্গে যাইবে।”

সন্ধ্যার পর তেওয়ারি ঠাকুরদের নৌকায় বসিয়া হেমেন্দ্র এবং রামমোহনে কথা হইতেছিল ; কত কথা ; ঘর বাড়ী, খোকা, বাঘা, গৃহত্যাগ, পথের কষ্ট, খাঁ সাহেবের সঙ্গে দেখা—অনেক কথা হইল। শেষে হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল ;—

“কিরে রামমোহন, আমাকেও শেলাম করিতে আরম্ভ করিলি নাকি ?”

“তা, দাদাবাবু, মাঠের মধ্যে গাছের তলায় আমির ওমরার সঙ্গে দেখা, আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়াছিল।”

“সহরে গেলে কত আমির ওমরাহের সঙ্গে দেখা হইবে, মাথা ঠিক রাখিতে পারিবি তো ?”

“দেখিতে দেখিতে অভ্যাস হইয়া যাইবে।”

“তা ঠিক্।”

“এখান থেকে সহরে যাইতে কয়দিন লাগিবে, দাদাবাবু ?”

হেমেন্দ্র কোন উত্তর দিল না। তখন রাত্রি হইয়াছে। শত সহস্র

গ্রহ নক্ষত্র নীলাকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষ ; কিন্তু দূরে পদ্মা-গর্ভ হইতে পঞ্চমীর চন্দ্রোদয় আরম্ভ হইয়াছে। তাহার প্রতিবিম্ব, কিরণচ্ছটা পদ্মার বীচিভঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল ; জলকণাশীতল মৃদু বায়ু ঝুরু ঝুরু করিয়া বহিতেছিল। সেই সুন্দর সুখ সময়ে সুদূর পদ্মাবক্ষে নৌকায় বসিয়া প্রকৃতির সেই শোভা দেখিতে দেখিতে হেমেন্দ্রের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দূরগৃহে রাত্রি শেষে সেই বিদায়ের করুণ স্মৃতি তাহার মনে উদয় হইল। বক্ষসংলগ্ন, গলদশ্রুধারা-পরিপ্লাবিত সেই সুন্দর কাতর মুখের কথা তাহার মনে পড়িল। তখন—একি!—কোথা হইতে এ মধুস্রাবী এস্‌রাজের মৃদু মোহন স্বর বায়ুস্রোতে বহিয়া আনিল! হেমেন্দ্র উৎগ্রীব হইয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। পদ্মার স্রোতে উজান বহিয়া বৈশাখী মলয় প্রবাহ কোন্ রমণীকণ্ঠ-নিঃসৃত এ মধুর গীতিধ্বনি মৃদু মৃদু সেখানে আনিয়া ফেলিল? মধুর স্বর হেমেন্দ্র অনেক স্থানে, অনেকের মুখে শুনিয়াছে ;—কিন্তু এমন পবিত্র মধুর কণ্ঠস্বর বুঝি আর কোন দিন কোন স্থানে শুনে নাই! গীত কথাগুলি ক্রমে হেমেন্দ্রের কাণে পরিস্ফুট হইতে লাগিল ;—

"তুনে কোকারী ও মা বদ কারদায়েম্।
জোরমে বে আন্দাজা বেহদ্ কার্‌দায়েম্॥"

কার এ স্বর? লোকালয় হইতে এত দূরে, এই নিশীথ কালে পদ্মা-বীচিভঙ্গের কুলু কুলু শব্দের সঙ্গে কোন রমণীর এ চিত্তহারিণী গীতিধ্বনি?

"বেগোনাহ নাগ্‌জাস্ত বরমা ছাআতে।
বা হুজুরে দেল্ না কারদাম তাআতে॥
বর্‌দর্ আমদ বান্দায়ে বিগ্‌রিখ্‌তা।
আব্‌রুয়ে খোদ বো এস্‌য়াঁ রেখ্‌তা॥"

সকল শব্দ বুঝা যায় না। বায়ুর মন্দ অথবা প্রবল গতিভেদে কুথার মৃদু ধ্বনি সকল সময় বিকাশ পায় না; কিন্তু সে মধুর স্বর হেমেন্দ্রের কাণে যেন সমান ভাবে লাগিয়া রহিল!

"আন্দরাঁ দম কাজ্ বদন্ জাঁনম্ বুরি।
আজ্ জাঁহা বান্দ্‌রে ইমানন্ বুরি॥"

এ যে মহাত্মা শেখ ফরিদের কাতর হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা গীতি! গীতধ্বনি কমিয়া গেলেও হেমেন্দ্রের কর্ণে সেই অমৃতবর্ষী মধুর তান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গুঞ্জরিত হইতে লাগিল। হেমেন্দ্র থাকিতে পারিল না; নৌকাস্থিত একজন তেওয়ারি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল;—

"তেওয়ারি ঠাকুর, কোথা হইতে এ গীতের শব্দ আসিতেছে?—কে গায়?"

তেওয়ারি। "জান না, বাবুসাহেব! এ যে সুরত বিবির গলার আওয়াজ।"

"সুরত বিবি! সুরত বিবি কে?"

"খাঁ সাহেবের কন্যা, বিবি সুরত-উন্নিসা। নমাজ শেষে খাঁ সাহেব যখন জপ করেন, তখন কোন কোন দিন কন্যাকে ভজন গাহিতে বলেন। আমরা কত দিন শুনিয়াছি।"

"খাঁ সাহেবের পুত্র কন্যা কয়টী?"

"খাঁ সাহেবের আর সন্তান নাই, এই এক কন্যা মাত্র।"

"বিবাহ হইয়াছে?"

"না। শুনিয়াছি, জাহাঙ্গীর নগরে ভাল বর মিলে নাই। খাঁ সাহেব কন্যাকে লইয়া মুরসিদাবাদ যাইতেছেন; সেখানে অনেক আমীর লোক আছেন—অবশ্যই যোগ্য বর মিলিবে।"

হেমেন্দ্র তেওয়ারি ঠাকুরের নিকট অনেক কথা শুনিল। সরিফন বেগমের কথা, সুরত-উন্নিসার বাল্য ইতিহাসের কথা, তাহার বাঁদী

পিয়ারের কথা; খাঁ সাহেবের ধর্ম্ম জীবন; তাঁহার দয়া মায়ার কথা,—তেওয়ারি ঠাকুর অনেক কথা বলিল। রামরতন তেওয়ারি খাঁ সাহেবের অনেক দিনের চাকর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এমন সময় একজন লোক সেই নৌকার নিকট আসিয়া বলিল;—"বাবুসাহেব, খাঁ সাহেব আপনাকে ডাকিতেছেন।"

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল;—

"কোথায় দেখা হইবে?"

"খাঁ সাহেবের নৌকায়।"

হেমেন্দ্র আজ কয় দিন যাবৎ রৌদ্র বৃষ্টিতে ভিজিয়া পুড়িয়া অনিদ্রা অনাহারে পথ হাঁটিয়াছে। আজ নৌকার আশ্রয় পাইয়া অপেক্ষাকৃত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে। খাঁ সাহেবের আজ্ঞা শুনিয়া রামমোহনকে ভাল ধুতি ও মেরজাইটা বাহির করিতে বলিল। রামমোহন তাহার সেই বিপুল বটুয়া হইতে ধুতি, উড়ুনি, মেরজাই বাহির করিয়া দিল। আরও যেন কি খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে বটুয়া হইতে অনেক জিনিশ বাহির করিয়া ফেলিল;—এক খানা ছুরি, এক খণ্ড সোলা, দুই তিনটা লোহার কাঁটা, এক খণ্ড ইস্পাত, একটা চকমকির পাথর। শেষে এক কোণ হইতে এক খানা ক্ষুদ্র আরসী, কাঠের এক খানা মোটা চিরুণী বাহির করিল। আরও একটা জিনিশ বাহির করিল, সেকালে তাহাকে আঁচড়া বলিত। সে কালের বাবুরা মাথায় লম্বা বাবরী চুল রাখিতেন; সাধারণ প্রচলিত চিরুণীতে তাহার বিন্যাস

চলিত না। সেই জন্য চারি পাঁচটী ক্ষুদ্র বাঁশের শলাকার অগ্রভাগ কিঞ্চিৎ ফাঁক ফাঁক করিয়া এক সারীতে একত্র বাঁধিয়া লইতেন। অনেক সময় সেই বন্ধন প্রণালীতে অনেক ওস্তাদি দেখান হইত। ধনীরা রূপার আঁচড়াও ব্যবহার করিতেন। রাত্রি কালে আরসীতে মুখ দেখিতে নাই; হেমেন্দ্র তাড়াতাড়ি সেই চিরুণী ও আঁচড়ার সাহায্যে কেশ বিন্যাস করিয়া ধুতি মেরজাই পরিয়া খাঁ সাহেবের নৌকায় উপস্থিত হইল। একজন ভৃত্য তাহাকে নৌকার প্রথম কক্ষে লইয়া গেল।

কক্ষটী প্রস্থে সাত হাত, দীর্ঘে দশ হাত হইবে। দুই দিকে সারী সারী জানালা, তাহাতে খড়খড়ি, সার্সী। ভিতরের দিকে দুই পাশে দুই দরজা, তাহাতে খড়খড়ি। মাঝখানে একটী আলমারি, তাহার মাথলায় কত সূক্ষ্ম সুন্দর কারু কার্য্য। আলমারির গায়ে লোহার কাঁটায় ঝুলান একটী সেতার। দুইটী ফানুসের আলোকে কক্ষটী আলোকিত। মেঝেয় পাতা গালিচা, এক পাশে সুন্দর কাজকরা একটি সুজনির মছনদ, তাহার উপর তাকিয়া, একপাশে ফরসী আলবোলা। খাঁসাহেব সেই তাকিয়ার নিকট বসিয়াছিলেন, হেমেন্দ্রলালকে বসিতে বলিলেন। হেমেন্দ্র শেলাম করিয়া সেই গালিচার একপার্শে বসিল। গাছের তলায় সেই দূরযাত্রী পথিকের যে বেশ, যে চেহারা খাঁসাহেব দেখিয়াছিলেন, এখন আর হেমেন্দ্রের সে বেশ, সে অমার্জ্জিত রুক্ষ চেহারা নাই।

খাঁসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"মুরসিদাবাদ যাইবে।"

"তাই মনে করিয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি।"

"কেন সেখানে যাইবে?"

"আমাদের অবস্থা ভাল নহে; তাই সেখানে যাইয়া উপার্জ্জনের পথ দেখিব।"

"জয়নগরের রায়দিগের অবস্থা মন্দ নয় বলিয়া শুনিয়াছি।"

"পূর্ব্বে কিছু ভাল ছিল, এখন আর তাহা নাই।"

"তুমি পিতৃহীন, তোমার অভিভাবক কে?"

"শিশুকালে পিতৃহীন হইয়াছি; জেঠা মহাশয় আমাকে মানুষ করিয়াছেন।"

"কি নাম তাঁহার?"

"শ্রীভৈরবচন্দ্র রায়।"

"তাঁহার সঙ্গে রাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছ?"

"রাগ করিয়া নহে। সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল নহে; ধার কর্জ্জ অনেক। জেঠা মহাশয় প্রাচীন হইয়াছেন; তাই মনে করিয়াছি, বিদেশে যাইয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিব।"

"জাহাঙ্গীরনগর বাড়ীর কাছে, সেখানে গেলে না কেন?"

"কাছে বলিয়াই যাই নাই। আমার মাতা নাই, জেঠাইমা-ই আমার মা; তিনিই আমাকে লালন পালন করিয়াছেন। আমার বিদেশে যাওয়া তাঁহার ইচ্ছা নয়, কাছে থাকিলে আমাকে ফিরাইয়া আনিবেন; সেই জন্য দূর মুরসিদাবাদ যাইতেছি।"

"বাড়ীতে বলিয়া আসিয়াছ?"

"সহরে চলিলাম বলিয়া পত্র লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছি।"

"ভৈরবচন্দ্র রায়ের পুত্র সন্তান কি আছে?—তোমার ভাই ভগ্নী ক'টি?

"তাঁহার কোন সন্তান নাই; আমারও ভাই ভগ্নী কেহ নাই।"

খাঁ সাহেব তখন হেমেন্দ্রের লেখা পড়া শিক্ষা সহবতের পরিচয় লইতে লাগিলেন। কথা বার্ত্তায় বুঝিলেন, এই অল্প বয়সে হেমেন্দ্র পারসী ও আরবী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী; আদপ কায়দা, সলা সহবতে বিশেষ দক্ষ। নবীন বয়স, সুন্দর চেহারা; সাহস উৎসাহ উদ্দম যথেষ্ট। সুবিধা ও সাহায্য পাইলে এই নবীন যুবা এক দিন নাম করিতে পারিবে।

আলমারির গায়ে ঝুলান সেতারের প্রতি বার বার হেমেন্দ্রের দৃষ্টি দেখিয়া খাঁ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"বাবু সাহেবের বাজান অভ্যাস আছে কি ?"

"হেমেন্দ্র ইতস্ততঃ করিল, অস্বীকার করিতে পারিল না ; বলিল ;—

"সামান্য কিছু অভ্যাস আছে।"

কাশেম। "সাদেক, সেতারটা নামাইয়া দে।— কিছু শুনাও, বাবু সাহেব।"

সাদেক (খাঁ সাহেবের ভৃত্য) আল্মারির পার্শ্ব হইতে সেতারটী নামাইয়া হেমেন্দ্রের হাতে দিল। হেমেন্দ্র তাহাতে সুর বাঁধিয়া একটা গৎ ধরিল। এই সময় ভিতরের কক্ষ হইতে মৃদু অলঙ্কার ধ্বনি শ্রুত হইল, বোধ হইল যেন কোন সালঙ্কারা রমণী অগ্রসর হইয়া দ্বারের কাছে আসিলেন। হেমেন্দ্র বড় বিপদে পড়িল। সেতারের সঙ্গে যে, একটী মেজরাব ছিল, তাহা বড়ই ছোট ; হেমেন্দ্রের তর্জ্জনীর অগ্র-ভাগ হইতে বার বার ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। খাঁ সাহেব তাহা দেখিতে পাইলেন, শেষে মেজরাবটী রাখিয়া দিয়া হেমেন্দ্র শুধু অঙ্গুলি দ্বারাই সেতারে নিজের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিল। খাঁ সাহেব অনেক দিন হইতে স্বয়ং সঙ্গীত চর্চ্চা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ; কিন্তু সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। বাজনা শুনিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে এমন কর্ত্তপ যাহার তাহার হাতে সম্ভবে না। রাগিণীর সর্ব্বাঙ্গ বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া এমন পরিষ্কার আলাপ এবং গৎ পরিস্ফুট করিয়া তোলা নিপুণ শিক্ষার ফল। খাঁ সাহেব বড় প্রীত হইলেন এবং "আচ্ছা হাত!" বলিয়া প্রশংসা করিলেন ; জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আর কোন্ কোন্ যন্ত্র অভ্যাস আছে ?"

হেমেন্দ্র বিপদে পড়িল। খাঁ সাহেবের সঙ্গে সেই দিনই প্রথম সাক্ষাৎ ; তিনি বয়সে প্রাচীন, সহজেই মুরব্বি স্থানীয় ; তাহাতে

আবার আশ্রয়দাতা, ভবিষ্যতের সহায়। এমন লোকের নিকট প্রগল্‌ভতা প্রকাশ হওয়া নিতান্ত রীতি বিরুদ্ধ। কিন্তু খাঁ সাহেব ছাড়িলেন না, তিনি সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, সেতারে যার এমন হাত, অনেক যন্ত্রেই তাহার অধিকার থাকা খুব সম্ভব। খাঁ সাহেব ডাকিলেন ;—

"পিয়ার, এস্‌রাজটা এখানে আন্।"

তখন ভিতরের দরজা অর্দ্ধ উন্মুক্ত হইল। পিয়ার সেই মুক্ত পথে খোলকাবৃত একটী এসরাজ গালিচার উপর পৌছাইয়া দিল। খাঁ সাহেব বলিলেন ;—

"আমাদের সঙ্গে তম্বুরা নাই, এই এসরাজের সঙ্গে একটা গান কর। তোমার হাত এমন খাসা, গলাও যে মিষ্ট হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

আবরণ উন্মোচন করিয়া হেমেন্দ্র দেখিতে পাইল, এসরাজটী অতি-সুন্দর, তাহাতে হাতীর দাঁতের কত লতা পাতা ফুলের কাজ, কত কারু-কার্য্য। আওয়াজ দিতেই বুঝিতে পারিল যে, এই এসরাজের সঙ্গেই সন্ধ্যার পর শ্রুত সেই স্তুতি গীত হইয়াছিল। হেমেন্দ্র প্রথমে গেয় রাগিণীর কিঞ্চিৎ আলাপ করিল ; শেষে সেই স্বভাব কোমল এস-রাজের সঙ্গে সঙ্গত করিয়া পরিষ্কার মৃদু স্বরে একটী প্রাচীন হিন্দী ভজন গান করিল।

গান শুনিয়া খাঁ সাহেবের চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইল ; তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিল। তিনি বলিলেন ;—

"বাবুসাহেব, তোমার প্রতি ঈশ্বরের বড় অনুগ্রহ, নহিলে এমন গলা কেমন করিয়া পাইলে ?"

হেমেন্দ্র এসরাজ রাখিয়া দিয়া অতি বিনীত স্বরে বলিল ;—

"আমার এক প্রার্থনা আছে।"

"প্রার্থনা! কি প্রার্থনা?"

"আমি ছেলে মানুষ, আপনি আমার পিতৃস্থানীয়; আমাকে নাম ধরিয়া ডাকিবেন;—এই প্রার্থনা।"

"তাহাই হইবে। তুমি—তুমি পুত্র স্থানীয়ই বট।"

খাঁ সাহেবের কথার স্বর বড়ই কোমল, বড়ই করুণ। তিনি মনে মনে ভাবিতে ছিলেন;—"বাঁচিয়া থাকিলে এমনটীই বা হইত!"

হেমেন্দ্র সে নৌকা হইতে চলিয়া গেলে ভিতরের কক্ষে সরিফন বেগম বলিলেন;—"কি কাঁচা বয়স!"

পিয়ার বলিল;—"কি মিঠা গলা!"

মেহের বলিল;—"কি সুন্দর চেহারা!"

সরিফন বেগম বলিলেন;—

"সুরত, তুই কিছু বল্‌ছিস্ না! কেমন শুনিলি?"

সুরত মুক্ত বাতায়ন পথে চন্দ্রকিরণফুল্ল পদ্মাবীচি-ভঙ্গের মনোহর শোভার দিকে চাহিয়া ছিল—দেখিতে পাইতে ছিল কি?

সরিফন বেগম পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"সুরত, ঘুমাচ্ছিস্ নাকি!—গান কেমন শুনিলি?"

সুরত চমকিয়া উঠিল; বলিল;—"বেশ গান, দিদিমা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এদিকে জয়নগরে রাত্রি প্রভাত হইল; কিন্তু লক্ষ্মীপ্রিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিল না। শ্বশুর, শাশুড়ী, এমন কি, বাড়ীর চাকর চাকরাণীদের নিদ্রা ভঙ্গের পূর্ব্বে, অতি ভোরে লক্ষ্মীপ্রিয়া শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহির হয়, সংসারের কাজ আরম্ভ করে। আজ ভোর হইল, বেলা হইল; তবু লক্ষ্মীপ্রিয়া শয়নঘরে! খোকা অতি প্রত্যূষে প্রতি দিন জাগে, আজও একবার জাগিয়াছিল; লক্ষ্মীপ্রিয়া অনেক করিয়া পুনরায় তাহাকে ঘুম পাড়াইয়াছে। সেই ঘুমের ছেলে বুকে করিয়া শয্যায় পড়িয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া নীরবে কাঁদিতেছিল। স্বামী দীর্ঘ প্রবাসে বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছেন, কোন্ তরুণী ভার্য্যার কান্না না পায়? কিন্তু সেকালে যেন আরও পাইত। সেকালের ভার্য্যাদের কান্না বেশি পাইত, কিন্তু তাহাদের সহিষ্ণুতাও বেশি ছিল; কাল এবং অবস্থা ভেদে সেরূপ সহিষ্ণুতা এখন আর দেখা যায় না।

শয্যায় পড়িয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া কাঁদিতেছিল। সদ্য স্বামী-বিচ্ছেদ যন্ত্রণা ব্যতীত তাহার মনে আরও এক কষ্টের সঞ্চার হইয়াছিল। স্বামী আর কাহাকেও না জানাইয়া, শুধু তাহাকে বলিয়া গোপনে বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছেন, এজন্য সে নিজেকেও অনেকটা অপরাধিনী মনে করিতেছিল। এখনই কত অনুসন্ধান, কত আলোচনা হইবে; কিন্তু মুখ ফুটিয়া সে কিছু বলিতে পারিবে না, অথচ প্রকৃত কথা সে জানে! লক্ষ্মীপ্রিয়া মনে করিতেছিল,—স্বামী চলিয়া গিয়াছেন, কাহাকেও বলিয়া যান নাই, তাহাকেও না বলিয়া গেলেই যেন ভাল হইত। তাহা হইলে চোরের ন্যায় একথা আর বুকে পুরিয়া রাখার কষ্ট পাইতে

হইত না। অত বড় একটা কথা, শ্বশুর জানেন না, শাশুড়ী জানেন না, বধূ জানে, সেকালের নববধূদিগের নিকট এরূপ অবস্থা নিতান্ত লজ্জাকর ও অপরাধজনক বলিয়া গণ্য হইত।

মহামায়া আসিয়া দ্বারে আঘাত করিলেন ;—

"বৌমা, বৌ !"

দরজা খোলা ; মহামায়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। চক্ষুর জল মুছিয়া মাথায় কাপড় দিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে উঠিল।

মহামায়া বলিলেন ;—

"সে কি ! খোকা উঠে নাই ! তুমি শুইয়া ! কেন ? খোকার কি কোন অসুখ করিয়াছে ?"

লক্ষ্মীপ্রিয়া মাথা নাড়িয়া খোকা শারীরিক সুস্থ থাকার কথা জানাইল।

"তবে কেন উঠিতে এত বেলা করিলে ?—তোমার নিজের কোন অসুখ করিয়াছে ?—না ! তবে কি হইয়াছে ?"

প্রাতে উঠিয়া শাশুড়ীকে প্রণাম করা লক্ষ্মীপ্রিয়ার নিয়ম। সেদিনও প্রণাম করিল, কিন্তু অনেক চেষ্টায়ও বারণ রাখিতে পারিল না— প্রণামকালে দরবিগলিত দুই বিন্দু অশ্রু মহামায়ার পায়ে পড়িল। মহামায়া বলিলেন ;—

"সে কি বৌ, তুমি কাঁদিতেছ ! কেন ?—হিমু কিছু বলিয়াছে ?"

স্বামী সম্বন্ধে কথা, লক্ষ্মীপ্রিয়া কোন উত্তর দিল না। মহামায়া তাহার অবগুণ্ঠন সরাইয়া দেখিলেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার গৌরমুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে ; চক্ষু মুদ্রিত ; কিন্তু দুই বিন্দু অশ্রু তাহার যুগ্ম কৃষ্ণ পক্ষ-শ্রেণী সংসক্ত হইয়া রহিয়াছে ! মহামায়া মহা ব্যস্ত হইলেন। হিমু অবশ্যই কিছু বলিয়া থাকিবে, বৌ আর তাহা কেমন করিয়া প্রকাশ করিবে ? মনে মনে ঠিক করিলেন, হিমুকে শাসন করিতে হইবে। তখন আঁচলে বধুর মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন ;—

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"কেঁদ না ; আমি সব ঠিক করিয়া দিব।—খোকা এখনও ঘুমাচ্ছে!"

শয্যার পাশে যাইয়া খোকার গায়ে হাত বুলাইলেন, তাহার ললাট ও কপোলে বিস্রস্ত চুলগুলি সরাইয়া দিলেন ; মুখের কাছে মুখ নিয়া তাহাকে জাগাইবার ভয়ে অর্দ্ধপথেই সেই কচি মুখোদ্দেশে সশব্দ চুম্বন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন।

ভিতর বাড়ীর উঠানে আসিয়া মহামায়া বলিলেন ;—

"কল্যাণী, গ্যাখ্ তো, হিমু কোথায়, তাকে ডেকে আন্।"

এ দিকে লক্ষ্মীপ্রিয়ার বিপদের উপর বিপদ। শাশুড়ী ঠাকুরাণী মনে করিতেছেন, স্বামী তাহাকে ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন! তাঁহার এ ভ্রম দূর করিবার উপায়ও সহজ নহে। খোকা জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কল্যাণী ফিরিয়া আসিয়া বলিল ;—

"হিমুকে পাইলাম না ; সে বাড়ীতে নাই।"

মহামায়া। "খোকা উঠিয়াছে, কাঁদিতেছে ; তাহাকে লইয়া আয়।" কল্যাণী খোকাকে লইয়া আসিল। সকালে উঠিয়াই খোকা প্রতিদিন রামমোহনের কাছে যায়। রামমোহনের হাত ধরিয়া হাঁটে, তাহার কাঁধে চড়িয়া ফুলবাগানে ফুল তুলিতে যায়। কল্যাণীর কোলে উঠিয়া তাহার কান্না থামিল না। কল্যাণী তখন "রামমোহন!" "রামা!" "ও রামা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে গেল। রামমোহনও নাই। সে কি! তুইজনে মিলিয়া অত ভোরে কোথায় গেল?

তখন ঠাকুর আঙ্গিনা, ফুলের বাগান, পুকুরের ঘাট, সর্ব্বত্র অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। বৈঠকখানা ঘরের যে কোঠায় রামমোহনের শয্যা, কল্যাণী সেখানে গেল। রামমোহন নাই। তক্তপোষের নীচে তাহার ঘটি নাই, ঝাপে ঝুলান তাহার বোঁচা নাই, আর তাহার সেই তেলে পাকান বহু যত্নের লাঠি নাই! কল্যাণীর মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল।

ভিতর বাড়ীতে আসিয়া মহামায়াকে সকল কথা বলিল। মহামায়া রাধামোহনকে ডাকাইলেন। সে বলিল ;—

"বাবু রাত্রি থাকিতে অন্দর দেউড়ির দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়াছেন। সাড়া পাইয়া আমি দরজা খুলিয়া দিতে চাহিলাম, বাবু আমাকে নিষেধ করিয়া নিজেই দরজা খুলিয়া গিয়াছেন।"

কোথায় গেল? দুজনে মিলিয়া কোথায় গেল? তখন অনেক বেলা হইয়াছে। ভৈরবচন্দ্র রায় সকল কথা শুনিলেন; বলিলেন ;—

"তার কি আর লজ্জা আছে? কাল যে অত হইয়া গিয়াছে, তাহাতেও তাহার খেয়াল হয় নাই। কোথায় যেন কোন্ দাঙ্গা হাঙ্গামায় গিয়াছে; আহারের বেলায় ফিরিবে।"

রায়মহাশয় বাহির বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

এমন সময় নবদুর্গা সেখানে আসিয়া অবস্থা শুনিল। মহামায়া তাহাকে বলিলেন ;—

"একবার বৌমার কাছে যা; সকাল বেলায় বৌকে কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দ্যাখ্ হিমুর কথা বৌ কিছু জানে কিনা।"

নবদুর্গা লক্ষ্মীপ্রিয়ার ঘরে গেল। পাড়ার মধ্যে নবদুর্গা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সখী ও বয়স্যা; সম্পর্কে ননদ, বয়সে এক, কথা বার্ত্তায় আমোদ প্রমোদে একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু। এদিকে বাহির বাড়ীতে বড় গোলযোগ পড়িয়া গেল। রায় মহাশয় তাঁহার বসিবার ঘরে ফরাসে বসিয়া তামাক খাইতে ছিলেন। তাকিয়ার পাশে বাক্সের উপর একখানা পত্র দেখিতে পাইলেন। বাঁ হাতে পত্র খানা তুলিয়া লইলেন। শিরোনামায় তাঁহারই নাম। দেখিলেন, লেখা হেমেন্দ্রের হাতের! হাতের হুকা বৈঠকে রাখিয়া দিয়া রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি পত্র খানা খুলিলেন। হেমেন্দ্র তাঁহাকে পত্র লিখিল! ঘরের ছেলে ঘরে বসিয়া পত্র লিখিল!

পত্রে লেখা ছিল ;—

শ্রীশ্রীচরণ কমলেষু,

শ্রীচরণে শত সহস্র প্রণাম পূর্ব্বক নিবেদন এই যে, এ দাস এখন বড় হইয়াছে, সংসারের অবস্থাও বুঝিতে পারিয়াছে ; নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকা আর তাহার পক্ষে শোভা পায় না। সেই জন্য এ দাস আজ বাড়ী হইতে চলিল। রামমোহন তাহার সঙ্গে চলিল। আমরা সহরে চলিলাম। আপনার আশীর্ব্বাদে আমাদের বাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। সহরে পৌছিয়াই পত্র লিখিব। আপনারা চিন্তা করিবেন না। আমার শত সহস্র প্রণাম জানিবেন। শ্রীযুক্তেশ্বরী মাতা ঠাকুরাণীর শ্রীচরণে এ দাসের শত কোটী প্রণাম। নিবেদন ইতি।

সেবকাধম সেবক,

শ্রীহেমেন্দ্র লাল দাস।

পত্র পাঠ করিয়া রায় মহাশয়ের হৃদয়ে যুগপৎ শতসূচীবেধ-যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। বাড়ী হইতে তাড়াইলাম ! গালি দিয়া, খাইতে আসিলে মাথার ছাই দিতে বলিয়া বালককে গৃহত্যাগী করিলাম ! রায় মহাশয় বাড়ীর লোকজন চাকর চাকরাণী সকলকে ডাকিলেন ; সকলে ছুটিয়া আসিল।

“এখনি যা, রাধামোহন, জাহাঙ্গীর নগরের পথে যা। গৌর, তুইও যা ; কাদের, জাহেদ, তোরাও যা। হিমু জাহাঙ্গীর নগর রওয়ানা হইয়াছে, শীগ্‌গীর যা। তাহাকে রাস্তা হইতে ফিরাইয়া আনিবি। বলি আমি তাহাকে বাড়ীতে ফিরিতে বলিয়াছি ;—ছাড়িবি না।”

কল্যাণী ছুটিয়া সেখানে গেল। মহামায়া ভিতর দেউড়ী পার হইয়া গেলেন। কি, কি হইয়াছে ?—হিমু বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, রাগ করিয়া গিয়াছে !

রায় মহাশয় অন্দরে আসিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া মহামায়া বারান্দায়

পড়িয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।—বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, রাগ করিয়া গিয়াছে! বাছা আর ফিরিবে না। "ও গো, তোমরা আমার বাছাকে তাড়াইলে! আমার কেন মরণ হইল না!—মৃত্যুকালে তার মাতা বাছাকে আমার হাতে হাতে দিয়া গিয়াছিল, আমি বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছি। ও গো, সে আর বাঁচিয়া নাই!—বর্গি বরকন্দাজে বাছাকে ধরিয়া নিয়াছে! ঠগী ডাকাত, মগ ফিরিঙ্গী—"

পিসী রক্ষাকালী আসিলেন, বগলা ঠাকুরাণী আসিলেন, বিশথা আসিলেন; নবদুর্গা আসিল, শ্যামা, বামা, তারা, কালিন্দী আসিল; বুচি, ফেলি, তুলসী, দাসুর মা আসিল। একটা মহা গণ্ডগোল, কান্নাকাটি আরম্ভ হইল। প্রাচীনারা রায় মহাশয়ের নিন্দা করিতে লাগিল; যুবতীরা চুপ করিয়া রহিল, শিশুরা ভয়ে জড়সড় হইল, ইতর স্ত্রীলোকেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল। রায় মহাশয়ের উপর সকলের রাগ। তিনি সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন;—

"লোক পাঠাইয়াছি, রাস্তা হইতে ফিরাইয়া আনিবে। ভয় নাই।"

মহামায়া। "ও গো, তোমরা আমার বাছাকে এখনি ফিরাইয়া আন।—সে কি আর বাঁচিয়া আছে?—রাগ করিয়া গিয়াছে, সে কি আর ফিরিবে? ও গো, তোমাদের মায়া দয়া নাই, ও গো—"

হিমু যে জাহাঙ্গীর নগর বেশ চিনে, অনেক দিন সেখানে ছিল; সেখানে যাইতে দুই তিন দিন লাগে, রাস্তাতেই যাহা কিছু ভয়, একবার সেখানে পৌছিলে যে হিমুর আর কোন ভয়ের কারণ নাই, রায় মহাশয় তাহা জানিতেন। কিন্তু গৃহিণীকে তাহা বুঝাইতে পারিলেন না। উপস্থিত ব্যাপারে তিনি নিজেকেই সম্পূর্ণ অপরাধী মনে করিয়াছিলেন; তাঁহার ভর্ৎসনাতেই তো হিমু অভিমান করিয়া বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!

বাড়ীতে এই গোলযোগ উপস্থিত; লক্ষ্মীপ্রিয়া চোরের মত চুপ করিয়া শয়নঘরে বসিয়াছিল। তাহার স্বামীই ত এই গোলযোগের মূল, সে

আর কেমন করিয়া লোককে মুখ দেখাইবে, কাহারও সম্মুখে বাহির হইবে ? অপরাধিনীর মত চুপ করিয়া এক কোণে বসিয়া ছিল। কিন্তু তাহার নিস্তার ছিল না। বামা সে ঘরে গেল, শ্যামা গেল, তারা, কালিন্দী গেল।—দেখিয়া আসি বৌ কি করিতেছে !—বামা মনে করিল ; বৌ-ই বুঝি এ পরামর্শ দিয়াছে। শ্যামা ভাবিল, কোণের বৌয়ের পেটে এত ঘর-ভাঙ্গান বুদ্ধি ! তারার বিশ্বাস হইল, এ ঘরে শাশুড়া বৌতে মিল আর ক'দিন থাকিবে ? ঘরের বৌ ঝির এত স্বাধীনতা ! মনের কথা কেহই প্রকাশ করিল না। বামা বলিল, "বৌ, তুমি কেঁদনা, মেজ-দাদাকে এখনি ফিরাইয়া আনিবে।" শ্যামা বুঝাইল, "কাঁদিস্‌নে, বৌ, কত জনের স্বামী তো বিদেশে যায়, তাই বলিয়া কি তাহারা ঘরে বসিয়া কাঁদে ?" তারা বলিল, "তুই যাইতে দিলি কেন ? তুই মানা করিলে কি যাইতে পারিত ? তা, গিয়াছে, বেশ করিয়াছে ; বিদেশে গিয়াছে, যাহা কিছু রোজগার করিবে, ঘরে আনিবে, তোকেই তো দিবে ; তুই কাঁদিস্‌ কেন ?" লক্ষ্মীপ্রিয়া তখন কাঁদিতেছিল না ; তাহার মুখ অবগুণ্ঠনে ঢাকা। কিন্তু সকলে স্বতঃ সাব্যস্ত করিল—সে কাঁদিতেছে ! যে সকল স্ত্রীলোক ঘরে ঢুকিতে পায় না, তাহারা বাহির হইতে দরজায় উঁকি মারিয়া বৌকে দেখিতে চেষ্টা করিল।

কেহ যায়, কেহ আসে ; বৌ এক দেখিবার জিনিশ হইল ! ক্রমে বেলা গেল, সন্ধ্যা হইল। অনুসন্ধানকারীরা কেহ কেহ ফিরিয়া আসিল ; হিমুর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। রাত্রি প্রভাত হইল ; পর দিনও কোন সংবাদ পাওয়া গেল না ! ক্রমে চারি পাঁচ দিন চলিয়া গেল ; জাহাঙ্গীর নগর হইতে লোক ফিরিল, হিমু সেখানে যায় নাই। মহামায়া আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিলেন, রায় মহাশয় মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন, কল্যাণী দিবারাত্রি কাঁদিয়া আকুল। লক্ষ্মী-প্রিয়া নীরবে দিন রাত্রি মহামায়ার পরিচর্য্যায় রত ; তাহার বুক ফাটিয়া

যায়, তবু সে কাঁদিতে পারে না। শুধু নিশাকালে অন্ধকারে চক্ষুর জলে অভাগিনী শয্যা সিক্ত করিতে আরম্ভ করিল। আর খোকা? পিতাকে দেখিতে না পাইয়া কোন কোন সময় দুঃখ করিত, মহামায়ার কাছে, মায়ের কাছে বাবার নাম ধরিয়া ডাকিত, কিন্তু রামমোহনকে না পাইয়া তাহার প্রাণে যে বিষম ব্যথা লাগিত, তাহা অতি সহজে বুঝা যাইত। খোকা ক্রমে রোগা হইতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কৃষ্ণ পক্ষ, রাত্রি দ্বিপ্রহর গত হইয়াছে। মেঘের সাজ বেশী ছিল না, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে আকাশের সুদূর কোণে কোণে বিদ্যুৎ বিকাশ হইতেছিল। অন্ধকার, অনতিপ্রবল বায়ু বহিতেছিল, আর তীরে লগ্ন সেই সুবৃহৎ ঘোড়দৌড় নৌকা তরঙ্গাভিঘাতে উৎকম্পিত হইতেছিল। আর কোন সাড়া শব্দ নাই, কেবল তটপ্রতিঘাতী সেই তরঙ্গ এবং খর প্রবাহিত পদ্মাস্রোতের অবিরাম শব্দ। আরোহীরাও সুপ্ত, নিগাহ্‌বান, বরকন্দাজবর্গও বুঝি নিদ্রিত; মাঝি মাল্লারা নৌকা তীরে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে নিদ্রা যাইতেছিল।

এমন সময় কিসের যেন একটা শব্দ হইল। যে নৌকায় হেমেন্দ্রলাল শয়ন করিয়াছিল, তাহা ঘোড়দৌড়ের কিছু দূরে তীরে বাঁধা ছিল। শব্দ শুনিয়া হেমেন্দ্রলাল বাহির হইল; রামমোহনকে ডাকিয়া তুলিল। তেওয়ারি ঠাকুরেরা উঠিল, মাঝিরা উঠিল। হেমেন্দ্রলাল বাহির হইয়াই দেখিতে পাইল, তীর সংলগ্ন ঘোড়দৌড় আর সেখানে নাই। তখন পূর্ব্বাকাশের সীমান্ত ভাগ উদীয়মান চন্দ্রালোকে মৃদু আলোকিত

হইয়াছে। হেমেন্দ্র চাহিয়া দেখিল, দূরে খর স্রোতে ভাসমান সেই বৃহৎ নৌকা, আর তাহার সঙ্গে পাশাপাশি আর একখানি বৃহৎ ছিপ ; দুই নৌকার লোকের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল, মারামারি, লাঠালাঠি হইতেছে। যে শব্দ শুনিয়া হেমেন্দ্রের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল তাহা বন্দুকের শব্দ। মুহূর্ত্ত মধ্যে পরিধানের কাপড় মালকোচা মারিয়া রামমোহনকে প্রস্তুত হইতে বলিয়া হেমেন্দ্র নৌকার হাল ধরিয়া দাঁড়াইল। নিকটে সেই পাকা বাঁশের লাঠি। রামমোহনের তাড়নায় মাঝিরা তীরবেগে স্রোতের অনুকূলে নৌকা ছাড়িল। খাঁ সাহেবের সঙ্গীয় অন্য দুই তিন খানি ছোট নৌকা সেখানে ছিল ; ডাকাডাকিতে সেগুলিও সেই সময় ছুটিল। ঘোড়দৌড়ে বড় গোলযোগ। তাহার ছাদে অজস্র লাঠির আঘাত পড়িতেছিল। উভয় নৌকায় লোকের চীৎকার গর্জ্জন, কোলাহল, আঘাতের শব্দ, স্ত্রীলোকের ক্রন্দন নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। ঘোড়দৌড়ে ডাকাত পড়িয়াছে! ডাকাতদের স্থলচারী সাহায্যকারীগণ অলক্ষ্যে তাহার বন্ধনী দড়ি কাছি কাটিয়া দিয়া তাহাকে পদ্মার প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে। অমনি অদূরে লুক্কায়িত সুবৃহৎ ছিপ-নৌকাস্থিত ডাকাতেরা ঘোড়দৌড়ে পড়িয়া আক্রমণ করিয়াছে। মুহূর্ত্ত মধ্যে হেমেন্দ্রলাল সকল কথা বুঝিতে পারিল। তখন হেমেন্দ্রলালের উৎসাহ সূচক জলদগম্ভীর "জয়-কালী-মর্ত্তুজ-আলি-আলি আলি !"—এবং অন্যান্য নৌকার আরোহীগণের "হোঃ!" গর্জ্জনে সেই নিস্তব্ধ নৈশাকাশের দিগন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

ঘোড়দৌড় অনেক দূর ভাসিয়া গিয়াছিল, হেমেন্দ্র লালের নৌকাও অনেক দূর অগ্রসর হইল। এমন সময় একখানি ছোট নৌকা ঘোড়দৌড়ের নিকট হইতে বাহির হইয়া দূর তীরাভিমুখে ছুটিল। তাহার ভিতর হইতে স্ত্রীকণ্ঠের অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি বাহির হইতেছিল। হেমেন্দ্রের

পরিচিত এক জন তেওয়ারি সেই সময় জলমধ্য হইতে মাথা তুলিয়া বলিল ;—

"বাবুসাহেব, ধর, ধর, ডাকাতেরা সুরতবিবিকে লইয়া পালাইতেছে।" একজন মাঝি তেওয়ারিকে নৌকায় তুলিল। লাঠির আঘাতে তাহার ডান হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হেমেন্দ্রলাল নৌকার মুখ ফিরাইয়া সেই নৌকার পশ্চাতে ছুটিল। তখনও আঁধার যায় নাই ; ঘোড়দৌড়ে ও সেই ছিপে হাঙ্গামা তখনও চলিতেছিল ; মাঝিরা নৌকা চালনা ছাড়িয়াছে, দুই নৌকা ভাঁটায় ভাসিয়া যাইতেছিল। হেমেন্দ্র স্বীয় নৌকার মুখ ফিরাইয়া তীরবেগে সেই ছোট নৌকার পশ্চাৎ ছুটিল। সে নৌকা কূলে না পৌছিতেই হেমেন্দ্রের নৌকা তাহার উপর গিয়া পড়িল। মুহূর্ত্ত মধ্যে হেমেন্দ্রলাল লাঠি হাতে তাহার ছাদে লাফাইয়া পড়িল। কিন্তু তাহার মাথায় বিষম এক লাঠির আঘাত পড়িল। সে আঘাত তৃণস্পর্শবৎ জ্ঞান করিয়া পদাঘাতে হেমেন্দ্র আক্রমণকারীকে নৌকা হইতে জলে ফেলিয়া দিল। স্বীয় লাঠির বজ্রপ্রহারে আক্রমণোদ্যত আর একজন লোককে নৌকায় পাতিত করিল। এদিকে রামমোহনও সেই নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়া লাঠির আঘাতে তাহার পশ্চাতের মাঝিকে জলে ফেলিয়া দিল। সে নৌকায় তিন জন চালক এবং দুই জন পাইক ছিল। একজন পাইক হেমেন্দ্রের পদাঘাতে জলে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছিল, আর এক জন হেমেন্দ্রের লাঠির আঘাতে সম্বিৎশূন্য ; মাঝি একজন লাঠির আঘাতে জলে পড়িয়া গিয়াছিল, সে ভয়ে আর উঠিল না। অবশিষ্ট যাহারা নৌকায় ছিল তাহারা হেমেন্দ্রের নিকট আত্ম সমর্পণ করিল। নৌকা তখন কূলে ঠেকিয়াছে। হেমেন্দ্র বাহির হইতে বলিল ;—

"আমার নাম হেমেন্দ্রলাল রায়, আমি খাঁসাহেব আহম্মদ কাশেম আলিখাঁর আশ্রিত এবং প্রতিপালিত। শুনিলাম, খাঁ সাহেবের

কন্যা বিবিসাহেবাকে ডাকাতেরা এই নৌকায় তুলিয়া লইয়া যাইতেছিল। ঈশ্বর ইচ্ছায় ডাকাতেরা পরাস্ত হইয়াছে; আর কোন ভয়ের কারণ নাই।—কে আছেন এ নৌকায়?"

নৌকার ভিতর যে অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি হইতেছিল, নৌকা আক্রমণের সময় হেমেন্দ্রলাল তাহা শুনিয়াও শুনিতে পায় নাই। এখন সে শব্দ থামিয়া গিয়াছে, কেবল স্ত্রীলোকের অঙ্গসঞ্চালন-জনিত অলঙ্কারের ক্ষীণ শব্দ শ্রুত হইল। ভিতর হইতে একটী স্ত্রীলোক উত্তর করিল;—

"বাবুসাহেব আমরা আপনাকে চিনি। নৌকায় খাঁ সাহেবের কন্যা সুরতবিবি আছেন; আমি তাঁহার বাঁদী পিয়ার।"

"খাঁ সাহেবকে আমি পিতৃতুল্য মনে করি। তোমরা এ নৌকা পরিত্যাগ করিয়া খাঁ সাহেব যে নৌকা আমাকে থাকিতে দিয়াছেন, সেই নৌকায় এস।"

নৌকার ভিতর মৃদুস্বরে যেন কি কথা হইল; পরে পিয়ার বলিল;—

"বাবুসাহেব, খাঁসাহেবের নৌকা কোথায়?—তিনি কেমন আছেন? ডাকাতেরা কি চলিয়া গিয়াছে?"

তখন স্ফুট জ্যোৎস্নায় নদীর অনেকদূর পর্যান্ত লক্ষ্য হয়। নদীর যেস্থানে ঘোড়দৌড়ের সঙ্গে ছিপের যুদ্ধ হয়, সেস্থান অনেক উজানে। ডাকাতের সহিত লড়াই করিতে করিতে নদীর মধ্যভাগে এক চড়ায় খাঁ সাহেবের নৌকা ঠেকিয়া পড়িয়াছিল; তাহার পর ভাঁটা বাহিয়া ডাকাতেরা নৌকা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। বহু দূরে উজানে নদীর মাঝখানের দিকে অস্পষ্ট কম্পিত একটা আলো দেখিয়া তাহা ঘোড়দৌড়ের আলো বলিয়া হেমেন্দ্রের মনে হইল। হেমেন্দ্র কহিল;—

খাঁ সাহেবের নৌকা দূরে আছে; এখান হইতে লক্ষ্য হয় না; কিন্তু

ডাকাতদের ছিপ নৌকা ভাঁটি বাহিয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, আর দেখা যায় না। এখন কোন ভয় নাই। বিবি সাহেবাকে আমার নৌকায় আসিতে বল, তোমরা এস। আমরা এখনই খাঁ সাহেবের নৌকায় পৌঁছিব।"

অতি সাবধানে হেমেন্দ্র দুই নৌকা পাশাপাশি করিয়া একত্র করিয়াছিল। তখন দুইজন স্ত্রীলোক সেই নৌকা হইতে হেমেন্দ্রের নৌকায় উঠিল। একজন বাঁদী পিয়ার, প্রায় অনাবৃত মুখ; অপরা অবগুণ্ঠনবতী এবং অল্পবয়স্কা। এক কোণে দাঁড়াইয়া নিমেষ মাত্র দৃষ্টিতে হেমেন্দ্র চন্দ্রালোকে দেখিল, অপরা আপনার ঈষৎ দীর্ঘাঙ্গ আপাদ-মস্তক বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া ঈষন্নমিতমস্তকে পিয়ারের হাত ধরিয়া মৃদুপদে অপর নৌকায় উঠিলেন। তাঁহার হাতে মণিখচিত স্বর্ণ বলয় চন্দ্রালোকে জ্বলিয়া উঠিল। ইনি খাঁ সাহেবের কন্যা এসরাজ-বাদিনী বিবি মুরত-উন্নিসা!

মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। হেমেন্দ্র তখন সেই নৌকার ভিতরে চাহিয়া দেখিল, তখনও নৌকার মধ্যে এক কোণে একজন স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল। হেমেন্দ্র বিস্মিত হইল। এমন সময় বাঁদী পিয়ার পুনরায় সেই নৌকায় ফিরিয়া আসিল। হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কাহাকেও ফেলিয়া গিয়াছ ?"

"হাঁ ; আসিতেছি।"

বলিয়া পিয়ার ভিতরে প্রবেশ করিল ; এবং, বলিতে লজ্জা হয়, সেই স্ত্রীলোকটীর পৃষ্ঠে—পদাঘাত করিল , বলিল ;—

"যা ; আকাশের চাঁদে আর হাত বাড়া'স্ না। নাক কাণ বাঁচিয়ে গেলি, সে আমার অনুগ্রহ। পোড়ারমুখি, স্বর্গের পরীকে ঈশ্বর রক্ষা করেন, জানিস্!"

স্ত্রীলোকটী উঠিল ; ক্রোধে অপমানে ক্ষণকাল তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না ; শেষে অনুচ্চ কম্পিত স্বরে বলিল ;—

“আমার নাম পান্না, বাঁচিয়া থাকি তো দেখা হইবে।—ঐ পা, ঐ মুখ কুকুর দিয়া খাওয়াব।”

পিয়ার বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিল ; সকল কথা শুনিতে পাইল না। হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল ;—

“কে ও ?”

পিয়ার। “ডাকাতের লোক।”

হেমেন্দ্রকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া পিয়ার বলিল ;—

“ওকে কিছু বলিবেন না, কারণ আছে। এখন না, যদি সময় হয়, বলিব।”

পিয়ার অপর নৌকায় উঠিল ; বিস্মিত হেমেন্দ্রও উঠিল। মাঝিরা তখন নৌকা ছাড়িয়া দিল। রামমোহনের ইচ্ছা ছিল, ডাকাতের নৌকা খানা ডুবাইয়া দেয়, কিন্তু হেমেন্দ্রের নিষেধে তাহা পারিল না। তথাপি সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্য্যন্ত আনিয়া তাহার হালের দড়ি কাটিয়া প্রায় মধ্য-নদীতে ছাড়িয়া দিল। হাল-শূন্য নৌকা ভাসিয়া চলিল।

——o——

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের আর বড় বিলম্ব নাই, পূর্ব্বদিক প্রায় পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। পূরা পাল খাটাইয়া হেমেন্দ্রলালের নৌকা স্বুরতবিবিকে লইয়া উজান বাহিয়া চলিল। পথিমধ্যে একখানা ছোট নৌকার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দূর হইতে জিজ্ঞাসা করিয়া হেমেন্দ্র জানিতে পারিল যে, বিবি স্বুরত-উন্নিসার উদ্ধারার্থে যে সকল ডিঙ্গী নৌকা প্রেরিত হইয়াছিল, এ নৌকা তাহারই একখানা। তখন আরোহী বরকন্দাজকে ডাকিয়া বলিল;—

"আর ভয় নাই। বিবিসাহেবাকে আনিয়াছি। ডাকাতেরা পালাইয়াছে। ঘোড়দৌড় কতদূর ?"

"বেশী দূরে নয়; উজানে মধ্য চড়ায় ঠেকিয়া পড়িয়াছে। আমরা বিবিসাহেবার উদ্দেশে ফিরিতেছি; পাইক ও বরকন্দাজের আরও নৌকা বাহির হইয়াছে।"

"ফিরিয়া চল; পাল খাটাও। খাঁসাহেব কেমন আছেন? ডাকাতেরা কি মালামাল লুঠ করিয়াছে ?"

"খাঁসাহেব ভাল আছেন, বিবিসাহেবার জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। ডাকাতেরা নৌকার কোন জিনিশ পত্র সরায় নাই।"

"মজবুত করিয়া জাঙ্গা বাঁধ; কাণী খাটাও। নৌকা ডানমুখী ধরিতে হইবে।"

এখন হেমেন্দ্র আর হালের কাছে নয়, নৌকার সম্মুখভাগে লাঠি-হাতে দাঁড়াইয়া মাঝিদিগকে উপদেশ দিতেছিল। নৌকা পরিচালনে হেমেন্দ্রের শিক্ষা আজ বড়ই কাজে লাগিল। ডাকাতের ভয়ে মাঝিদের

বুদ্ধিশুদ্ধি অনেকটা জড়সড় হইয়াছিল। দুই ঘণ্টা যথাসাধ্য চালাইবার পর হেমেন্দ্রের নৌকা ঘোড়দৌড়ের নিকটবর্ত্তী হইল। খাঁসাহেবের নৌকা তখন চড়া ছাড়াইয়া জলে ভাসিতেছিল, মাঝিরা লগি ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেছিল। হেমেন্দ্র উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া বলিল ;—

"ভয় নাই, বিবিসাহেবা নিরাপদে এই নৌকায় আসিয়াছেন। ডাকাতেরা পালাইয়াছে।"

হেমেন্দ্রের নৌকা ঘোড়দৌড়ের পাশাপাশি ভিঁড়িল। বৃদ্ধ খাঁসাহেব স্বয়ং হেমেন্দ্রের নৌকায় আসিলেন। হেমেন্দ্র এক কোণে দাঁড়াইয়া রহিল। সুরত-উন্নিসা ও পিয়ার ভিতর হইতে বাহিরে আসামাত্র খাঁ-সাহেব সেই বর্দ্ধমানা কন্যাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলেন, তাহার মস্তক চুম্বন করিয়া সরিফন বেগম ও পিয়ারের সাহায্যে তাহাকে ঘোড়দৌড়ে উঠাইলেন। শেষে বলিলেন ;—

"হেমেন্দ্রলাল, নৌকা পাশাপাশি রাখ, দূরে যাইও না।"

ভিতরে প্রবেশ করিয়া কন্যা ও পিয়ারের মুখে সংক্ষেপে সেই উদ্ধার বৃত্তান্ত শুনিয়া খাঁ সাহেব তখনই হেমেন্দ্রলালকে ডাকিলেন। হেমেন্দ্রের বিপর্য্যস্ত, সিক্ত বস্ত্র। বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া যাইবার তাহার ইচ্ছা। কিন্তু খাঁ সাহেব স্বয়ং নৌকার বাহিরে আসিয়া ডাকিলেন। হেমেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। তখন বেলা হইয়াছে। খাঁ সাহেব দেখিলেন, মাথা ফাটিয়া তাহার ললাট, কপোল, স্কন্ধ, কাপড় পর্য্যন্ত রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। হাতে ধরিয়া তাহাকে অতি ত্রস্তে নৌকার মধ্যে লইয়া গেলেন, চীৎকার করিয়া লোক জন ডাকিলেন ; জল আনিতে বলিলেন। "কি হইয়াছে ?" বলিয়া লোক জন আসিল ; পিয়ার আসিল, সরিফন বেগম পর্য্যন্ত অর্দ্ধ দরজা খুলিয়া নিকটে দাঁড়াইলেন।

খাঁসাহেব। "ডাকাতেরা হেমেন্দ্রকে জখম করিয়াছে। সাদেক, জল আন্, পিয়ার, পরিষ্কার নেক্ড়া আন্, ডাবর, গামলা আন্।"

হেমেন্দ্র বলিল ;—"কিছুই হয় নাই, সামান্য আঘাত মাত্র—"

খাঁসাহেব। "কিছু হয় নাই! রক্তে সমস্ত শরীর, কাপড় ভাসিয়া গিয়াছে। তুমি ব'স। সাদেক, জল ঢালিয়া দে ; পিয়ার, সাবধানে ধুইয়া দে।"

হেমেন্দ্র আপত্তি করিল ; নিজের নৌকায় যাইয়া গা মাথা ধুইতে চাহিল। খাঁ সাহেব শুনিলেন না। সকলে মিলিয়া তাহার গা মাথা ধুইয়া দিল। ললাটের উপরিভাগে যেখানে আঘাত লাগিয়াছিল, সেখানে সিক্ত পটি লাগাইয়া কাপড় দিয়া মাথা বেষ্টন করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। আঘাত বাস্তবিক গুরুতর নহে। হেমেন্দ্র ডাকাতের নৌকার ছাদে লাফাইয়া পড়িবার সময় নীচু হইতে এক জন ডাকাত লাঠির ঘা মারিয়াছিল, সুতরাং আঘাত পূর্ণ জোরে লাগে নাই।

তখন বৃদ্ধ খাঁ সাহেব গদ্গদ কণ্ঠে হেমেন্দ্রকে বলিলেন ;—

"হেমেন্দ্র, তুমি আজ আমার কন্যাকে রক্ষা করিয়াছ। তোমাকে কোন দিন দেখি নাই, তোমার নাম পর্য্যন্ত কোন দিন শুনি নাই, কিন্তু যেদিন নদীর ধারে সেই গাছের তলায় তোমার সঙ্গে দেখা হয়, সেই দিন হইতেই তোমাকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছি।"

হেমেন্দ্র মস্তক নত করিয়া অভিবাদন জানাইল। খাঁ সাহেব বলিতে লাগিলেন ;—

"স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছি, তাহার বা কোন বিশেষ কারণ ছিল!—সে অনেক দিনের কথা, বাঁচিয়া থাকিলে তোমার মতই বা হইত!—তোমার বয়সই হইত!"—খাঁ সাহেবের কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল।—"তোমাকে দেখিয়া তাহার কথা মনে পড়িয়াছিল ; এখনো যেন কেন পড়ে!—আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে প্রাণপণে নিজের ভগ্নীকে রক্ষা করিত। তুমি তাহা করিয়াছ।—আজ হইতে তুমি আমার পুত্র।"

খাঁ সাহেবের চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়াছিল।

হেমেন্দ্র বলিল ;—"আমি আপনার আশ্রিত, অনুগৃহীত—"

"তুমি আমার কন্যার প্রাণরক্ষক, তুমি আমার পুত্র। তুমি ব'স।"

খাঁসাহেব উঠিলেন, ভিতরের দ্বার খুলিয়া পিয়ারকে বলিলেন ;—"পিয়ার, সুরত কোথায়? এস, মা, একবার এদিকে এস। পিসী, তুমি সুরতকে একবার এই কামরায় লইয়া এস।"

কিছুকাল পরেই সরিফন বেগম কামদার ঢাকাই মলমলের বহুমূল্য ওড়নায় আবৃতদেহ সুরতের হাত ধরিয়া সেই কামরায় প্রবেশ করিলেন। হেমেন্দ্র সসম্ভ্রমে দাঁড়াইল, দুই এক পদ পশ্চাৎ সরিয়া বিনীত শেলাম করিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল। খাঁ সাহেব বলিলেন ;—

"সুরত, যিনি আজ তোমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, প্রাণ অপেক্ষাও যাহা অধিক,—মান ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন, ইনি সেই হেমেন্দ্র-লাল রায়। ইঁহাকে আমি পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছি। পুত্রের মত কাজ ইনি করিয়াছেন। যদি সে—তাহাকে তুমি দেখ নাই, কিন্তু তাহার কথা শুনিয়াছ,—আজ যদি সে বাঁচিয়া থাকিত, তবে এমনটাই বা হইত; এমন করিয়াই তোমাকে বাঁচাইত!—আজ হইতে ইঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভাই বলিয়া মানিও। তুমি মুসলমানকন্যা, অপরিচিত লোকের মুখ দর্শন, অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ সাক্ষাৎ তোমার পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু আজ আমি তোমার পিতা তোমাকে বলিতেছি,—আজ হইতে ইঁহাকে ভাই বলিয়া মনে করিবে। ছোট ভগ্নীর ন্যায় অসঙ্কোচে ইঁহার সঙ্গে দেখা করিবে, আলাপ করিবে।"

সুরত-উন্নিসা নমিতমস্তকে হেমেন্দ্রকে অভিবাদন করিল; একবার মাত্র সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া হেমেন্দ্রের দিকে চাহিল, কিন্তু হেমেন্দ্র মুখ নত করিয়াছিল, সে দৃষ্টি দেখিতে পাইল না। সরিফন বেগম বলিলেন ;—

"প্রথম হইতেই তোমাকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, তোমার মাতা পিতা নাই; আজ হইতে তুমি আমাদের আপনা হইলে। সুরত আমাকে 'দিদি' বলিয়া ডাকে। তুমি তাহার ভাই, আজ হইতে তুমিও আমাকে 'দিদি' বলিও।"

হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে হেমেন্দ্রের বাক্যরোধ হইয়াছিল; সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেবল মস্তক নত করিয়া শেলাম করিল; তাহার চক্ষু হইতে দরবিগলিত অশ্রুধারা পড়িতেছিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

সরিফন বেগম সুরতকে লইয়া ভিতরের কক্ষে চলিয়া গেলে পাল চড়াইয়া ঘোড়দৌড় ছাড়িয়া দেওয়া হইল। পালভরে সেই প্রকাণ্ড নৌকা পদ্মার প্রবল স্রোত উজান বহিয়া চলিল। হেমেন্দ্রলাল তখন অনেক কথা শুনিলেন; স্বয়ং খাঁসাহেবই বলিলেন।

যাহারা ঘোড়দৌড় আক্রমণ করিয়াছিল তাহারা প্রকৃতপক্ষে ডাকাত নহে। ডাকাতি করা তাহাদের উদ্দেশ্যও ছিল না। প্রথমে খাঁসাহেব তাহাদিগকে ডাকাত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ছিপের লোক যখন স্রোতবক্ষে ঘোড়দৌড় ভাসাইয়া দলে বলে আক্রমণ করে, তখন ঘোড়-দৌড়ের প্রহরী সিপাহিমানেরা নিদ্রিত ছিল, হঠাৎ জাগরিত হইয়া ক্ষণ-কালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। প্রহরী রামচরণ তেওয়ারি বন্দুক তুলিয়া আওয়াজ করিবার সময়ই একজন আক্রমণকারী লাঠির আঘাতে তাহার হাত হইতে বন্দুক ফেলিয়া দেয়। বন্দুক আওয়াজ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহার কোন লক্ষ্য ছিল না। আক্রমণকারীরা হঠাৎ চড়াও

করিয়া নৌকার প্রহরীগণের অস্ত্রশস্ত্র প্রায় অনেক গুলিই আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছিল। শেষে লাঠি, বাঁশ, লগি ইত্যাদি লইয়া ঘোড়-দৌড়ের লোকেরা লড়াই করে। ছাদের উপরেই প্রবল লাঠালাঠি হয়। এদিকে চারি পাঁচ জন আক্রমণকারী জানালা ভাঙ্গিয়া নৌকার ভিতর প্রবেশ করিয়া সুরতবিবিকে লইয়া যায়। বাঁদী পিয়ার সুরতকে জড়াইয়া ধরিয়া ছিল; আক্রমণকারীরা তাহাকেও সঙ্গে সঙ্গে লইয়া যায়। মুহূর্ত্তমধ্যে এই ঘটনা হয়, তখন খাঁসাহেব বাহিরের দরজা খুলিয়া নিজের লোকদিগকে উৎসাহিত করিতেছিলেন। স্ত্রীলোকের চীৎকারে ভিতরে আসিয়া দেখিলেন, আক্রমণকারীরা সুরতকে একখানা ছোট নৌকায় উঠাইয়াছে। তখন নৌকার ছাদে ভয়ানক মারামারি হইতে-ছিল। খাঁসাহেবের চীৎকারে লোক আসিল। রামচরণ তেওয়ারি সুরত-উন্নিসার উদ্ধার জন্য সেই ছোট নৌকায় লাফাইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আক্রমণকারীরা তাহাকে দারুণ প্রহার করিয়া জলে ফেলিয়া দেয়। জলে ভাসিতে ভাসিতে রামচরণই সুরত বিবির হরণ সংবাদ হেমেন্দ্রকে দেয়। সুরতকে লইয়া সেই ছোট নৌকা চলিয়া গেলেও ঘোড়দৌড় ও ছিপে খুব মারামারি চলিতেছিল। উভয় নৌকাই ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন সময় মধ্য নদীতে এক চড়ায় ঘোড়দৌড় লাগিয়া গেল। আক্রমণ-কারীরা তখন হাঙ্গামা পরিত্যাগ করিয়া জয়ধ্বনি করিয়া স্রোত ভাঁটা বহিয়া চলিয়া যায়।

প্রকাণ্ড নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেলে ভাসান সহজে হয় না। এ দিকে ছিপ দাঁড় বাহিয়া দ্রুতবেগে ভাঁটিমুখী চলিয়া গেল। খাঁসাহেব নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সঙ্গীয় যে দুই তিন খানা ডিঙ্গী নৌকা ছিল সেগুলি সেখানে পৌছিয়াছিল। লোকজন সঙ্গে দিয়া সুরতের অনু-সন্ধান ও উদ্ধারার্থে সেগুলিকে পাঠাইলেন। সুরতকে উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তাহার একখানির সঙ্গে হেমেন্দ্রের দেখা

হইয়াছিল। আক্রমণকারীদের সঙ্গে মারামারিতে ঘোড়দৌড়ের তিন জন নিগাহমান এবং চারি জন মাঝি জখম হইয়াছিল; রামচরণ তেওয়ারী গুরুতর জখম হইয়াছিল। ডাকাতদের কতটি লোক জখম হইয়াছিল, তাহা ঠিক করিবার উপায় ছিল না; একজনকে ঘোড়দৌড়ের ছাদে পাওয়া গিয়াছিল; লাঠির আঘাতে সে অচেতন হইয়া পড়ে। শেষে তাহার বাচনিক সকল কথা প্রকাশ হয়।

মিরজা গোলাম আলি সুরত-উন্নিসার পাণিগ্রহণ চেষ্টায় বিফল-মনোরথ হইয়া পথি মধ্য হইতে সুরতবিবিকে অপহরণের অভিসন্ধি করেন, অভিসন্ধি প্রায় সফলও হইয়াছিল। যেখানে ঘোড়দৌড় এবং ছিপে হাঙ্গামা হয়, তাহার কিছু দূর ভাঁটিতেই প্রসিদ্ধ গলাকাটার খাল। এই খাল পদ্মা হইতে বাহির হইয়া বক্র পথে প্রায় দশ বার ক্রোশ ঘুরিয়া শেষে বিলাসপুর গ্রামের নিকট পুনরায় পদ্মায় পড়িয়াছে। মিরজা গোলাম আলির উপদেশ ছিল, সুরতবিবিকে লইয়া সেই ছোট নৌকা সেই খাল বাহিয়া বিলাসপুরের নিকট পুনরায় পদ্মায় পড়িবে; মিরজা স্বয়ং ছিপ লইয়া পদ্মা ভাঁটি বাহিয়া বিলাসপুরে তাহার সঙ্গে মিলিত হইবেন। অভিসন্ধি প্রায় সিদ্ধ হইয়াছিল। হেমেন্দ্রলালের সাহস এবং কৌশলেই তাহা ব্যর্থ হইয়াছিল। খাঁ সাহেব তখন মিরজার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হেমেন্দ্রকে বলিয়া পরিশেষে বলিলেন ;—

"হেমেন্দ্র, তুমি শুধু ডাকাতের হাত হইতে সুরতকে রক্ষা কর নাই; ডাকাত অপেক্ষা অধম, শত গুণে পাপিষ্ঠের হাত হইতে, অপমান লাঞ্ছনা হইতে তাঁহাকে বাঁচাইয়াছ। পদ্মা ছাড়াইয়া একবার সেই খালে পড়িলে আর আমরা সুরতের খোঁজ পাইতাম না। ঋণ চিরকাল অপরিশোধ থাকিবে।"

"আমি—"

"আর শুন; রাত্রির ঘটনা ডাকাতি বলিয়াই সুরত জানে। ইহার মধ্যে যে মিরজা ছিল, সুরত তাহা জানে না, তাহাকে বলাও হয় নাই; জানিতে পারিলে তাহার চিত্ত ভয়ানক অশান্তি-ময় হইত। তোমার কাছে গোপন করিবার আমার কিছু নাই, তাই তোমাকে বলিলাম।"

সেদিন অপরাহ্ণে খাঁ সাহেবের নৌকা "বক্সীর কোল" নামক প্রসিদ্ধ ফাঁড়ির মুখে আসিয়া পৌছিল। সে "কোলে" প্রতি রাত্রিতে অনেক নৌকার সমাগম হইত। সেরাত্রিতে ঘোড়দৌড়ের প্রহরী নেগাহমানের ডাক, হাঁক, চীৎকারে "কোল" স্থিত নৌকারোহীগণের নিরুপদ্রবে নিদ্রা যাওয়া অসম্ভব হইয়াছিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র ডিঙ্গীতে চড়িয়া সুরত-উন্নিসার বাঁদী পিয়ার হেমেন্দ্রের নৌকার কাছে গেল।

হেমেন্দ্রকে শেলাম করিয়া পিয়ার বলিল;—

"বাবুসাহেব, বিবি সুরত-উন্নিসা আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

"বিবিসাহেবা পাঠাইয়াছেন!—কেন?"

"আপনি কেমন আছেন, জানিবার জন্য। সুরত বিবি আপনাকে ভাইসাহেব বলিয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বিবিসাহেবা বলিলে তিনি দুঃখিত হইবেন।"

"আমি তাঁহার পিতার আশ্রিত এবং প্রতিপালিত মাত্র।"

"আপনি খাঁ সাহেবের ধর্ম্মপুত্র। আপনি এখনো তাঁহার বিশেষ পরিচয় পান নাই। আপনি তাঁহার কন্যার ইজ্জত রক্ষা করিয়া যে উপকার করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া তো মানুষের স্বাভা-বিক ধর্ম্ম; খাঁ সাহেব তো চিরকাল সে জন্য আপনার কাছে ঋণী; কিন্তু আপনাকে তিনি শুধু সে ভাবে দেখেন না। আপনি শুনিয়া থাকি-বেন, তাঁহার একটী পুত্র পাঁচ বৎসরের হইয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে।"

"তাহা আমি শুনিয়াছি।"

"তখনও সুরতবিবির জন্ম হয় নাই। শুনিয়াছি, সে ছেলে বাঁচিয়া থাকিলে প্রায় আপনার বয়সী হইত। চেহারাতেও বোধ হয় কোন সাদৃশ্য আছে। প্রথম দিন আপনাকে দেখিয়াই খাঁ সাহেবের চিত্ত স্নেহে গলিয়া গিয়াছিল।"

"আমি নিঃসহায়; এমন পিতৃতুল্য মুরব্বি আমি পাইয়াছি, আমার কত সৌভাগ্য!"

"আপনি ওনৌকা হইতে চলিয়া আসিলে খাঁ সাহেব আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, আপনাকে তাঁহার প্রিয় পুত্র মনে করিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদা চলিতে হইবে।"

"তোমাদের দশ জনের সুদৃষ্টি এবং অনুগ্রহও আমার সৌভাগ্যের ফল।

"আমি সুরতবিবির বাঁদী, আপনারও বাঁদী বলিয়া জানিবেন আপনি কেমন আছেন, সুরতবিবি জিজ্ঞাসা করিতে বলিয়াছেন। জ্ব হয় নাই তো?"

"আমার কোন কষ্ট নাই; সামান্য আঘাত লাগিয়াছিল মাত্র। সামান্য একটুকু রক্ত পড়িয়াছিল; দুএক দিনেই ঘা সারিয়া যাইবে। বিবি সাহেবাকে আমার শেলাম জানাইয়া বলিবে, আমি বেশ ভাল আছি।"

"আপনি ভাল আছেন শুনিলে সুরতবিবি খুব খুসী হইবেন। প্রথম সাক্ষাতে তিনি লজ্জায় কিছু বলিতে পারেন নাই; তাঁহাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না। তাঁহার প্রাণ, মান, ইজ্জত আপনি রক্ষা করিয়াছেন সময়ে সে মহা ঋণের কথা তিনি অবশ্যই আপনাকে বলিবেন।"

"তিনি সে বিষয়ের আর উল্লেখ না করেন, এই আমার প্রার্থনা।"

পিয়ার নিজের বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি রৌপ্য নির্ম্মিত কার্ব বাহির করিল। তাহাতে কত কারুকার্য্য, কত নকসা। কার্বাটি হেমেন্দ্রের হাতে দিয়া পিয়ার বলিল;—

"ইহাতে গোলাব আছে। মাথা গরম বোধ করিলে, মাথায়, ললাটে দিবেন।"

"এ কার্য্য—"

"সুরতবিবি পাঠাইয়াছেন।"

দাত্রীর উদ্দেশে সেলাম করিয়া তখনই কতকটা গোলাপ জল মস্তকে দিয়া হেমেন্দ্রলাল বলিল ;—

"বিবিসাহেবাকে—"

"তিনি আপনাকে ভাইসাহেব বলিয়াছেন!"

"দিদিসাহেবাকে বলিও, আমি সুস্থ, পরম সুখী হইলাম।"

"আর একটি কথা। ডাকাতের নৌকায় একটি স্ত্রীলোক দেখিয়াছিলেন—"

"আক্রমণকারীরা যে ডাকাত নহে, তাহা আমি খাঁসাহেবের নিকটে শুনিয়াছি।"

"কি শুনিয়াছেন?"

"মিরজা গোলাম আলির কথা, বিবিসাহেবার সঙ্গে মিরজার সম্বন্ধের প্রস্তাব, বিবিসাহেবার অমত, সকলই শুনিয়াছি। কিন্তু সে স্ত্রীলোকটি কে? তাহাকে তুমি চিনিতে?"

"সে মিরজার বাঁদী পান্না। আমার সঙ্গে বহু পূর্ব্বে আলাপ ছিল। আমরা জাহাঙ্গীর নগর থাকার সময় পোড়ারমুখী বিবিকে দেখিতে আসিয়াছিল। সম্বন্ধের প্রস্তাবে সুরতবিবি আমার নিকট অসম্মতি প্রকাশ করেন। পান্না আরো একদিন আসিয়াছিল, আমি তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিই নাই; অপমানে আমাকে শাসাইয়া যায়। শেষে মিরজাকে পরামর্শ দিয়া সুরতবিবিকে চুরি করিতে আসিয়াছিল।"

"চোরকে ছাড়িয়া দিলে কেন?"

"ধরিয়া আনিলে সুরতবিবি সকল কথা জানিতে পারিতেন; তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে বড় আঘাত লাগিত।"

"তা যথার্থ বটে।"

বাক্‌নিপুণা বাঁদীর সৌজন্যতা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে হেমেন্দ্রলাল মুগ্ধ হইল।

সেই দিন হইতে হেমেন্দ্রলাল খাঁসাহেবের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে জড়িত হইয়া পড়িল। প্রায় প্রতিদিন দুই এক ঘণ্টা সময় হেমেন্দ্রকে খাঁসাহেবের নৌকায় কাটাইতে হইত। শাস্ত্রালাপ, গ্রন্থপাঠ; বাদ্য, সঙ্গীত, কথোপকথনে হেমেন্দ্রলাল খাঁসাহেবের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। ক্রমে খাঁসাহেব এবং সরিফন বেগমের সাক্ষাতে সুরত উন্নিসার সঙ্গেও তাহার দেখা এবং কথা আরম্ভ হইয়াছিল। সে দেখা ও কথা ভ্রাতাভগ্নীসুলভ শ্রদ্ধা প্রীতি, ভক্তি সম্ভ্রমে নিয়মিত ছিল।

তৃতীয় ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খাঁসাহেব মুরসিদাবাদ পৌছিলেন। সেকালে অনেক আমির ওমরাহের অবস্থান সাধারণতঃ মফঃস্বলে হইলেও সহর মুরসিদাবাদে তাঁহাদের বাড়ী ছিল। সরকারী কার্য্যে অনেক সময় তাঁহাদের রাজধানীতে আসিতে হইত, তখন নিজের বাড়ীতেই আসিয়া থাকিতেন। বর্ত্তমান সাহানগরের দক্ষিণ পশ্চিমে খাঁসাহেব কাশেম আলিখাঁর বাড়ী ছিল। ভাগীরথীর উপরেই বিস্তৃত, বৃহৎ দোতালা বাড়ী; আসবাব লওয়াজেমায় পরিপূর্ণ। রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করার সংবাদ খাঁসাহেব পদাতিক দ্বারা পূর্ব্বেই পাঠাইয়া ছিলেন। সুতরাং তিনি পৌছার পূর্ব্বেই বাড়ী ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং আসবাবপত্রের যথোপযুক্ত বিন্যাস করা হইয়াছিল।

রাজধানীতে পৌছিয়া হেমেন্দ্রলাল নিজের অবস্থানের জন্য একটী উপযুক্ত বাড়ী অনুসন্ধান করিয়া লইবে, স্থির করিয়াছিল। কিন্তু খাঁসাহেব তাহাকে আর পৃথক বাড়ী করিতে দিলেন না; সস্নেহে হেমেন্দ্রকে বলিলেন;—"সহরে কাহারও সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে?"

"পরিচয় নাই; কিন্তু শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কেহ কেহ এখানে আছেন। খুঁজিয়া লইতে পারিব।"

"খুঁজিয়া কি হইবে?"

"যদি কাহাকেও পাই, তবে—তবে বাসার একটা বন্দোবস্ত করিতে হইবে।"

স্থির দৃষ্টিতে ক্ষণকাল হেমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া খাঁসাহেব বলিলেন,—

"তুমি হিন্দু, আমার এবাড়ীতে থাকা তোমার সুবিধা হইবে না; তাহা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু তুমি কোথায় যাইবে? কাজ-কর্ম্মের উম্মেদওয়ার তুমি, খরচ পত্র কেমন করিয়া চালাইবে? এই অপরিচিত সহরে তোমাকে একা একা থাকিতে দিতে পারি না। তোমার থাকার বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি।"

"আপনি ঠিক করিয়াছেন!"

"যখন তোমার অবস্থা ভাল হইবে, তখন তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিও; কিন্তু এখন তাহা হইবে না। তোমাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তোমার সুখ সুবিধা আমার দেখিতে হইবে। স্বধর্ম্মী হইলে নিজ পরিবারের মধ্যে তোমাকে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতাম। ভিন্নধর্ম্মী হইলেও তোমাকে দূরে রাখিতে পারিব না। আমার বাড়ীর সঙ্গেই যে বাগানবাড়ী আছে, তুমি তাহাতে থাকিবে। রাজধানীতে অনেক আমিরের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। বৃদ্ধ নবাব নাজিমও এ অধমকে চিনেন। যাহাতে তোমার উন্নতি হয় তাহা আমি করিব।"

ভাগীরথীর ধারে ধারে প্রায় তিন চারি বিঘা ভূমি যুড়িয়া খাঁসাহেবের বাড়ী এবং বাগানবাড়ী। উত্তরে বাড়ী, তাহার দক্ষিণে ফুলের বাগান, বাগানের মধ্যস্থলে বৈঠকখানা, তাহার দক্ষিণে বাগানের দক্ষিণ পাশে একটা ছোট বাড়ী। যে জমির উপর এই বাড়ী তাহা একটি ক্ষুদ্র উপদ্বীপবিশেষ, প্রায় তিন দিকেই ভাগীরথী। এক পার্শ্ব দিয়া নদীতে নামিবার একটি অপ্রশস্ত পথ। এই ক্ষুদ্র বাড়ীতে হেমেন্দ্রলালের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

খাঁসাহেবের বাড়ীর সদর রোথ পূর্ব্ব পার্শ্বে, সহরের দিকে ; কিন্তু পশ্চিমে ভাগীরথীর দিক হইতেই বাড়ীর শোভা। অন্দর মহল হইতে খিড়কির দরজা সদ্য নদীস্রোতে নামিয়াছে। তাহার দক্ষিণে বাড়ীর সদর ঘাট, ভাগীরথীর অনেক দূর পর্য্যন্ত ইট ও পাথরে গাঁথা সিঁড়ি। তাহার দক্ষিণে বাগান বাড়ীর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অথচ সুদৃশ্য ঘাট, সাদা পঙ্কের কাজ করা চিলছত্র। সদরবাড়ী হইতে আরম্ভ করিয়া বাগানের শেষ পর্য্যন্ত সারি সারি ইটের থাম, তাহার উপর রংকরা সাদা ধপ্‌ধপে মাটির কলসী ; লোহার শিকের বেড়া ; তাহার উপর ঝুমকা, অপরাজিতা, মাধবী ও লবঙ্গলতার অবিচ্ছেদ সমাবেশ। বাগানে শত শত ফুলের গাছ; যূঁই যাতি বেল, চামেলী গন্ধরাজ রঙ্গন, রজনীগন্ধা কামিনী কৃষ্ণচূড়া, বসোরার গোলাপ, বোগদাদের গোলাপ, আরও কত গোলাপ। শত গাছে সহস্র ফুল, প্রতি ফুলে কত শোভা, কত অপরিমেয় সৌরভ! বিশ্বস্ত মালী মুনিবের অসাক্ষাতেও বাগানের শোভা সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়াছিল।

হেমেন্দ্রলালের জন্য যে বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইল তাহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সুখ স্বচ্ছন্দতার উপযোগী সমস্ত আসবাবে অতিশীঘ্রই সুসজ্জিত হইল। নিজে খাঁসাহেব, বেগম সরিফন, সুরত বিবিও বা বুঝি সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত সংগ্রহে সাহায্য করিলেন। একজন পাচক ব্রাহ্মণ ও একজন হিন্দু ভৃত্য হেমেন্দ্রের জন্য নিযুক্ত হইল।

সহরে চলিলাম বলিয়া চিঠি লিখিয়া হেমেন্দ্র বাড়ী হইতে গোপনে চলিয়া আসিয়াছিল। সহর বলিলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্ত্তী বলিয়া জয়নগরের লোকে জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা সহর) বুঝিত ; হেমেন্দ্র তাহা জানিত। জেঠা মহাশয় যে তাহার জন্য সেখানে বিশেষ অনুসন্ধান করাইবেন, তাহাও সে বেশ জানিত ; আর অনুসন্ধানে না পাইলে যে সকলের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে, সে তাহাও জানিত। সেই জন্য মুরসিদাবাদ

পৌঁছিয়া নিজের মঙ্গলসংবাদ জেঠা মহাশয়ের নিকট পাঠাইবার জন্য হেমেন্দ্র ব্যাকুল হইল।

কিন্তু সে আমলে দূর দেশে সংবাদ পাঠান সহজ ব্যাপার ছিল না। সকল স্থানে সর্ব্বদা লোকজনের যাতয়াত ছিল না। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ ভদ্রাসন ছাড়িয়া দূর দেশে যাইত না। নবাবী আমলে এখনকার মত ডাকের বন্দোবস্ত ছিল না। বিশেষ কোন আবশ্যক হইলে ধনীরা দূর দেশে সংবাদ পাঠাইবার জন্য আরিন্দা নিযুক্ত করিতেন, অথবা চারি পাঁচ অথবা ততোধিক ব্যক্তি একত্র হইয়া এক আরিন্দা নিযুক্ত করিতেন। আরিন্দা ব্যবসায়ী লোকই পৃথক্ ছিল। তাহারা পথ ঘাট ভালরূপ চিনিত, যে গ্রামের পর যে গ্রামে গেলে অতিথির স্থান পাওয়া যাইত, তাহারা তাহা জানিত। পত্রবাহক আরিন্দা এক অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের পত্র লইয়া যাইত। প্রত্যেক পত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট পৌঁছাইয়া পরমাদরে অন্ততঃ এক বেলা আহার ও পুরস্কার লাভ করিত। কোন স্থানে আরিন্দা যাইতেছে সংবাদ পাইলে, সেস্থানের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের অনেক চিঠিপত্র তাহার জেম্মায় পড়িত। সহর হইতে কোন গ্রামে আরিন্দা পৌঁছিলে সেগ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের লোক অনুসন্ধান করিতে আসিত, তাহাদের কোন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব আরিন্দার মারফত কোন চিঠিপত্র পাঠাইয়াছেন কি না। আজি কালি পল্লীগ্রামবাসী মাতা পিতা, ভাই বন্ধু, স্ত্রী ভগ্নীরা ডাক হরকরার জন্য কত সাগ্রহ প্রতীক্ষা করেন, হরকরা প্রতিদিন না হয়, এক দিন পর এক দিন গ্রামে আসিয়া থাকে, কিন্তু সে আমলে মাসের পর মাস চলিয়া যাইত, ছমাস, বৎসর চলিয়া যাইত, তথাপি হয় ত আরিন্দার সমাগম হইত না। যদি বা হইত, কিন্তু মুরসিদাবাদের নহে, রঙ্গপুরের; পূর্ণিয়ার নহে, পাটনার! কত আশায় নিরাশ উপস্থিত হইত! কিন্তু লোকও সহিষ্ণু ছিল। পত্রের পৃষ্ঠে উত্তর না পাইলে তাহাদের হৃদয় একেবারে

ভাঙ্গিয়া পড়িত না। আর, পত্রলেখাও সহজ ব্যাপার ছিল না। গ্রামের মধ্যে একজন ভাল কলমবন্দ (লেখক) থাকিলে সমস্ত গ্রামের, এমন কি, ভিন্ন গ্রামের চিঠিপত্রাদি লেখার জন্যও তাহার ডাক পড়িত। ভুসোর আঁটাল, চক্‌চকে কালি দিয়া তুলট অথবা রঙ্গিল চীনা কাগজে বহুদিনের বিস্তারিত বিবরণ সংক্ষেপে স্পষ্ট করিয়া লেখা খুব লায়েক লেখ্‌নেওয়ালার কর্ম্ম ছিল। লিখিবার পূর্ব্বে কাগজখানি ভাঁজ করিতেও কত ওস্তাদির আবশ্যক হইত।

মুরসিদাবাদে পৌঁছিয়া তৃতীয় দিনে হেমেন্দ্রলাল অনুসন্ধানে সংবাদ পাইল যে, সাহানগর হইতে একজন আরিন্দা তাহাদের দেশের দিকে যাইবে। হেমেন্দ্র সেই আরিন্দার মারফত জেঠা মহাশয়ের নিকট এক পত্র লিখিল। তাহাতে নিজের এবং রামমোহনের নিরাপদে মুরসিদাবাদ পৌঁছার কথা, খাঁসাহেবের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ লাভের কথা, এবং ভবিষ্যতে তাহার উন্নতির যে বিশেষ সম্ভাবনা আছে, তাহা বিস্তারিত করিয়া লিখিল। না বলিয়া কহিয়া চলিয়া আসার অপরাধের জন্য শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। শ্রীচরণে শত শত প্রণাম জানাইয়া মাতা ঠাকুরাণী, ঠাকুরমা রক্ষাকালী ঠাকুরাণী, ধাইমা কল্যাণীর পদেও সহস্র প্রণাম জানাইল। নিজের স্ত্রীপুত্রের কথা কিছুই লিখিল না। আজকালের সভ্য যুবকদিগের মধ্যেও লজ্জাশীল অনেকে পিতা পিতৃব্যের নিকট চিঠিতে স্ত্রীপুত্রের কথা স্পষ্ট করিয়া লেখেন না, সে আমলের অসভ্য সমাজে তো ওরূপ লেখা রীতিবিরুদ্ধই গণ্য হইত।

পত্র লেখা শেষ করিয়া হেমেন্দ্রলাল তাহা রামমোহনকে পড়িয়া শুনাইল। রামমোহন পত্রের ভারি প্রশংসা করিল, কিন্তু পত্রে একটা কিছু অভাব আছে, কি যেন একটা কিছু লেখা হয় নাই, তাহার মুখের ভাবে হেমেন্দ্রলাল তাহা বুঝিতে পারিল, জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি রে রামমোহন, তারিফ্ করিতে করিতে থামিলি যে ?"

"কি জান, দাদাবাবু, এতকথা লিখিয়াছ, বুড়ির কথা পর্য্যন্ত লিখিয়াছ, কিন্তু বৌমার কোন কথা লেখা হয় নাই কেন ?"

"তাকেও একটা প্রণামের কথা জানাইব নাকি ?"

"তামসা রাখ ; খোকার কথাও কিছু লেখ নাই !"

হেমেন্দ্রের চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল, সে বলিল,—

"তোর বুদ্ধি নাই ; গুরুলোকের কাছে লিখিতেছি, নিজের স্ত্রী, নিজের পুত্রের কথা কি নিজে লেখা যায় ?"

"আমি তা বুঝি না, না লিখিলে তাহাদের সংবাদ কেমন করিয়া পাইব ! পত্রের পিঠে ছোট ছোট করিয়া লিখিয়া দাও।"

হেমেন্দ্রের হাসি পাইল, বলিল ;—"লিখিলে সকলে আমাকে নির্লজ্জ মনে করিবে। "আমি না লিখিলেও জেঠা মহাশয় তাহাদের সংবাদ চিঠিতে অবশ্যই লিখিবেন।—তুই যদি লিখিতে জান্‌তিস্, তা'হলে খুব সুবিধা হইত।"

রামমোহন তখন প্রতিজ্ঞা করিল ;—"আজ হইতে আমি লিখিতে অভ্যাস করিব।"

বাস্তবিক রামমোহন সেই দিন হইতে কায়মনোপ্রাণে লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করিল। এ বয়স পর্য্যন্ত লেখা পড়া শিখিবার আবশ্যকত তাহার কিছুমাত্র বোধ হয় নাই, সেদিন তাহার আবশ্যকতা বড় অনুভব করিয়াছিল। খড়ি দিয়া, ইট পাথরের টুকরা দিয়া ঘরের মেঝে, দেয়াল, সিঁড়ি, রোয়াক —সকল স্থানে অদ্ভুত আকারের "৴৭" "ক" "খ"তে বাড়ী চিত্র বিচিত্র করিয়া তুলিয়াছিল। পঙ্কের কাজকরা সুন্দর দেয়ালে এইরূপ উৎকট অদ্ভুত চিত্রকার্য্য দেখিয়া হেমেন্দ্র অবশেষে রামমোহনের জন্য কলাপাতা, তালপাতা ও কালি কলমের জোগাড় করিয়া দিয়াছিল। কলাপাতায় লেখা রামমোহনের চলিল না, কলমের ভর কলাপাতায় সহিল না। জিভ দিয়া ওষ্ঠ চাটিতে চাটিতে রামমোহন

যখন অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তালপাতায় লিখিত, তখন এমন প্রখর শব্দ হইত যে, সেশব্দে রামমোহন নিজেই লজ্জিত হইত। আমরা শুনিয়াছি যে, রামমোহন কোন কালেও লেখা পড়ায় বিশেষ কোন রূপ উন্নতি করিতে পারে নাই। আট হাত লম্বা বাঁশের লাঠি তাহার সম্পূর্ণ বশ ছিল, কিন্তু আট আঙ্গুল দীর্ঘ কলম সে বশ করিতে পারে নাই। খরধার তলোয়ার রামদা রামমোহন ওস্তাদি কায়দায় ভাঁজিতে পারিত, কিন্তু গুরুর অসাক্ষাতে এবং বিনা উপদেশে একদিন একটা ওয়াস্তি কলম কাটিতে যাইয়া ছুরিতে আঙ্গুল কাটিয়া একটা রক্তারক্তি করিয়া ফেলিয়াছিল!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার পর খাঁসাহেব হেমেন্দ্রকে ডাকাইয়া বলিলেন;—

"আজ বৃদ্ধ নবাব নাজিমের দরবারে গিয়াছিলাম।"

"তাহা শুনিয়াছি।"

"তুমি কখনো হুগলী দেখিয়াছ?"

"না,—সহরের মধ্যে শুধু জাহাঙ্গীরনগরই আমার পরিচিত।"

"যদি প্রয়োজন হয়, তবে হুগলী যাইতে পার?"

"আপনি আদেশ করিলে আমি এখনি প্রস্তুত।"

"আমি ছ'মাস পূর্ব্বেই জাহাঙ্গীরনগর ছাড়িয়া আসিতাম, কোন বিশেষ কার্য্যে নবাব নাজিমের আদেশে এ ছ'মাস তথাতে ছিলাম। তাহার বিবরণ নবাবের নিকট দাখীল করিয়াছি। বিশেষ জরুরী কাজ। নবাবজাদা সম্প্রতি হুগলী গিয়াছেন, তাঁহার নিকট এক পত্র পাঠাইতে হইবে। পত্র রওয়ানার ভার নবাব আমার প্রতি দিয়াছেন।

সাহসী, বিশ্বাসী এবং চতুর বুদ্ধিমান লোকের আবশ্যক। তুমি যাইতে পারিবে?—সরকারী কাজ, দায়ীত্ব গুরুতর, ভাবিয়া দেখ।"

"পারিব, আপনি আদেশ করুন।"

"গোপনীয় কাজ। তুমি নবাব সরকারের বর্ত্তমান অবস্থার কথা কিছুই জান না। নানা চক্রান্ত, নানা ষড়যন্ত্র। পদস্থ এমন লোকও অনেক যুটিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান কাজে সরকারী কোন কার্য্যকারক প্রেরিত হইলেই অনুসন্ধান করিবে,—কি কাজ, কেন লোক যাইতেছে। সরকার সংস্পৃষ্ট কোন লোক রাজধানী ছাড়িলেই চারি দিকে অনুসন্ধান হয়—কেন গেল, কোথায় গেল। এখনো নবাব সরকারের সঙ্গে তোমার কোন সংস্রব নাই। তুমি কোথায়, কি কাজে যাইতেছ, তাহার অনুসন্ধান কেহ করিবে না; সেই জন্যই তোমাকে পাঠাইতে চাই। তুমি কাজ হাসীল করিয়া আসিতে পারিলে ভবিষ্যতে তোমার উপকার হইতে পারে।"

"প্রাণপণ করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিব।"

"নবাব নিজ দৌহিত্র মিরজা মহম্মদ খাঁকে নিজের উত্তরাধিকারী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; নোয়াজেস মহম্মদ খাঁ ইহাতে ভারি অসন্তুষ্ট। সমস্ত জাহাঙ্গীরনগর, ইশলামাবাদ, বাজুহায় এবং ঘোড়াঘাটের অধিকাংশে তাঁহার প্রবল প্রতাপ, নাওয়ারা মহালে তাঁহারই প্রভুত্ব। বৃদ্ধ নবাব বাঁচিয়া থাকিতে কোন প্রকাশ্য গোলযোগ হইবে না বটে, কিন্তু এখন হইতে গোপনে আয়োজন হইতেছে। জাহাঙ্গীরনগরের নায়েব নাজিমের নিকাশ বহুকাল হইতে হয় নাই। পেস্কার রাজবল্লভ রাজা খেতাব লইয়াছে এবং প্রকাশ যে, সরকারী তহবিল তছরূপ করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে; নায়েব নাজিমের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ফিরিঙ্গীদের সহিত নাকি পরামর্শ চালাইতেছে। এদিকে নবাব এতদিন বর্গীদমনে নিযুক্ত থাকায় রাজ্যের আভ্যন্তরিক অনেক গোলযোগ

মনোযোগ দিবার অবকাশ পান নাই। নবাব বৃদ্ধ হইয়াছেন, আর বেশি দিন যে বাঁচিবেন, তাহার সম্ভাবনা কি?—তাই তাড়াতাড়ি ভবিষ্যতের একটা শৃঙ্খলা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। তুমি পত্রবাহক, কিন্তু রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা তুমি কিছুই জান না, তাই তোমাকে কিছু কিছু জানাইতেছি। নিজের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের জন্য বাহির হইয়াছ, রাজ্যমধ্যে যে ভয়ানক আন্দোলন চলিতেছে, যে বিপুল পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিও। তুমি সাহসী ও বুদ্ধিমান, চারিদিক দেখিয়া চলিও; চতুর এবং সাহসী লোকের এ-ই সময়।"

রাজ্যের অবস্থা যে হেমেন্দ্র একেবারে কিছুই জানিত না, তাহা নহে। ঢাকা অবস্থানকালে সে অনেক বিষয় অবগত হইয়াছিল। তবে, খাঁসাহেবের মুখে অনেক কথা শুনিল। রাজ্যের, নবাব সরকারের আভ্যন্তরিক অনেক অবস্থা বুঝিতে পারিল।

কাশেমআলি বলিলেন;—"হুগলী যাইবে?"

"যাইব।"

"তুমি যে স্বীকার হইবে তাহা আমি জানি; জানি বলিয়াই নবাব নাজিম যখন উপযুক্ত বিশ্বাসী লোক দ্বারা এই জরুরী সংবাদ হুগলী পাঠাইবার আদেশ আজ আমার প্রতি দেন, তখন তোমার কথা মনে করিয়াই আমি তাহাতে স্বীকার হইয়াছি। পত্রে বিশ্বাসী পত্রবাহক বলিয়া তোমার নাম উল্লেখ আছে। এ সুযোগ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; তোমার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে।

"আপনার অনুগ্রহ।"

"ঈশ্বরের অনুগ্রহ।—মহম্মদ ইয়ার বেগ হুগলীর ফৌজদার, তাঁহার নিকট পৃথক পত্র দিব। তিনি তোমাকে উপদেশ দিবেন, এবং নবাবজাদার দরবারে উপস্থিত করিবেন। আজ রাত্রিতেই যাত্রা করিতে হইবে, ঘাটে নৌকা প্রস্তুত। বাসায় যাও, সব ঠিক ঠাক কর গিয়া।

তোমাকে সময় মত ডাকাইব, আমার সঙ্গে শেষ দেখা করিয়া নৌকায় উঠিবে।”

হেমেন্দ্রলাল তথা হইতে বাসায় গেল। রামমোহন প্রতীক্ষা করিতেছিল। হেমেন্দ্রের গম্ভীর জ্যোতিষ্মান চক্ষু, দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখ দেখিয়া রামমোহন জিজ্ঞাসা করিল ;—

“কি হইয়াছে, দাদাবাবু ?”

হেমেন্দ্র বলিল ; “সুখবর।”

“জয়নগরের পত্র পাইয়াছ ?—খোকা কেমন আছে, দাদাবাবু ?”

খোকাবাবু, মাতা, স্ত্রী, জেঠা মহাশয়, ঘর বাড়ীর কথা হেমেন্দ্রের মনে নিরন্তর জাগিত, কিন্তু ঠিক সেই সময় সে সকল কথা তাহার মনে ছিল না; তাহার মন ভবিষ্যতের অর্দ্ধমুক্ত সুদূর দ্বারের দিকে বিনিবিষ্ট ছিল, রামমোহনের প্রশ্নে তাহার কল্পনাস্রোত থামিয়া গেল।

“না, রামমোহন, বাড়ীর কোন সংবাদ পাই নাই। এত শীঘ্র পাইবার আশাও করি নাই। সব ঠিক ঠাক কর্, আজ রাত্রিতেই আমাদিগকে দূরে যাত্রা করিতে হইবে।”

“আজ রাত্রিতেই ? দূরে !—কেন ?”

“সে অনেক কথা, পরে বলিব। ফিরিয়া আসিতে কুড়ি দিন হইবে। হুগলী যাইতে হইবে। আমরা যে হুগলী যাইতেছি তাহা কাহাকেও বলিবি না।”

রামমোহন তখন সমস্ত আয়োজন করিতে আরম্ভ করিল।

রাত্রি প্রায় এক প্রহর অন্তে খাঁসাহেব হেমেন্দ্রকে ডাকাইলেন। অন্দর মহলের প্রথম কক্ষে খাঁসাহেব অপেক্ষা করিতেছিলেন, সরিফন বেগম এবং সুরত-উন্নিসাও সেখানে ছিলেন। হেমেন্দ্র প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, সেলাম করিয়া বসিল। দরবারে কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয়, কি প্রকারে হুজুরে পত্র দাখিল করিতে হয়, খাঁসাহেব অনেক

বিষয়ে উপদেশ দিলেন। পথে ব্যয়ের জন্য উপযুক্ত অর্থ দিলেন। এক খানি পত্র হেমেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন ;—

"এই পত্র মহম্মদ ইয়ারবেগ ফৌজদার সাহেবকে দিবে, ইহাতে আমি তোমার পরিচয় এবং উদ্দেশ্য লিখিয়া দিলাম।"

তখন অতি সাবধানে বাক্স হইতে আর একখানি পত্র খাঁসাহেব বাহির করিলেন। সে পত্রের খাম বহুমূল্য কিংখাবে জড়ান, তাহাতে স্বয়ং নবাব নাজিমের খাস মোহর অঙ্কিত ছিল। পত্র হেমেন্দ্রের হাতে দিয়া বলিলেন ;—

"খাস দরবারে এই পত্র নবাবজাদার হুজুরে দাখিল করিবে। এ পত্র কাহাকেও দেখাইবে না, ফৌজদার সাহেবকেও দেখাইবে না। পত্র যে তোমার নিকটে আছে তাহা শুধু ফৌজদার সাহেব ব্যতীত আর কাহাকেও জানাইবে না। শত বিপদে এ পত্র হস্তান্তর করিবে না ; পথে ঝড় বৃষ্টি, চোর ডাকাত, ঠগ ফিরিঙ্গী নানা উৎপাত বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে—প্রাণপণ করিয়া পত্র রক্ষা করিবে।"

হেমেন্দ্র অতি সাবধানে পত্রখানি গ্রহণ করিল। তখন হেমেন্দ্র বিদায় চাহিল। খাঁসাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বেগম সরিফন এবং সুরত বিবিও দাঁড়াইলেন, খাঁসাহেব বলিলেন ;—

"যাও, হেমেন্দ্র ; কার্য্যোদ্ধার করিয়া ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে নিরাপদে শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও। 'অনুগ্রহ' করিয়া এ কার্য্যের ভার তোমাকে দি নাই। যে ব্যক্তি আমার মান ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, যাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছি, সে 'অনুগ্রহের' পাত্র নহে। স্নেহ মমতায় সে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সুখ সমৃদ্ধি উন্নতি যাহাতে হয়, তাহা আমার কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি, আমার কন্যা, আমরা সকলে তাহার কাছে চির ঋণী। যাও, বাবা, আশীর্ব্বাদ করি, কার্য্য সফল করিয়া সত্বর ফিরিও।"

সরিফন বেগম বলিলেন ;—

"পথে ঘাটে সাবধান থাকিও ; ঈশ্বর তোমাকে সুস্থ শরীরে ফিরাইয়া আনিবেন।"

সুরত-উন্নিসা কথা বলিল না, মস্তক অবনত করিয়া ভাইসাহেবকে শেলাম জানাইল। হেমেন্দ্র সকলকে শেলাম করিয়া বিদায় হইল।

বড় গ্রীষ্ম। উন্মুক্ত গবাক্ষপথে ফুল্লকুসুমসুবাসিত, ভাগীরথীর শীকরস্পর্শশীতল মৃদু বায়ু সুরতউন্নিসার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতেছিল। সেরাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে সুরত-উন্নিসা সেই মুক্ত জানালার নিকটে কেদারায় বসিয়া সেই সুরভিত শীতল বায়ু সেবন করিতেছিল, বাঁদী পিয়ার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাহার স্বচ্ছন্দ শয়নোপযোগী কেশবিন্যাস করিতেছিল। পিয়ার জিজ্ঞাসা করিল ;—

"এত রাত্রিতে বাবুসাহেব আজ কোথায় যাইতেছেন ?"

"ভাইসাহেব সরকারী কার্য্যে হুগলী যাইতেছেন।"

"হুগলী অনেক দূরের পথ ; এখন নৌকাপথে নানা ভয়, ঝড় তুফান প্রতিদিন হইতেছে।"

"ভাইসাহেব নৌকা চালনে খুব দক্ষ।"

"দস্যু ডাকাতের বড় ভয় !"

"লাঠি হাতে থাকিলে দস্যু ডাকাতে তাঁহার কি করিবে ? এখানে আসিতে পথে আমাদের নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছিল, মনে আছে তো ? ভাইসাহেব কেমন সাহসে আমাদের উদ্ধার করিয়া ছিলেন !"

"মনে নাই ! বাবু সাহেব না থাকিলে সেদিন আমাদের যে কি উপায় হইত, ঈশ্বর জানেন।"

"আচ্ছা, পিয়ার, সেদিন ডাকাতেরা আমাদের নৌকার কোন জিনিশ পত্র সরায় নাই। কেবল আমাকে আর তোকে সরাইবার জোগাড় করিয়াছিল। উহারা কি রকম ডাকাত ?"

পিয়ার বড় গোলযোগে পড়িল, কিন্তু তাহার উপস্থিত-বুদ্ধি খুব ছিল, উত্তর করিল ;—

"ভয়ানক ডাকাত। উহারা বোধহয় জানিত যে, আমাদের সঙ্গে নৌকায় টাকাকড়ি, আসবাবপত্র অধিক ছিল না, তাই তোমাকে লইয়া যাইতেছিল।"

"আমাকে নিয়া তাহাদের কি লাভ হইত ?"

"তুমি খাঁসাহেবের একমাত্র সন্তান ; বোধহয় তোমার পরিবর্ত্তে খাঁসাহেবের নিকট হইতে বহু অর্থ লইতে পারিবে, ডাকাতেরা এই লোভ করিয়াছিল।"

"তা হবে। সেদিন যে ডিঙ্গী নৌকায় ডাকাতেরা তোকে আর আমাকে লইয়া যাইতেছিল, তাহার মধ্যে একজন স্ত্রীলোকও ছিল !"

"হাঁ, ছিল ; সেও ডাকাতের লোক !"

"স্ত্রীলোকও ডাকাতি করে !"

পিয়ার এ সুযোগ ছাড়িল না। একটুকু আমোদের অবতারণা করিয়া সেরাত্রিতে সেই নৌকায় পান্নার উপস্থিতি ও উদ্দেশ্যের কথা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিল। বলিল ;—

"করিবে না কেন ?—মেয়ে ডাকাত বড় ভয়ঙ্কর ডাকাত। কটাক্ষে কত জবরদস্ত যোয়ানের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া নেয়, অথচ গায়ে হাত পর্য্যন্ত দেয় না !"

সুরতবিবির দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া তখন পিয়ার গাহিল ;—

(ঝিঝিট—মধ্যমান)

কো কহত রে মিঠি তেরি দো নয়না ?
ছুটত, লাগত কিয়ে তীখণ বাণা !
লাখ লাখ মুল বিস্‌কো,

ছুনিয়ামে মিলানা মুস্কিল,—
বল্‌কে চোরায়লি য়্যায়সা
পিয়াকা দেল, তু সেয়ানা।

সুরত। "তা অসম্ভব বলিতে পারি না। সাদেক এত বড় যোয়ান লাঠিয়াল, শুনিয়াছি, তুই নাকি তার যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া নিয়াছিস্‌?"

পিয়ার দেখিল যে, প্রবর্ত্তিত আমোদের সূক্ষ্ম শরাভিঘাতটুকু তাহার নিজেরই সহিতে হইল! উপায় নাই, উত্তর করিল;—

"মিথ্যা কথা, কোথায় যেন তাহার সামান্য যথা সর্ব্বস্বটুকু হারাইয়া ফেলিয়াছে, কে জানে? মিছামিছি আমার নাম দেয়! আমি কি চোর, না ডাকাত?"

"তুই চোর, তুই ডাকাত, তুই সব!"

হাত বাড়াইয়া সুরত পিয়ারের অংশদেশ ধরিয়া তাহার মুখ নিজের মুখের কাছে আনিল এবং চকিতে তাহার কপোল দেশে চুম্বন করিয়া বলিল;—

তুই পরম সাধু; তার যা কিছু চুরি করিয়াছিস্‌, অবশ্যই তা সুদে আসলে ফিরাইয়া দিবি?"

"আমি কাহারও কিছু চুরি করি নাই, মিছামিছি আমার দুর্নাম। ঘরের জিনিশ দুর্নামের ভয়ে পরকে দিব?"

"কেন এ দুর্নাম সহিতেছিস্‌?—তোর যদি কিছু থাকে, তাকে দিয়ে ফেল্‌ না কেন? খয়রাতে লোকের পুণ্যও হয়, খোসনামও হয়!"

যুদ্ধে পিয়ারের হা'র হইল।

ভাগীরথীর ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গের দিকে ক্ষণকাল মাত্র চাহিয়াই পিয়ার আবেগের সহিত বলিয়া উঠিল;—

"সুরতবিবি, ঐ বুঝি বাবুসাহেবের নৌকা ঘাট ছাড়িল।"

"কৈ?—কোথায়?"

তখন উভয়ে সেই গবাক্ষপথে গ্রীবা বাড়াইয়া ভাগীরথীর দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল। রাত্রি তখন দেড় প্রহর হইয়াছে, বড় জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নালোকে সুরত ও পিয়ার দেখিতে পাইল, ফুল বাগানের ঘাট হইতে এক খানি ডিঙ্গী নৌকা ভাগীরথীর প্রবল স্রোতে ভাঁটা বাহিয়া চলিল। সেই নৌকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া সুরত-উন্নিসা বলিল ;—

"পিয়ার, এখন ঝড় তুফানের দিন, ভাইসাহেবের নৌকা বড়ই ছোট।"

"কোন ভয় নাই, তুফানের সূচনা হইলে ছোট নৌকা তাড়াতাড়ি তীরে বাঁধা যায়।"

"তুই বলিয়াছিস্, নৌকা পথে বড় চোর ডাকাতের ভয়।"

পিয়ার। "লাঠির এক আঘাতে বাবুসাহেব দশজন চোর ডাকাতকে তাড়াইতে পারেন।"

হেমেন্দ্রের নৌকা অদৃশ্য হইল। তখন সুরত শয্যায় শয়ন করিতে গেল। শয়ন করিয়া কার্য্যোদ্ধারের পর নিরাপদে ভাই-সাহেবের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য বার বার ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল। জানালা বন্ধ করিয়া পিয়ারও সেই কক্ষে নিজের শয্যায় শয়ন করিল। সে ভাবিল, সংসার কি বিচিত্র!—চুরি করা দূরে থাকুক, না ছুঁইয়া কতজন দুর্নামের ভাগী হয় ; আবার এমন লোকও কি নাই, যাহারা অযাচিত ভাবে নিজের সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া ফেলে, অথচ নিজে তাহা বুঝিতে পারে না! পিয়ার অন্ধকারে ঢিল ছুড়িল ; মৃদু মধুস্বরে গাহিল ;—

(খাম্বাজ—কাওয়ালী)

পরদেশীয়া পিয়া মেরি জান্।
ঘড়ি ঘড়ি আঁখিয়া
বাট্ পর ছুটত রে,
আওত ফিরি কিয়ে জান্!

ঢিল লাগিল কি না বুঝা গেল না। সুরত-উন্নিসা তখন চিন্তায় মগ্ন; পিয়ারের সুমধুর গীতিধ্বনি তাহার চিন্তাস্রোতকে মন্দমধুর করিয়া তুলিল মাত্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভাগীরথীর উপরেই হুগলীর নবাবী কেল্লা। কেল্লার এক পার্শ্বের প্রাচীর বক্রভাবাপন্ন নদী-তীরের উপর হইতেই উঠিয়াছে। প্রাচীরের উপর বুরুজের সারি, তাহাতে তোপ বসান, ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত সেই সকল তোপের লক্ষ্য ছিল। প্রত্যেক বুরুজের চূড়ায় নিশান, প্রত্যেক গুম্বেজের চূড়ায় নিশান; বহুদূর হইতে কেল্লা মধ্যস্থ দরবার গৃহের উচ্চ চূড়ার উপর অতি বিস্তৃত দীর্ঘ নিজামসাহী নিশান বায়ুস্রোতে সঞ্চালিত হইয়া দুর্গ মধ্যে নবাবজাদার অবস্থিতি সূচিত করিতেছিল। দুর্গদ্বারের উপরিস্থ বিচিত্র পতাকাপরিশোভিত উচ্চ নহবতখানা হইতে প্রথম প্রহরের রৌসনচৌকীর মধুর গম্ভীর শব্দ ভাগীরথীর বহুদূর পর্য্যন্ত নিনাদিত পুলকিত করিতেছিল।

চারিদিকে ব্যস্ততার লক্ষণ। সিপাহী সান্ত্রী চারিদিকে ছুটিতেছে; রাজা জমিদার, আমলা কারপরদাজ, বক্সী বরকন্দাজ, চোপদার তরপদার, হিন্দু মুসলমান, আরমানী ফিরিঙ্গী কত লোক যাতায়াত করিতেছে। ভাগীরথীর তীরে শত শত নৌকা; নাওয়ারা বিভাগের সুসজ্জিত রণতরি হইতে বৃহৎ ময়ূরপঙ্খী, ঘোড়দৌড়, পলোয়াড়, পানশী, ছিপ, কোষ ক্ষুদ্র ডিঙ্গী পর্য্যন্ত কত নৌকা তীরে বাঁধা রহিয়াছে, ভাগীরথীর স্রোত বাহিয়া অগ্রসর হইতেছে, ভাঁটা ছাড়িয়া যাইতেছে। অতি অল্পসংখ্যক নৌকাই কেল্লা সংলগ্ন তীরভূমিতে বাঁধা রহিয়াছে। তীরস্থ সান্ত্রী বহু নৌকা তফাত করিয়া দিতেছে।

এমন সময় একখানা ডিঙ্গী নৌকা দাঁড় বাহিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নৌকা বাঁধিবার সুবিধামত স্থান খুঁজিয়া না পাইয়া ডিঙ্গীখানি আরও অগ্রসর হইল। তীরস্থ সান্ত্রী নিষেধ করিল; ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি, নদীতীরে বড় গোলযোগ—মাঝি বুঝি সে নিষেধ শুনিতে পাইল না; ডিঙ্গী আরও অগ্রসর হইল। সান্ত্রী তখন বাঙ্গালা ফারসী মিশ্রিত বিজাতীয় গালি দিতে আরম্ভ করিল। ডিঙ্গীর অগ্রভাগের দিকে রামমোহন বসিয়া ছিল; গালি শুনিয়া রামমোহন বলিল;—

"রাগ কর কেন, বাপু, সহজে বলিলেই তো হয়!"

সান্ত্রী। "জবাব দেতা রে, শা—কাফেরকা বাচ্চা?"

"ম্লেচ্ছের মুখে ভাল কথা কোথা থেকে আস্‌বে?"

"পাকড়ো শালাকো!"

তখন ভারি গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। ডিঙ্গী তটে লাগিয়াছিল। দুই তিন জন লোক লাফাইয়া ডিঙ্গীতে উঠিল। হেমেন্দ্রলাল পোষাক পরিতেছিল, বাহির হইল। সান্ত্রীর লোকেরা রামমোহনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার দুই হাত একত্র করিয়া বাঁধিবার চেষ্টা করিল।

হেমেন্দ্র। "কি হইয়াছে, কেন ইহাকে বাঁধিতেছ ?"

সান্ত্রী। "তুমি কে ?—উসকো ভি পাকড়ো।"

হেমেন্দ্র। "সান্ত্রী সাহেব, আমি তো কোন অপরাধ করি নাই; ব্যাপারটা কি, শুনিতে পাই কি ?"

সান্ত্রী। "কোতোয়াল সাহেবের মুখে শুনিবে।"

যাহারা রামমোহনকে ধরিয়াছিল, অনেক চেষ্টাতেও তাহারা তাহার দুই হাত একত্র করিয়া বাঁধিতে পারিতেছিল না। বলিষ্ঠকায় রামমোহন তিন জন লোকের সমবেত চেষ্টাই ব্যর্থ করিতেছিল। সে বলিল;—

"দাদাবাবু, এই তিন জন লোক আমাকে বাঁধিবে! বল তো এক লাথিতে তিন জনকেই মাগঙ্গা-সই করি।"

"চুপ্, ইহারা ফৌজদারের লোক, তিন জনই তিন শত। বাধা দিয়া লাভ নাই।—সান্ত্রী সাহেব, এব্যক্তি কি অপরাধ করিয়াছে ?"

"মানা না শুনিয়া কেল্লার মুখে নৌকা আনিয়াছে, গালাগালি দিয়াছে।"

রামমোহন বলিল;—"গালি কখন দিলাম, সান্ত্রীসাহেব ?"

সান্ত্রী। "চুপ্ রও, হারামজাদা।"

রামমোহনের দুই হাত তখন বাঁধা পড়িয়াছে; তাহার চক্ষু দিয়া অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল। হেমেন্দ্র কি যেন বলিতেছিল, সান্ত্রী তাহা শুনিল না।

"দুনো আদমীকো লে চলো, ফাটকমে লে চলো।" বলিয়া সান্ত্রী সাহেব অগ্রসর হইলেন। যে তিন জন লোকে রামমোহনের হাত বাঁধিয়াছিল, তাহারা রামমোহনকে তীরে নামাইল। তাহারা কাফ্‌রী, বাঙ্গালা কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিল না।

রাম। "দাদাবাবু, গঙ্গা বেশী চওড়া নয়, এক ডুবে—"

হেমেন্দ্র। "পাগল হইয়াছিস্ ?—সান্ত্রী সাহেবের আদেশ। চল্, ইহারা যেখানে লইয়া যাইবে, সেই খানেই যাইব।"

রামমোহন আর কোন কথা বলিল না। প্রহরীরা রামমোহন এবং হেমেন্দ্রকে লইয়া সান্ত্রীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেল্লার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহারা হেমেন্দ্রের চেহারা দেখিয়া সে যে-ই হউক না কেন, বিশিষ্ট লোক বটে, বুঝিতে পারিল; বিশেষতঃ সে কোন অপরাধ করে নাই, সুতরাং তাহারা হেমেন্দ্রকে বাঁধিল না, সঙ্গে লইয়া চলিল। কেল্লার ভিতর প্রবেশ করিয়া রামমোহন পুনরায় বলিল;—

"দাদাবাবু, এখনো দেখ,—দুই জন মানুষ আর তিনটা তাল পাতার সেপাই!"

হেমেন্দ্র। "কাজ ভালই হইয়াছে, রামমোহন; আমরা এখানে কাহাকেও চিনি না, ফৌজদার সাহেবের নিকটে পৌঁছিতে কত কষ্ট হইত। এখন আর সে চিন্তা নাই, ইহারাই আমাদিগকে লইয়া যাইবে।"

সম্মুখ হইতে সান্ত্রী ধমকাইয়া উঠিল;—

"চুপ্ রও, বদমায়েস।"

কেল্লার সে অংশে তখন বড় ভিড়। সরকারী কোন প্রধান অমাত্য কোথাও যাইতেছিলেন। চারিদিক হইতে লোক শেলাম অভিবাদন করিতে লাগিল। প্রহরী, সীপাহী, চোপদার, ছাতিবরদার, আসা-সোটা বল্লমদার অনেক লোক সঙ্গে যাইতেছিল। চারিদিক হইতে "ফৌজদার সাহেব!" "ফৌজদার সাহেব!" অনুচ্চ শব্দ হইতে লাগিল। হেমেন্দ্র এবং প্রহরীবেষ্টিত রামমোহনকে রাস্তার এক পার্শে দাঁড়াইতে হইল। নিকট দিয়া যাইবার সময় পালকীস্থিত ফৌজদার সাহেব বদ্ধহস্ত রামমোহনকে দেখিতে পাইয়া সান্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কে এ,—কি করিয়াছে?"

সান্ত্রী। "হুজুর, মানা না শুনিয়া কেল্লার ঘাটে নৌকা আনিয়াছিল।"

"জল্‌দী দারোগার হাওলা কর।"

ফৌজদার সাহেব চলিয়া গেলেন। সান্ত্রী হেমেন্দ্র ও রামমোহনকে কোতোয়ালীতে দারোগার নিকট লইয়া গেল। দারোগা সাহেব নূতন পদ পাইয়াছেন, তাঁহার শাসন প্রবল; বিশেষতঃ স্বয়ং নবাব-জাদা তখন কেল্লায় উপস্থিত, দারোগাসাহেবের কর্ত্তব্যপরায়ণতা আরও উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। রামমোহনকে দেখিয়াই বলিলেন;—

"কি হইয়াছে?"

সান্ত্রী। "কেল্লার ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াছিল, নিষেধ মানে নাই; গালাগালিও দিয়াছে।"

"ফাটকখানায় লইয়া যাও।"

প্রহরীরা রামমোহনকে সেঘর হইতে লইয়া গেল। সান্ত্রী হেমেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিল;—

"ইহাকে কি করিব?"

"কে এ?—তুমি কে?"

হেমেন্দ্র বলিল;—"আমি মুরসিদাবাদ হইতে আসিতেছি।"

"জাহান্নমে যাইবে?"

"আমার কোন অপরাধ নাই।"

"তুমি নৌকায় চড়নদার ছিলে, তুমি হুকুম দিয়াছিলে।"

"না, দারোগাসাহেব। আমি নৌকার মধ্যে ছিলাম, কিছুই জানি না।"

হেমেন্দ্রের সুচেহারা এবং তাহার ভদ্র বেশ দেখিয়া দারোগা সাহেব কিছু ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"কি কাজ তোমার?"

"ফৌজদারসাহেবের সঙ্গে দেখা করিব।"

"তুমি !—কি প্রয়োজন ?"

"বড় জরুরী কাজ।"

"দেখা হইবে না।"

"দেখা না হইলে সরকারী কার্য্যের ক্ষতি হইবে।"

"তা আমি জানি না।—ইহাকে মুনশীখানায় লইয়া যাও।"

সান্ত্রী অগ্রসর হইল। হেমেন্দ্র দেখিল, যে রকম বিচার, দারোগা সাহেবের জেম্মায় কতদিন থাকিতে হয় তাহার কিছুই ঠিক নাই। খাঁ সাহেব ফৌজদারের নিকট যে চিঠি দিয়াছেন, সেই চিঠির কথা দারোগাকে বলিলে হয় ত ফৌজদারের সঙ্গে শীঘ্রই দেখা হইতে পারে। অনেক বিবেচনার পর চিঠির বিষয় উল্লেখ করাই স্থির করিল। হেমেন্দ্র বলিল ;—"বড় জরুরী কাজ, মুরসিদাবাদ হইতে আসিয়াছি, আজই আমাকে ফৌজদার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। ফৌজদার সাহেবের নিকট চিঠি আনিয়াছি।"

"চিঠি ! ফৌজদার সাহেবের নিকট ? আচ্ছা, আমাকে দাও, আমি দাখিল করিব।"

হেমেন্দ্র অতি সাবধানে পোষাকের ভিতর হইতে চিঠি খানি বাহির করিল। দারোগাসাহেব হাত বাড়াইলেন, কিন্তু হেমেন্দ্র তাঁহার হাতে চিঠি দিল না। বাহিরাবরণ উন্মুক্ত করিয়া হেমেন্দ্র দেখাইল চিঠিখানি মূল্যবান রেসমসূত্রে বাঁধা, তাহাতে বৃহৎ মোহর অঙ্কিত। দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কাহার নিকট হইতে আসিতেছ ?"

"এ চিঠি অন্য কাহারও হাতে দেওয়া নিষিদ্ধ ; চিঠি কে দিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করা নিষিদ্ধ। আপনি আমার সঙ্গে প্রহরী দিন, আমি পালাইব না ; ফৌজদার সাহেবের নিকট চিঠি পৌঁছাইয়া দিয়াই ফিরিব। বিলম্বে কার্য্য নষ্ট হইলে অপরাধ আমার হইবে না।"

"তুমি কে ?—তোমার কি নাম ?"

"আমি এই পত্রবাহক ; সংপ্রতি এই টুকুর অধিক পরিচয় দিতে পারিব না ; অপরাধ মাফ করিবেন।"

হেমেন্দ্রের আকার প্রকার কথাবার্ত্তা এবং ব্যবহার দেখিয়া দারোগা সাহেব বড় চিন্তায় পড়িলেন। কয়জন গ্রেপ্তারী আসামী কোতোয়ালীতে আনীত হইয়া কথাবার্ত্তায় এমন ধৈর্য্য, এরূপ নির্ভীকতা প্রদর্শন করিয়া থাকে ?

দারোগা। "আচ্ছা, আমি এখনি ফৌজদার সাহেবের নিকট যাইব, আমার সঙ্গে চল।"

হেমেন্দ্র দারোগার সঙ্গে চলিল। ফৌজদার সাহেবের দরবার পাওয়া সহজ ব্যাপার নহে। হেমেন্দ্র দেখিল যে, দারোগার লোক তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করাতেই এ সুবিধা হইল।

বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার ভাবী নবাব নাজীম, স্বয়ং কেল্লায় উপস্থিত। বঙ্গের বহু ভূম্যধিকারী রাজা জমিদার নজরানা লইয়া হুগলীতে হাজীর হইয়াছেন। ফৌজদার সাহেব যাঁহার প্রতি সদয়, নবাবজাদার দরবারে উপস্থিতি তাঁহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ ; সুতরাং ফৌজদার সাহেবের দরবারে লোকের ত্রুটী ছিল না। প্রথম বেলার দরবার শেষ করিয়া ফৌজদার বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। বারান্দায় অনেক সম্ভ্রান্ত লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন। হেমেন্দ্রকে সেখানে অপেক্ষা করিতে এবং সঙ্গীয় সান্ত্রীকে সতর্ক থাকিতে ইঙ্গিত করিয়া দারোগাসাহেব ভিতরে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরেই বাহিরে আসিয়া হেমেন্দ্রকে ডাকিলেন ;—

"বাবুসাহেব, দরবার পাওয়া সহজ নহে ; অনেক কষ্টে তোমাকে লইয়া যাইবার অনুমতি পাইয়াছি।"

"আপনার বিশেষ অনুগ্রহ।"

দারোগা সাহেব মনে ভাবিয়াছিলেন, লোকটা রাজধানী হইতে আসিয়াছে, আপনা গোপন করিতেছে, সরকারী কাজ, ফৌজদারের নিকট গোপনীয় চিঠি লইয়া আসিয়াছে,—লোকটাকে হাতে রাখা মন্দ নহে। দারোগাসাহেব হেমেন্দ্রকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একটী অনতিবৃহৎ কামরায় দুইজন চোপদার দাঁড়াইয়াছিল, দারোগা সাহেব হেমেন্দ্রকে দেখাইয়া দিলে, একজন চোপদার তাহাকে লইয়া খাস কামরায় প্রবেশ করিল। অর্দ্ধ শয়নাবস্থায় তাকিয়া অবলম্বনে স্বচ্ছন্দে বসিয়া হুগলীর ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগ সাহেব তামাকু সেবন এবং বিশ্রাম করিতেছিলেন। অবনমিত মস্তকে শেলাম করিয়া হেমেন্দ্রলাল কাশেম আলিখাঁর চিঠি ফৌজদার সাহেবকে দিল। চিঠির মর্ম্ম হেমেন্দ্রলাল জানিত; খাঁসাহেব হেমেন্দ্রলালকে তাহা বলিয়াছিলেন—"বিশ্বস্ত পত্রবাহক শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায় নবাবজাদার নিকট যে গোপনীয় নেজামতি পত্র লইয়া যাইতেছেন, আপনি উপস্থিত থাকিয়া তাহা পেস করাইবেন।"—পত্র পাঠ করিয়া ইয়ারবেগ হেমেন্দ্রকে বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"তোমার নাম হেমেন্দ্রলাল রায়?"

"আজ্ঞা।"

"নেজামতি পত্র তোমার সঙ্গে আছে?"

"আছে।"

"কখন কেল্লায় পৌছিয়াছ?"

"আজ প্রাতে।"

"প্রাতে আসিয়াছ, দেখা করিতে এত বিলম্ব করিলে কেন?"

"ঘাটের প্রহরী আমাকে গ্রেপ্তার করিয়া কোতোয়ালিতে রাখিয়াছিল।"

"গ্রেপ্তার!—কেন?"

"আমার নৌকা কেল্লার ঘাটের নিকট আসিতেছিল বলিয়া।"

ফৌজদার সাহেব চোপদারকে ডাকিলেন, এক জন চোপদার উপস্থিত হইল।

"কোতোয়াল হাজীর?"

"হাজীর, হুজুর।"

"এখানে আসিতে বল।"

দারোগাসাহেব ঘরে প্রবেশ করিয়া হেমেন্দ্রলালকে উপবিষ্ট দেখিয়াই অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। ফৌজদার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"ইঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছ?"

"আমার অপরাধ নাই, হুজুর; ঘাটের সান্ত্রী ইঁহাকে লইয়া আসিয়াছে। আমি—"

"হুসিয়ার! নূতন কাজ পাইয়াছ, তাবেদার সামাল রাখিও। ভাল স্থান দেখিয়া ইঁহার নৌকা রাখার বন্দোবস্ত নিজে যাইয়া কর, নৌকার সমস্ত লোকের আহারের আয়োজন করিয়া দাও। কোন বিষয়ে ইঁহার যেন কোন অসুবিধা না হয়। বুঝিতে পারিয়াছ?"

"আজ্ঞা।"

"যাও, বাহিরে অপেক্ষা কর।"

রামমোহন তখনও যে কোতোয়ালীতে আবদ্ধ ছিল, হেমেন্দ্রলাল তাহা ফৌজদার সাহেবকে জানান আর আবশ্যক বিবেচনা করিল না। দারোগাসাহেব ফৌজদারকে এবং এবার হেমেন্দ্রলালকেও শেলাম করিয়া বাহিরে গেলেন।

ইয়ার। "খাঁসাহেব কবে জাহাঙ্গীরনগর হইতে আসিলেন?"

হেমেন্দ্র। "অতি অল্প দিন হইল।"

"তিনি কাবা সরিফে যাইবেন, শুনিয়াছিলাম।"

"যাওয়ার প্রস্তাব আছে।"

"তিনি যেরূপ ধার্ম্মিক লোক তাঁহার বাসনা অবশ্যই পূর্ণ হইবে।—তোমার এই তরুণ বয়স, এই জরুরি নেজামতি চিঠি পৌঁছানের ভার তোমার প্রতি কেমন করিয়া পড়িল?"

"খাঁসাহেবের অনুগ্রহে, তিনি আমার মুরুব্বি।"

"তোমার অদৃষ্ট ভাল, তাই এমন মুরুব্বি পাইয়াছ।—আচ্ছা, এখন নৌকায় যাও, আহারাদি করিয়া আমার এখানে আসিও। রাত্রির খাস দরবারে তোমাকে উপস্থিত করিব।"

হেমেন্দ্র শেলাম করিয়া বিদায় হইল। বলা বাহুল্য যে, রামমোহন অচিরেই কোতোয়ালী হইতে সসম্মানে মুক্তিলাভ করিল। হেমেন্দ্রের নৌকা কেল্লার ঘাটের খুব ভাল স্থানে, সান্ত্রী এবং প্রহরীর বিশেষ তত্ত্বাবধানে রাখার বন্দোবস্ত হইল, এবং দারোগাসাহেবের সাগ্রহ চেষ্টায় অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের আহারাদির অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হইল।

—o——

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবাবজাদার অপরাহ্নের আমদরবার দুদণ্ড বেলা থাকিতেই শেষ হইয়া গিয়াছে। ফৌজদার সাহেব হেমেন্দ্রলালকে সে দরবারে উপস্থিত করেন নাই।

এখন রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড। বৃহৎ প্রকোষ্ঠ; বৈঠখিরি, দেয়ালগির, বেল, ঝাড়ে বহুসংখ্যক আলো; সে আলোতে মেঝেয় পাতা পুরু গালিচার কামদার ফুলগুলি পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রতি বৈঠখিরি, বেল, ঝাড়, দেওয়ালগিরে ফুলের মালা দুলিতেছিল। ফুল

আতর গোলাবের গন্ধে গৃহ ভরপূর। প্রশস্ত উচ্চ মঞ্চে শলমা চুমকির কাজ করা বহুমূল্য মছনদ, তাহাতে হীরা মুক্তার কাজ করা তাকিয়া, তাকিয়ার পশ্চাতে কারু-কাজ করা হাতীর দাঁতের ঠেঁস। মছনদে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার ভাবী নবাব নাজিম মিরজা মহম্মদ খাঁ। পশ্চাতে এবং পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পাঞ্জাবরদার, খুশবুবরদার ছিলিম্‌চিওয়ালা, থিলিওয়ালা আরও কত পরিচারক। নবাবী খাসদরবারে প্রকাশ্য রাজকার্য্য বড় কিছু হইত না। বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের সঙ্গে গোপনীয় বিষয়ে আলোচনা, অথবা ইয়ার মোসাহেব অন্তরঙ্গ লোকের সহিত আমোদ প্রমোদ চলিত; কোন কোন দিন নাচ গান পান প্রসঙ্গে বিলাসের অবারিত তরঙ্গ দরবার গৃহ রঙ্গময় করিয়া তুলিত।

আজ প্রয়োজনীয় কাজই ছিল। ফৌজদারের ইঙ্গিতে একজন চোপদার পার্শ্বস্থ গৃহ হইতে হেমেন্দ্রলালকে ডাকিয়া আনিল। সেই উচ্চ মছনদের সম্মুখে গালিচার উপর উভয় জানু পাতিয়া বসিয়া ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া হেমেন্দ্রলাল শেলাম করিল। ফৌজদার মহম্মদ ইয়ারবেগ সাহেব কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন;—

"খোদাবন্দ, এই লোক রাজধানী হইতে চিঠি আনিয়াছে।"

"কোথায় চিঠি?"

হেমেন্দ্রলাল পরিহিত মেরজাইর সঙ্গে শেলাই করিয়া সে চিঠি অদৃশ্য রাখিয়াছিল; মেরজাইর সম্মুখ ভাগ ছিন্ন করিয়া ভিতর হইতে অতি যত্নে রক্ষিত নেজামতি চিঠি বাহির করিল। তখন কিরূপে তাহা নবাবজাদার হাতে পৌছাইবে হেমেন্দ্রকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয় ফৌজদার সাহেব স্বয়ং তাহার হাত হইতে চিঠি লইয়া নবাবজাদার হস্তে প্রদান করিলেন। নবাবজাদা চিঠির শিরোনাম এবং অঙ্কিত মোহর ভাল করিয়া দেখিলেন এবং চিঠি খানি নিজের মস্তকে স্পর্শ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে তাহার মুখে চিন্তা,

সন্দেহ এবং ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন ;—

"কুলিখাঁ জাহাঙ্গীরনগর ফিরে নাই ?"

"না, খোদাবন্দ।"

"কোথায় আছে ?"

"মুরসিদাবাদে—মতিঝিলের দরবারে।"

নবাবজাদার বিশাল চক্ষু আরক্ত হইয়া উঠিল ; বলিলেন ;—

"জাহাঙ্গীর নগরের কার্য্য কে চালায় ?"

"পেস্কার রাজবল্লভ।"

"কাগজাত প্রস্তুত ?"

ফৌজদার সাহেব হঠাৎ উত্তর দিতে পারিলেন না ; স্বীয় দেওয়ানের দিকে বক্র দৃষ্টি করিলেন। দেওয়ান নন্দকুমার রায় শেলাম করিয়া উত্তর করিলেন ;—

"শুনিয়াছি, নিকাস তলপ হয় নাই ; নায়েবনিজাম বাহাদুর নাকি পীড়িত।"

নবাবজাদা স্বীয় পরিচ্ছদের ভিতর হইতে গুপ্ত মন্তব্য-পুস্তক বাহির করিয়া স্বয়ং তাহার মধ্যে কি যেন লিখিয়া রাখিলেন। লিখিবার সময় ক্রোধে তাঁহার হাত কম্পিত হইল।

"পূর্ণিয়ায় লোক গিয়াছে ?"

"গত রাত্রিতে রওয়ানা হইয়া গিয়াছে।"

"পত্রবাহক পাটনা হইতে ফিরিয়াছে ?"

"দূত উপস্থিত আছে ?"

নবাব। (চিঠির প্রতি দৃষ্টি করিয়া) "বিদেশী কুঠিওয়ালা সকলেই হাজীর হইয়াছে ?"

"ফরাসীস্, ওলন্দাজ, দিনামার, আর্ম্মাণী হাজীর হইয়া নজরানা দিয়াছে।"

"ইংরেজ ?"

"এখনো পৌঁছে নাই, পুনরায় তলপ গিয়াছে।"

নবাবজাদার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল।

"উমিচাঁদের নিকট হইতে কোন সংবাদ আসিয়াছে ?"

"আসিয়াছে।—ইংরেজের কারপরদাজ আজই এখানে পৌঁছিবে।"

গুপ্ত মন্তব্য পত্রে আরও যেন কি লিখিত হইল। নবাবজাদার মুখে অন্তরের দারুণ সন্দেহ স্ফুট প্রকট হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় নেজামতি পত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন ;—

"আমি আর অধিক দিন বিলম্ব করিব না।—আগামী কল্যের দরবারে ইংরেজ দূতকে হাজীর করিও।—কাল ভোরে কলিকাতা লোক পাঠাইতে হইবে ; কাহাকে পাঠাইব ?"

ফৌজদার সাহেব বলিলেন,—"হুজুরের গোলামদিগের মধ্যে চতুর বিশ্বাসী লোকের অভাব নাই ; আদেশ করিলে এখনি লোক রওয়ানা হইবে।"

নবাবজাদা কিছুকাল ইতস্ততঃ করিয়া হেমেন্দ্রলালের দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—"তুমি যাইবে ; বিশেষ জরুরী কাজ।"

হেমেন্দ্রলাল মস্তক নত করিয়া শেলাম করিল।

অনেক পুরাতন কার্য্যক্ষম বিশ্বাসী লোক উপস্থিত থাকিতে অপরিচিতপ্রায় তরুণবয়স্ক হেমেন্দ্রলালের প্রতি নবাবজাদার অনুগ্রহ দেখিয়া অনেক বিস্মিত হইল। কিন্তু নবাবজাদা দেখিলেন, হেমেন্দ্রলাল স্বয়ং নবাব নিজামের প্রেরিত দূত ; বিশ্বাসী এবং কার্য্যক্ষম না হইলে সদর দরবার হইতে তাহার প্রতি কেমন করিয়া কার্য্যভার ন্যস্ত হইল ? হেমেন্দ্রের স্থিরপ্রতিজ্ঞ চক্ষু, বলিষ্ঠ দেহ এবং সুন্দর চেহারা দেখিয়াও নবাবজাদা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি তাহাকেই মনোনীত করিলেন। বলিলেন ;—

"তোমাকেই পাঠাইব। বাহিরে অপেক্ষা কর।"

হেমেন্দ্রলাল কুর্ণিশ করিয়া দরবার গৃহ হইতে বাহির হইল

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হুগলী হইতে রওয়ানা হইবার পর দিন অপরাহ্ণে হেমেন্দ্রলালের নৌকা মৌজে স্থতান্নুটীর উত্তর অংশে চিৎপুরের খালের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ নবাব সাহেবের অনুমতি লইয়া মহারাষ্ট্রীয় দিগের উৎপাত হইতে নিজেদের বাণিজ্যস্থান রক্ষার জন্য ইংরেজেরা একটী গড়খাই বা খাল খনন করিয়াছিলেন। উত্তরে চিৎপুরের নিকট ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া সহরের পূর্ব্বদিক দিয়া দক্ষিণে মৌজে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমানায় ভাগীরথী পর্য্যন্ত এই খাল খনন করিবার কথা হয়। তৎকালে দুর্নিবার মহারাষ্ট্রীয়গণ নিরন্তর লুণ্ঠন ব্যাপারে লিপ্ত ছিল। ইতি পূর্ব্বে তাহারা উড়িষ্যার বহুস্থান, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমান, রাজমহল প্রভৃতি বহু নগর ও পল্লী লুঠ করিয়া, টানার কেল্লা অধিকার করিয়া হুগলী নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে। ইংরেজগণ কলিকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মরক্ষার সুবিধার জন্য এই খাল খননে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু নবাবের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের সন্ধি হওয়াতে তাহারা এ অঞ্চল লুণ্ঠনে বিরত হয়; সুতরাং জানবাজার পর্য্যন্ত খোদিত হওয়ার পর অনাবশ্যক বিধায় প্রস্তাবিত খাল খনন কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই খাল বা নালাই প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র খাত। ভাগীরথীর জোয়ারে এই খাল জলে পরিপূর্ণ

থাকিত। সুতানুটীর উত্তরাংশে চিৎপুরের নিকট এই খালের মুখ ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল।

অপরাহ্ণে হেমেন্দ্রলালের নৌকা এই খালের মুখে পৌছিল। স্থান সম্পূর্ণ অপরিচিত; খুঁজিয়া অনুসন্ধান করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে হইবে; বিশেষতঃ সে আমলে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই যে সহরে দস্যু চোর বদমায়েসের অত্যন্ত প্রাচুর্ভাব আরম্ভ হইত, সেকথা হেমেন্দ্রলাল পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল; সুতরাং সেদিন আর নবাবজাদার পত্র লইয়া সহরে প্রবেশ করা তাহার নিকট সমীচীন বোধ হইল না। তীরে নামিয়া ইতস্ততঃ বেড়াইয়া লোক জনের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উমিচাঁদের বাড়ী, ইংরেজের কেল্লা, লালদীঘি ইত্যাদি স্থানের দিক্ নির্ণয় ও রাস্তা ঘাট সম্বন্ধে অনুসন্ধান লইয়া সেরাত্রি হেমেন্দ্রলাল নৌকাতেই যাপন করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রামমোহনকে সঙ্গে লইয়া হেমেন্দ্রলাল বণিক-রাজ উমিচাঁদের বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিল। খালের মুখের দক্ষিণ দিকে কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই বাগবাজারের উত্তর পূর্ব্বভাগে ইংরেজ-দের বারুদখানা; বর্ত্তমানে এই স্থান নিকারিপাড়া বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। এই রাস্তার পূর্ব্ব মুখ হইতে আর একটী বড় রাস্তার আরম্ভ; এই রাস্তাই বর্ত্তমান সারকিউলার রোড। বৃহৎ পল্লী শ্যামবাজার ডাহিনে রাখিয়া হেমেন্দ্রলাল মোহনবাগানে পৌছিল। মোহনবাগানের পশ্চিম দিয়াই মহারাষ্ট্র খাত। এই মোহনবাগানের দক্ষিণে হালসীর বাগান। হালসীর বাগানেই লক্ষপতি উমিচাঁদের বাসগৃহ ও বাগানবাড়ী। উত্তরকালে রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ-বল্লভ জাহাঙ্গীরনগর হইতে ধনরত্ন সহ পলায়ন করিয়া ইংরেজদের অনু-গ্রহে উমিচাঁদের গৃহেই আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা অব-অবরোধ সময়ে নবাব সিরাজউদ্দৌলা নন্দনবাগানে ছাউনি করিয়া

সমস্ত নন্দনবাগান, হাতীবাগান বিধ্বংশ করিয়া কৃষ্ণবল্লভের অনুসন্ধানে উমিচাঁদের গৃহ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন। নন্দনবাগান এবং হাতীবাগানের অধিকাংশ উমিচাঁদের বাড়ীর অন্তর্গত ছিল। বর্ত্তমান মোহনবাগান, নন্দনবাগান, হাতীবাগান, হোগোলকুঁড়ে, সিমুলিয়া প্রভৃতি অনেক স্থান তখন জঙ্গলময় ছিল। কোন কোন ভাগে লোকের বসতি ছিল; কোন কোন অংশে সহরের অনেক ধনী লোকের বাগান ও বাগানবাড়ী ছিল। রাস্তা ঘাট কাঁচা, জঙ্গলপূর্ণ, চারি দিক খানা ডোবায় পরিপূর্ণ।

আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ইংরেজের সঙ্গে উমিচাঁদের মনোমালিন্যের হেতু উপস্থিত হইয়াছিল। ইংরেজ বণিক ইতিপূর্ব্বে উমিচাঁদের সহযোগে দেশীয় বণিক ও কারিকরগণকে দাদন দিয়া ব্যবসা চালাইতেন। তাহাতে উমিচাঁদের বিশেষ লাভ হইত। শেষে উমিচাঁদের মধ্যবর্ত্তীতা পরিত্যাগ করিয়া ইংরেজ নিজেরাই স্বাধীন ভাবে এই দাদন কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। দেশীয় অনেক বণিক এবং কারিগর এইরূপে হাতছাড়া হওয়াতে উমিচাঁদের অনেক ক্ষতি হয়। প্রকাশ্যে কোন বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া তিনি মনে মনে ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধভাব পোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইংরেজের রীতি, নীতি, কার্য্য, ব্যবহার ও কূটমন্ত্রণা বিষয়ক নানা কথা সত্য মিথ্যায় রঞ্জিত করিয়া গোপনে গোপনে নবাব সরকারে জানাইয়া দরবারে প্রতিপত্তি লাভের চেষ্টা তাঁহার এক প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। নবাবজাদা মিরজা মহম্মদ খাঁ ইংরেজদিগকে স্নেহ চক্ষে দেখিতেন না। হুগলীতে পৌঁছিয়া ইহাঁদের সম্বন্ধে গোপনীয় সংবাদ আহরণ জন্যই তিনি উমিচাঁদের নিকট হেমেন্দ্রলালকে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ধনে মানে প্রতিপত্তিতে বণিকরাজ উমিচাঁদ সেকালে কলিকাতার মধ্যে একজন অগ্রগণ্য লোক ছিলেন। চারিদিকে প্রাচীর-আটা তাঁহার প্রকাণ্ড বাড়ী, সম্মুখে সিংহদ্বার। অস্ত্রধারী শত প্রহরী রক্ষিত

সে প্রকাণ্ড বাড়ী সে আমলে কলিতাকার মধ্যে একটী দেখিবার জিনিষ ছিল। উমিচাঁদের সহিত হেমেন্দ্রলালের দেখা হইল, অনেক কথাও হইল। সন্ধ্যার পর নবাবজাদার পত্রের উত্তর দিবেন বলিয়া উমিচাঁদ তখন হেমেন্দ্রলালকে বিদায় দিলেন।

অপরাহ্নে হেমেন্দ্রলাল ইংরেজের কেল্লা দেখিবার জন্য বাহির হইল। উমিচাঁদের প্রেরিত একজন লোক তাহার পথ প্রদর্শক হইল। বাগবাজার হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর ধারে ধারে নানা পল্লী হাট বাজার, নালা, নর্দ্দমা, জল জঙ্গল অতিক্রম করিয়া হেমেন্দ্রলাল কেল্লার বাগানে উপস্থিত হইল। ইংরেজেরা এই স্থানকে "The Green in the Fort" বলিতেন। কেল্লার বাগানের মধ্যেই "লালদিঘী" নামক অনতিবৃহৎ পুষ্করিণী এবং তাহার পশ্চিমেই ইংরেজের কেল্লা।

তখন বেলা অবসান হইয়া আসিতেছিল। সে আমলে এই পুষ্করিণীর তটস্থিত কমলা নেবুর নিকুঞ্জ এবং তাহার চারি পার্শ্বস্থ স্থানে সন্ধ্যাকালে দলে দলে ইংরেজ পুরুষগণ ভ্রমণ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিতেন। তখন এদেশে ইংরেজ রমণীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল কিন্তু তাঁহাদের আদর অত্যন্ত বেশী ছিল। :গাড়ী ঘোড়ার এত প্রাদুর্ভাব ছিল না। তবে অনেক সৌখীন সাহেব গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়াও সেখানে যাইতেন। রমণীরা প্রায়ই গাড়ীতে যাইতেন হেমেন্দ্রলাল ও রামমোহন বিস্মিত নেত্রে এই সকল দেখিতে দেখিতে কেল্লার সম্মুখ ভাগে উপস্থিত হইল।

হেমেন্দ্রলাল কেল্লার বহির্ভাগের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। পুরাতন বুরুজ যেখানে নূতন করিয়া মেরামত হইয়াছে, যেখানে নূতন বুরুজ তৈয়ার হইয়াছে, জীর্ণ দেয়াল মজমুত করিয়া গাঁথা হইয়াছে, ইংরেজ কিরূপে কেল্লার সংস্কার করিয়া দুরাক্রম্য করিবার চেষ্টা করিয়াছে, চরের নির্দ্দেশ মতে হেমেন্দ্রলাল তৎসমস্ত

মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। কিছু দূরে সেই খোলা মাঠের এক ধারে লোকের বড় জনতা দেখিয়া রামমোহনের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল, সে হেমেন্দ্রলালের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আস্তে আস্তে সেইখানে পৌছিল। চারিদিকে চক্রাকারে লোক দাঁড়াইয়া কি যেন দেখিতেছিল। রামমোহন একটু ধাক্কাধাক্কি করিয়া আশে পাশের লোক ঠেলিয়া রাস্তা করিয়া সম্মুখে উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কি, দেখিবার জন্য পাড়াগেঁয়ে রামমোহন হাঁ করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। ভিতরে ভিড় কিছুই না। এক পাশে দুই তিন জন সাহেব কেদারায় বসিয়া ছিল। আর দুই জন সাহেব পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল। কোন রঙ্গ তামাসা, বাজি ভেল্কি কিছুই না। রামমোহন নিরাশ হইয়া ফিরিবে, এমন সময় একজন ইংরেজ নিকটে আসিয়া হাতে ইশারা করিয়া বলিল ;—

"হাঁ, টুমি ঠিক আছে ; আও, টুম্‌কো হোগা।"

"টুঙ্কো হোগা!" কাহাকে বলে!—রামমোহন কিছুই বুঝিতে পারিল না, ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

সাহেব। "আল্‌বট্ হোগা ; You Look quite fit."

সাহেব রামমোহনের হাত ধরিল। রামমোহনের মনে কি ভাবের উদয় হইল, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু বিশেষ কোন অনিষ্টপাতের আশঙ্কা করিয়া সে জোরে ঝাঁকি মারিয়া হাত ছাড়াইয়া লইল।

সাহেব। "Ah! yes, you are quite fit. টুমি খুব Strong আছে। আও।"

রামমোহন পশ্চাৎদিকে চাহিয়া পলায়নের পথ দেখিয়া লইল।

সাহেব। "টোমার নাম কি আছে?"—রামমোহন নির্ব্বাক্। পার্শ্বস্থ এক জন লোক বলিল ;—"সাহেব তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিতেছে।"

রাম। "নাম! কেন?"

লোক। "তোমাকে বরকন্দাজ করিবে।"

রাম। "আমি বরকন্দাজ হইব কেন?"—রামমোহন দু পা পিছু হটিল। লোকটী সাহেবকে বুঝাইয়া বলিল, রামমোহন তামাসগির মাত্র, বরকন্দাজীর উমেদার নহে।

সাহেব।—"Not on umeder! The big d— fool! নিকাল্ যাও।"—চারিদিকে লোক হাসিয়া উঠিল। রামমোহন তখন আশে পাশের লোক ঠেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়! যেখানে হেমেন্দ্রলাল এবং উমিচাঁদের লোক দাঁড়াইয়া কেল্লা দেখিতেছিল, এক দৌড়ে সেখানে পৌঁছিয়া সন্থবিপন্মুক্ত রামমোহন অর্দ্ধাবরুদ্ধকণ্ঠে কহিল;—

"দাদাবাবু, ধরে'ছিল আর কি!"

হেমেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—কে ধ'রেছিল, কা'কে?"

"একটা ফিরিঙ্গী—আমাকে!"

"কেন? তুই কি করেছিলি?"

"তামাসা দেখিতে গিয়াছিলাম।"

অবস্থা শুনিয়া সঙ্গীয় চরটী হেমেন্দ্রলালকে বুঝাইয়া দিল যে, ইংরেজেরা প্রয়োজন হইলে মধ্যে মধ্যে বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় লোক বাছুনি করিয়া বরকন্দাজ-দলভুক্ত করিয়া থাকে। আজ সেইরূপ লোক বাছুনি হইতেছে। রামমোহনের চেহারা দেখিয়া বোধ হয় সাহেবদের পশন্দ হইয়া থাকিবে। তখন হেমেন্দ্রলাল হাসি রাখিতে পারিল না। রামমোহনও হাসিয়া ফেলিল।

ইংরেজের কেল্লা দেখা শেষ করিয়া হেমেন্দ্রলাল উমিচাঁদের গৃহে গেল। সেখানে অনেক কথা হইল। হুগলীতে নবাবজাদার দরবার শেষ করিয়া ইংরেজের কারপরদাজগণ কলিকাতায় ফিরিয়াছেন।

উমি। "শুনিতে পাই, নবাবজাদা ইংরেজদের প্রতি বড় প্রসন্ন নন?"

হেমেন্দ্র।" জনরব সেইরূপই বটে। কতদূর সত্য জানি না।"

উর্মি। "এদিকে হুগলী হইতে ইংরেজগণ ফিরিয়া আসার পর এখানে প্রচার হইয়াছে যে, নবাবজাদা ইহাদের উপর ভারি খুসী; হাতী শিরোপা দিয়া ইংরেজের সম্মান করিয়াছেন।"

হেমেন্দ্র। "তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? নবাব বাদসাহদের নজর কি ছোট হয়?"

উর্মি। "তা যথার্থ বটে। ইংরেজেরাও নাকি অনেক টাকা মূল্যের ভেট লইয়া গিয়াছিল। চতুরে চতুরে কারবার। বাহিরে বুঝিবার উপায় নাই।"

কথা অনেক হইল; তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। অবশেষে নবাবজাদার পত্রের এক লিখিত উত্তর হেমেন্দ্রলালের জেম্মা করিয়া তাহা সাবধানে হুজুরে উপস্থিত করিবার জন্য উপদেশ দিয়া উর্মিচাঁদ হেমেন্দ্রলালকে বিদায় দিলেন। হেমেন্দ্র সে রাত্রি সূতানুটীর ঘাটে নৌকায় বিশ্রাম করিয়া পরদিন হুগলী যাত্রা করিল। পরে উপযুক্ত সময়ে হুগলীতে পৌছিয়া উর্মিচাঁদের পত্র নবাবজাদার হুজুরে পেস্ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হুগলী হইতে ফিরিয়া হেমেন্দ্রলাল সমস্ত বৃত্তান্ত খাঁসাহেব কাশেম আলির নিকট নিবেদন করিল। খাঁসাহেব তাহার কার্য্য-কৌশলে প্রীত হইলেন। নিজামত সরকারে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি থাকার কথা ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি। হেমেন্দ্রলাল শিক্ষা সহবতে উপযুক্ত ছিল। কালে খাঁসাহেবের চেষ্টায় হেমেন্দ্রলাল কানুনগো সেরেস্তায় এক মুহুরীগিরি পদে নিযুক্ত হইল। সেই হইতে তাহার সাংসারিক উন্নতির সূচনা হইল। বাদসাহী আমলে বিষয়চতুর লোক নদীর তরঙ্গগণনা মাত্র কার্য্যের সনদ পাইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিত, এরূপ কিম্বদন্তী আছে; সে আমলে কানুনগো সেরেস্তার সঙ্গে কোন প্রকার কিঞ্চিৎ সংস্রব থাকিলে বুদ্ধিমান লোকের অর্থাগমের ত্রুটী হইত না। হেমেন্দ্রলালও ক্রমে বেশ উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে অনেক রাজা, জমিদার, বড় মানুষের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইতে লাগিল।

খাঁসাহেবের বাগান বাটীতে হেমেন্দ্রের আবাস নির্দ্দিষ্ট ছিল। অবস্থার সুপরিবর্ত্তনে হেমেন্দ্রলাল পৃথক বাড়ী করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও খাঁসাহেব তাহাতে শীঘ্র সম্মত হইলেন না। নানা প্রলোভন-পূর্ণ মুরুব্বিহীন প্রকাণ্ড সহর, নবীন বয়সে প্রথম অর্থোপার্জ্জন সময়ে হেমেন্দ্রলালকে একেবারে চক্ষুর অন্তরালে রাখা খাঁসাহেবের অভিমত হইল না। এখানে প্রতিদিন হেমেন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়; সুখ শান্তি আপদ বিপদ সকল অবস্থায় তাহার তত্ত্বাবধান চলে; সাদেক প্রতি-দিন তাহাকে দেখিয়া আসে; বৃদ্ধা বেগম এবং বিবি সুরত-উন্নিসা বাঁদী পিয়ারীকে দিয়া হেমেন্দ্রের তত্ত্ব করেন, সুখ সুবিধার বন্দোবস্ত

করেন; অন্যত্র দূরে ঘর বাড়ী করিলে কি আর তাহা হইবে? সুতরাং চাকরী পাইবার পরেও খাঁসাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে সেই বাটীতেই হেমেন্দ্রলাল বাস করিতে লাগিল।

অনেক চেষ্টা করিয়াও রামমোহন লেখা পড়ায় বিশেষ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, বিশেষতঃ মনের ভাব গুছাইয়া কালী কলমে চীনা কাগজে চিঠি পত্র লেখার উপযুক্ত কৃতিত্ব সে কোন দিন লাভ করিতে পারিল না। কিন্তু দেশে আরিন্দা যাইতেছে সংবাদ পাইলে, রামমোহন সেই দিনই হেমেন্দ্রলালকে দিয়া চিঠি লেখাইত এবং রায়মহাশয়ের কোন চিঠি দেশ হইতে আসিলে তাহার আদ্যোপান্ত হেমেন্দ্রলালকে দিয়া পড়াইয়া শুনিত। পত্র লিখিবার সময় এবং দেশ হইতে পত্র আগত হইলে তাহা পড়িবার সময় রামমোহন ঘর বাড়ী, বধূ খোকার সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ তুলিয়া হেমেন্দ্রের চিত্তকে আকুল করিয়া ফেলিত।

হেমেন্দ্রলাল জেঠা মহাশয়ের চিঠি পত্র মধ্যে মধ্যেই পাইত। প্রথম দুই এক পত্রে রায়মহাশয় হেমেন্দ্রকে দেশে ফিরিয়া যাইতে লিখিয়াছিলেন। মহামায়া এবং কল্যাণীর অবিরাম ক্রন্দনোচ্ছ্বাসে রায়মহাশয়ের শান্তি ছিল না। খোকা এবং বধূর দিকে চাহিতে সে অশান্তি আরও প্রবল হইয়া উঠিত। হেমেন্দ্র একবার বাড়ীতে আসুক, একবার সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া সকলকে বলিয়া কহিয়া বরং পুনরায় বিদেশে যাইবে; রায়মহাশয় এই ভাবে প্রথম প্রথম চিঠি লিখিয়াছিলেন; কিন্তু হেমেন্দ্রলাল সহস্র প্রণাম জানাইয়া মিনতি করিয়া জানাইয়াছে, অবস্থা ভাল না করিয়া সে বাড়ীতে ফিরিবে না। শেষে চাকরী পাইয়া যখন সুস্থ শরীরে হেমেন্দ্র বৈষয়িক ক্রমোন্নতির বিষয় জেঠা মহাশয়কে জানাইতে লাগিল, তখন মহামায়া এবং কল্যাণীর চিত্তও অনেকটা স্থির হইল; রায়মহাশয়ও অনেকটা শান্তি লাভ করিলেন।

চতুর্থ ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ হীরাঝিলের রাজপ্রাসাদে বড় ঘটা, বড় উৎসব। আসমুদ্র ভারতের রাজধানী দিল্লী, রূপসী রসিকা নর্ত্তকী গায়িকার আবাস ভূমি; সেই রাজধানীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরী সর্ব্ব প্রধান গায়িকা বাইজী ফয়েজ উন্নিসাকে লক্ষ টাকা বায়নায় মুরসিদাবাদে আনা হইয়াছে। আজ রাত্রিতে নবাবজাদার হীরাঝিলের ইন্দ্রালয়বিজয়ী রাজপ্রাসাদে বাইজীর নৃত্য গীতের মোহরা।

আত্মীয় অন্তরঙ্গ, পারিষদ মোসাহেব, আমীর ওমরাহ—যাঁহারা নবাব জাদার বিশেষ অনুগ্রহভাজন তাঁহারাই শুধু নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। সে মজলিশে অন্যের প্রবেশ সহজ নহে, তথাপি সন্ধ্যার প্রাক্কাল হইতে প্রাসাদদ্বারে জনসমাগমের নিতান্ত ক্রুটী ছিল না। নিমন্ত্রিত আমীর ওমরাহের অনুগ্রহে, আত্মীয় অন্তরঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তাসূত্রে, পারিষদ মোসাহেবগণের খাতির সূত্রে মজলিশে প্রবেশের সুযোগ ঘটিবে বলিয়া অনেকে সেখানে উপস্থিত হইতেছিল।

গীতবাদ্যপ্রিয় সৌখীন হিন্দু মুসলমান অনেকে সেই সর্ব্বদেশবিশ্রুত প্রসিদ্ধা সুন্দরীর কলকণ্ঠের গীত ধ্বনি শুনিবার জন্য কৌতুহলী হইয়াছিলেন, অনেকে পুরীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন, অনেকে বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। নবাবজাদার খাস মজলিশ; কাহার স্কন্ধে একের অধিক মস্তক যে, অপরিচিত অনিমন্ত্রিত হইয়াও শস্ত্রধারী সহস্র সান্ত্রী প্রহরী পরিরক্ষিত সে পুরীতে প্রবেশ করিতে সাহস করে?

ভাগীরথীর কূলে নবাবজাদার নূতন সহর মনশুরগঞ্জ। সহরের দক্ষিণ অংশে প্রসিদ্ধ হীরাঝিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে খোদিত অগাধ স্ফটিক স্বচ্ছজলে পরিপূর্ণ সেই রমণীয় জলাশয়ের চারি পার্শ্বে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর-গ্রথিত সোপানাবলী। সোপানাবলীর সীমান্তে স্বচ্ছন্দ ভ্রমনোপযোগী চত্বর, তাহার পর ফুলের বাগান, বাগানে শত সহস্র প্রফুল্ল ফুল, প্রতিফুলে অপরিমেয় সৌরভ। আজ চন্দ্রালোকদীপ্ত সরসীবক্ষে মৃদু বীচিভঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। গাছে গাছে স্বচ্ছন্দবিহারী বনবিহঙ্গের মধু ধ্বনি, কুঞ্জে কুঞ্জে পিঞ্জরাবদ্ধ উন্মত্ত শ্যামা পাপিয়া, দয়েল কোকিলের কলধ্বনি, ফুলে ফুলে সঞ্চরমান ভ্রমরকুলের গুঞ্জরবে সে দিব্য উদ্যানভূমি ঝঙ্কৃত হইতেছে।

উদ্যানের উত্তরেই নবাবজাদার রঙ্গমহল, হীরাঝিলের প্রমোদাবাস। পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীর প্রস্তরবদ্ধ ঘাট হইতে সদর প্রবেশপথ। প্রবেশ-দ্বারের উপরে নহবতখানা, সেখানে অষ্ট প্রহর সংজ্ঞাপক নেজানতি নহবত। প্রহরভেদে ললিত ভৈঁরো, কেদার হাম্বির, বেহাগ বাগেশ্রী, কালেংড়া পরজের পরিশুদ্ধ আলাপ বায়ুস্রোতে ভাগীরথীর পরপার পর্য্যন্ত মৃদু নিনাদিত করিত। প্রবেশদ্বার ছাড়াইয়া প্রশস্ত পথ, তাহার উভয় পার্শ্বে অতি দুর্ল্লভ, অতি সৌরভময়, অতি সৌন্দর্য্যময়, অতি যত্নে লালিত ফুল্লকুসুমদলপরিশোভী যূঁই যাতি বেল গোলাপ প্রভৃতি অনতিবৃহৎ গাছের সারী। তাহার পর ঝিলের সম্মুখ ভাগেই মর্ম্মর গ্রথিত সোপানাবলী, সোপানাবলী ছাড়াইয়াই বিস্তৃত সুশোভিত দ্বিতল দরবার গৃহ। আজ রাত্রিতে সেই দরবার গৃহে বাইজীর প্রথম মুজরা।

বৃহৎ, বিস্তৃত. বিচিত্রচিত্র দরবার গৃহ। তলভাগ নানাবর্ণের বহু-মূল্য প্রস্তরের সূক্ষ্ম কারুকাজ করা কত লতা পাতা ফুল-কাটা; তাহার উপর ইস্পাহানী গালিচা, কোমল—প্রতিপদস্পর্শে দমিয়া পড়ে। দেয়ালে

কত ছবি, ত্রিলোকবিশ্রুত কত সুন্দরীর ছবি, কত রাজ রাজড়া, রাজ প্রাসাদ, কত উদ্যান পর্ব্বত পাহাড়ের স্বাভাবিক শোভাময় ছবি। কোণে কোণে স্থানে স্থানে শ্বেত প্রস্তরেরই বা কত মূর্ত্তি, তাহাতে কেমন স্বাভাবিক বর্ণবিন্যাস! সমস্ত গৃহ বহুসংখ্যক ঝাড়, দেয়ালগির, শামাদান, বৈঠকী আলোকে আলোকিত হইয়াছে। ঝাড়ে ঝাড়ে, দেয়ালগির হইতে দেয়ালগির পর্য্যন্ত ঝুলান সুরভি ফুলের মালা।

সম্মুখে সমুন্নত রজত সিংহাসন। তাহাতে কত সোণার কাজ, কত মূল্যবান মণিমুক্তার কাজ, তাহার উপর কিঙ্খাপের গদি; উপরে চন্দ্রাতপ, তাহাতে মণিমুক্তার ঝালর। চারিদিকের ঝাড় বাতির রশ্মিতে আসন, চন্দ্রাতপ, ঝালরজাল সমস্ত উদ্দীপ্ত হইয়াছে।

সিংহাসনে বসিয়া বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার ভাবী নবাব নিজাম তরুণ নবাবজাদা মিরজা মহম্মদ খাঁ। নবীন দেহে রাজবেশ, মস্তকে মণি-মুক্তাখচিত উষ্ণীষ। সে কন্দর্পদর্পহারী মোহনমূর্ত্তি সেই রাজবেশ, প্রমোদাবাস, রাজদরবার, রাজসিংহাসনের উপযুক্তই ছিল। যুবরাজের দক্ষিণে, বামে নিম্ন আসনে ফরাসের উপরে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে আত্মীয় কুটুম্ব, আমীর ওমরাহ, মোসাহেব পারিষদ, দরবারী সামন্ত প্রহরী যাহার যাহার উপযুক্ত স্থানে আসীন অথবা দণ্ডায়মান। নবাবজাদার পশ্চাতে খিলীওয়ালা, খুশবুওয়ালা পাঙ্খাবরদার, ছিলমচিবরদার মূল্যবান পরি-চ্ছদপরিহিত অনেক পরিচারক; দক্ষিণে এবং বামে নিম্ন ভূমিতে চোপ-দার, আশাসোটাধারী, বল্লমধারী; তাহাদের বেশভূষা আরও মূল্যবান। আতর গোলাপের গন্ধে দরবার গৃহে সঞ্চরমান বায়ুস্রোত গুরুভার হইয়া উঠিয়াছে।

বাইজী ফয়েজউন্নিসা সফরদার তবলচীকে পশ্চাতে রাখিয়া মৃদু পদ-বিক্ষেপে সিংহাসনের দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইল; উভয় জানু পাতিয়া বসিয়া ওড়নার অঞ্চল গলদেশে দিয়া অবনত মস্তকে শেলাম জানাইল।

তখন দুই চারি পদ পশ্চাতে সরিয়া ঈষন্নমিত মুখে মজলিশের সম্মুখে ক্ষণকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইল। শত স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপকিরণে তাহার গৌর মুখকান্তি প্রভাসিত হইয়া উঠিল। মজলিশের সমস্ত লোক তাহার সেই আলোকসামান্য রূপলাবণ্য দেখিয়া মোহিত, স্তম্ভিত হইল। সেই সুন্দর সুগোল মুখ, সমোন্নত ললাট, দীর্ঘ সূক্ষ্ম কৃষ্ণপক্ষ্মশ্রেণী পরিশোভিত আয়ত চক্ষু, আরক্ত স্বচ্ছ মুকুরবৎ মসৃণ গণ্ড, পক্কবিম্বরক্ত-অধরোষ্ঠ, কর্ণিকার কুসুম তুল্য সুগঠিত ক্ষুদ্র কর্ণ, নিতম্ববিলম্বী এক-বেণীবদ্ধ মুক্তাজালপরিবেষ্টিত কেশদাম, সুললিত সুগঠিত মৃণালদণ্ডবৎ কোমলবাহু, সুপুষ্ট চম্পক কলিকাবৎ তাহার অঙ্গুলিদাম, ক্ষীণ লঘুভার, ঈষদ্দীর্ঘ দেহলতা দেখিয়া সমবেত দর্শকবৃন্দ মোহিত হইল। সৌন্দর্য্য-গুণজ্ঞ বিচারক্ষম যুবরাজ স্বয়ং গায়িকার রূপ দেখিয়া লক্ষ মুদ্রা অকিঞ্চিৎকর উপঢৌকন জ্ঞান করিলেন। লক্ষ মুদ্রা অনেক স্থলে সং-গৃহীত হয়, কিন্তু এমন রূপমাধুরী সংসারে দুর্লভ।

তখনই সারঙ্গ বাজিয়া উঠিল, তবলে মন্দিরা সারঙ্গে মিলিত হইল। প্রথম সমসংজ্ঞাপক অপাঙ্গভঙ্গি করিয়া বাইজী নৃত্য আরম্ভ করিল। বাহুর কি দোলনী, কুটিল চঞ্চল চক্ষুর কি চাহনি, মৃদু পঞ্চাঙ্গবিক্ষেপে কি সূক্ষ্ম লয়বোধব্যক্তি, দ্রুত মধ্য বিলম্বিত কি মধুর পদক্ষেপ, প্রতিবিক্ষেপে পদসংসক্ত রৌপ্য ঘুন্টিকার কি মধুর ধ্বনি, কর্ণবিলম্বী মণিরত্ন খচিত স্বর্ণ ঝুমকার কম্পনে আরক্ত গণ্ডে কি আলোকাভাস!

বাইজীর মুখমণ্ডলে শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু দেখা দিল। তালের পূর্ণ সমাবকাশে বিশ্রাম সময় লাভ করিয়া ফয়েজ উন্নিসা মুখ নত করিয়া গোলাব-সুবাসিত রুমালে স্বেদবিন্দু সকল মুছিয়া ফেলিল।

দর্শকবৃন্দ বাইজীর অপরূপ রূপ, অনিন্দ্যসুন্দর নৃত্যকৌশলে মোহিত হইয়াছিল; দরবারের আদপ কায়দা প্রায় ভুলিয়া গেল। প্রশংসা-সূচক অমুচ্চ বাহবা ধ্বনি দরবার গৃহে স্বতঃ উত্থিত হইল। স্বয়ং

নবাবজাদার ইঙ্গিতক্রমে খিলীওয়ালা আসরে নামিয়া যুবরাজের খাস বাটা হইতে স্বর্ণতবকমণ্ডিত রাজভোগ্য পাণের খিলী বাইজীকে এমদাদ করিল। ফয়েজউন্নিসা আপনার জড়াও ওড়নার অঞ্চলে তাহা গ্রহণ করিয়া নতজানু অবনতমস্তকে সিংহাসনে শেলাম জানাইল।

তখন সারঙ্গ এবং তবলের সুর নূতন করিয়া বাঁধা হইতে লাগিল। দর্শকদিগের মধ্যে অনেকে সময় পাইয়া অনুচ্চস্বরে পরস্পরের নিকট বাইজীর রূপগুণনৃত্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। বাইজীর নৃত্য যখন এত সুন্দর, লয়বোধ যখন এত সূক্ষ্ম, তাহার মুখের গানও নিশ্চয় তেমনি মধুর মনোহারী হইবে।

সারঙ্গে আলাপ আরম্ভ হইল। শ্রোতৃমণ্ডলীর সাগ্রহ দৃষ্টি গায়িকার মুখের দিকে ধাবিত হইল। বসন্তাগমে নিকুঞ্জ মধ্যে কোকিলের প্রথম পঞ্চমস্বরে ভাবুক শ্রোতার মন যেমন শিহরিয়া উঠে, সুসজ্জিত সেই যুবরাজ-মজলিশে গায়িকার মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া আগ্রহবান্ শ্রোতৃবর্গের চিত্ত তেমনি পুলকিত হইয়া উঠিল। কি মধুস্রাবী হৃদয়স্পর্শী তানলয়-পরিশুদ্ধ পরিস্ফুট স্বর! সঙ্গে সঙ্গে অর্থসঙ্গতিসূচক ভাবময় কি মধুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গভঙ্গি, কটাক্ষক্ষেপ! গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া স্বরের কি তেজোময় অধিরোহণ, সমসন্ধিতে কি মর্ম্মভেদী অপাঙ্গভঙ্গি! যুবরাজ, আমির ওমরাহ, পারিষদ মোসাহেব, দরবার গৃহের সমস্ত লোক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই মনোমদ স্বরলহরীতে চিত্ত ভাসাইয়া দিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ চিত্রার্পিত মূর্ত্তির ন্যায় স্থির। শতফুল্লকুসুম-সৌরভ, শত দীপমালার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মি, গায়িকার স্বর্গসম্ভবা রূপমাধুরী, কলকণ্ঠের সুমধুর স্বর একত্রে সারঙ্গের তানলয়ে মিশিয়া সকলকে প্রমত্ত—

"খবরদার!"

এমন সময় মজলিশের এক প্রান্ত হইতে কে যেন পরিষ্কার স্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"খবরদার!"

অমনি হঠাৎ গায়িকার গান থামিয়া গেল, তাহার কপোল ললাট-দেশ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, সারঙ্গের তার ছিঁড়িয়া গেল, সারঙ্গীর ক্ষিপ্র নিপুণ হস্ত অবশ অচল হইল, তবল্‌চী কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় বসিয়া পড়িল। এই আকস্মিক বিপৎপাতে, যেদিক হইতে গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছিল, সকলের চক্ষু যুগপৎ সেইদিকে ধাবিত হইল; চোপদার, বরকন্দাজ, পেয়াদা বক্সী ছুটিয়া আসিল।

ক্রোধগম্ভীর স্বরে নবাবজাদা আদেশ দিলেন ;—

"বেআদপকে হাজীর কর।"

কৃতান্তপুরে ছুটিয়া যাইবার কাহার আকাঙ্ক্ষা এত প্রবল? কাহার এমন মস্তিষ্কশূন্য মস্তক?—বিস্মিত নেত্রে সকলে চাহিয়া দেখিল, দুইজন বরকন্দাজ একজন যুবকের দুই বাহু দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। তাহার ভদ্র বেশ, অনিন্দ্যরূপ, সুগঠিত বলবান শরীর, মস্তকে ক্ষুদ্র উষ্ণীষের নীচে ফুল্ল বাবড়ী চুল, তাহাতে বিক্ষিপ্ত শত শত স্বর্ণ রেণু দীপালোকে দীপ্তি পাইতেছে। দেখিয়া সকলের চিত্ত চমকিয়া উঠিল। এই সুগঠিত দৃঢ় স্কন্ধ হয় তো রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই, দণ্ডেকের মধ্যেই ঘাতকের খড়্গাঘাতে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে! যুবক নমিতমস্তকে কুর্ণিস করিয়া নতমস্তকেই দাঁড়াইয়া রহিল।

নবাবজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কে তুমি?"

যুবক যুক্তকরে উত্তর করিল ;—"হুজুরের গোলাম।"

"গোলাম? কি নাম তোমার?"

"হেমেন্দ্রলাল রায়।"

"গোলামের বেআদপির কি দণ্ড, জান?"

যুবক মস্তক নত করিয়া বলিল ;—"শিরশ্ছেদ।"

"রাত্রি প্রভাতে তোমার তাহাই হইবে।—বরকন্দাজ, ইহাকে লইয়া যাও। বক্সী হাজীর ?"

বক্সী শেলাম করিয়া উপস্থিতি জ্ঞাপন করিল।

"রাত্রি প্রভাতে বেআদপের শিরশ্ছেদ করাইতে হইবে।"

"হুকুম তামিল হইবে।"

বরকন্দাজদ্বয় হেমেন্দ্রলালের দুই বাহু পূর্ব্ববৎ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া দরবার গৃহ হইতে তাহাকে বাহির করিল। যাইবার সময় হেমেন্দ্রলাল একবারমাত্র গায়িকার দিকে ক্ষণিক কাতর দৃষ্টিপাত করিয়া চলিয়া গেল।

়তীয় পরিচ্ছেদ।

বাল্যকাল হইতে গীতবাদ্যে হেমেন্দ্রলালের অনুরক্তি। জাহাঙ্গীর-নগরে অবস্থান সময় কয়েক বৎসর হেমেন্দ্রলাল কেবল গীত বাদ্যেরই চর্চ্চা করিয়াছে। প্রসিদ্ধ গায়িকা ফয়েজ-উন্নিসার নাম হেমেন্দ্রলাল পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। মুরসিদাবাদ আসিয়া তাহার অসামান্য রূপ-লাবণ্য এবং গীতশাস্ত্রে দুর্লভ পারদর্শিতার কথা আরও শুনিয়াছিল। সেই সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা মুরসিদাবাদে উপস্থিত; লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে যুবরাজ তাহাকে সুদূর দিল্লী হইতে মুরসিদাবাদে আনাইয়াছেন; আজ রাত্রিতেই তাহার প্রথম মুজরা। হেমেন্দ্রলালের অনিবার্য্য কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। সে থাকিতে পারে নাই; বহু যত্ন, বহু চেষ্টা এবং অর্থব্যয় করিয়া আজ যুবরাজের খাস মজলিশে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে কৌতূহলের ভয়ঙ্কর পরিণাম উপস্থিত হইল।

রাত্রি প্রভাতেই তাহার মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত হইবে। জন্মের মত সকল আশা, সকল সাধ, সকল ভরসা ফুরাইল। শিক্ষা সহবত-প্রাপ্ত স্বভাবধীর হেমেন্দ্রলাল এই অভাবনীয় বেআদপি করিয়া ফেলিল?

হেমেন্দ্রলাল অপসারিত হইলেও কিছু কাল সেই মজলিশ নীরব নিশ্চেষ্ট রহিল। তাহার পর নবাবজাদা গীত আরম্ভ করিবার জন্য গায়িকাকে ইঙ্গিত করিলেন। সারঙ্গী যন্ত্রে নূতন তার সংযোগ করিতে লাগিল, তবলচী পুনরায় সুর বাঁধিতে লাগিল। ফয়েজ-উন্নিসা মৃদুপদে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া যুক্তকরে যুবরাজপদে কিছু নিবেদন করিবার প্রার্থনা জানাইল।

নবাবজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"কি চাও, কি হইয়াছিল?"

গায়িকা উত্তর করিল ;—"জাঁহাপনা অভয় দিলে বাঁদী বলিতে পারে।"

"বল। কোন ভয় নাই।"

"এ বাঁদী দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ অনেক দরবারে মুজরা দিয়াছে, অনেক সমঝ্‌দার মজলিশে গান করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত সমঝ্‌দার শ্রোতার বৈঠক এ পর্য্যন্ত বুঝি তাহার ভাগ্যে কোথায়ও মিলে নাই। আজ জাঁহাপনার দরবারে প্রকৃত সমঝ্‌দার দেখিলাম।"

"কি বলিতেছ?"

"প্রকৃত বোদ্ধা আপনার দরবারেই দেখিলাম।"

"কাহার কথা বলিতেছ?"

"জাঁহাপনা যে বাবুসাহেবের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।"

"সে যে বেসহবৎ, অতি বেআদপ।"

"সুবা বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার নবাব নাজিম সামান্য একজন গুণী প্রজার বেআদপি মাপ করিতে পারেন।"

সকলে বিস্মিত হইল ; বাইজীর সাহস দেখিয়া বিস্মিত হইল,

নবাবজাদার সহিষ্ণুতা দেখিয়া আরও বিস্মিত হইল। গায়িকা পুনরায় যোড়হস্তে কহিল ;—

"বোধ হয়, অনবধানতা বশতঃই এই বেআদপি হইয়াছে।"

নবাবজাদার চক্ষু গরম হইল। তিনি বলিলেন ;—

"উহাকে কি তুমি চিনিতে ?"

"কোন কালে দেখা নাই, নাম পর্য্যন্ত জানি না।"

"তবে কেমন করিয়া জানিলে, ইচ্ছা করিয়া বেআদপি করে নাই !"

"হুজুর, আমারই ত্রুটী ছিল।"

"তোমার !"

"এই বাঁদীরই বিষম ত্রুটী হইয়াছিল। যে কায়দায় আমি রাগিণী ধরিয়াছিলাম তাহা প্রসিদ্ধ ওস্তাদ কালোয়াৎ খাঁসাহেব আহমদ করিম খাঁর উদ্ভাবিত। কালোয়াৎ মহলে এ কায়দার ভারি নাম। রাজধানীতে রওয়ানা হইবার কিছু পূর্ব্বে আমার সফরদারের মৃত্যু হইয়াছে। যে সফরদার আমার সঙ্গে আসিয়াছে, এ কায়দা ইহার ইহার সম্পূর্ণ অভ্যাস নাই। আমি সেকথা ভুলিয়া এই কায়দায় গান ধরার কথা সফরদারকে ইঙ্গিতে জানাইয়াছিলাম।"

বাইজী থামিল। যুবরাজ বলিলেন ;—"বল, তার পর ?"

"জাঁহাপনার বিদিত আছে, অন্তরায় পৌছিলে গানের এবং সারঙ্গের সুরে লয়ের ঈষৎ ত্রুটী হইয়াছিল। বোধ হয় বাবুসাহেব তাহা লক্ষ্য করিয়া লয়ভঙ্গে বেহুঁস্ বেআদপি করিয়া ফেলিয়াছেন।"

"এ কায়দা তোমার অভ্যাস নাই।"

"জাঁহাপনার আদেশ হইলে বাঁদী এ কায়দা আদায় করিতে সাহস করিতে পারে।"

"গাও।"

গায়িকা প্রস্তুত হইল, কিন্তু সারঙ্গীর সাহসে কুলাইল না, সে

ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। নবাবজাদা বুঝিতে পারিয়া মজলিশের দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—

"বাইজীর সঙ্গে সারঙ্গ ধরিতে পারে, এ মজলিশে এমন কেহ আছ ?"

গীত বাদ্যে পারদর্শী অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। নবাবজাদার খাস মজলিশে অনেক দিন ব্যবসাদার গায়ক গায়িকার সঙ্গে সঙ্গীতজ্ঞ সম্ভ্রান্ত দরবারী লোকের বাদ্য সঙ্গত হইত। কিন্তু সেদিন কেহই সাহস করিলেন না ; যাঁহারা উৎকৃষ্ট বাদক, তাঁহারাও চুপ করিয়া রহিলেন।

"সে কি ! আজ কেহই অগ্রসর হইতেছ না ?—ভাল, চোপদার, যে যুবক মজলিশে বেআদপি করিয়াছে, তাহাকে এখানে হাজীর কর।"—তখন বাইজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—"তুমি আমার দরবারের প্রশংসা করিলে, কিন্তু আমার বোধ হয়, এখানে তোমার ত্রুটী কেহই বুঝিতে পারে নাই।"

নবাবজাদার শ্লেষবাক্য অনেকের চিত্ত ব্যথিত করিল, কিন্তু কেহ কোন উত্তর করিলেন না। নবাবজাদা পুনরায় বাইজীকে বলিলেন ;—

"তুমি নিজের ত্রুটী স্বীকার না করিলে কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না, এ মজলিশে তেমন সমঝদার লোক নাই।"

"বুঝিতে পারিয়া হয় ত অনেকে তাহা প্রকাশ করেন নাই। যিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, জাঁহাপনা তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।"

"তাহা হইতে পারে।—যে ব্যক্তি প্রকাশ করিয়া তোমার গান ভঙ্গ করিয়াছিল, তুমি কেন নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া তাহার বেআদপি মাপের প্রার্থনা করিতেছ ?"

"জাঁহাপনার অনুগ্রহে প্রকৃত গুণীর মান অবশ্যই রক্ষা হইবে আমারও কিঞ্চিৎ স্বার্থ আছে। যে কায়দায় আমার দখল নাই হুজুরের মজলিশে তাহার আমেজ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে বেআদপি। একজন বোদ্ধা যখন আমার ক্রটী লক্ষ্য করিয়া তাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তখন সারঙ্গীর দোষে যে তাহা ঘটিয়াছে, তাহা হুজুরে জ্ঞাপন করাই আমার স্বার্থ।"

নবাবজাদা সেই বাক্‌বিদগ্ধা নবীনার সরলতায় বিস্মিত হইলেন। এমন সময় দুই জন অস্ত্রধারী সান্ত্রী হেমেন্দ্রলালকে সেখানে উপস্থিত করিল। তাহার পায়ে শৃঙ্খল, হাতে হাতকড়া; মাথার পাগড়ী অপসারিত হইয়াছে, বিশুষ্ক মুখ, বিস্রস্ত কেশ।

ফয়েজ-উন্নিসা চাহিয়া দেখিল,—বঙ্গ বেহার উড়িষ্যার ভাবী নবাব নাজিমের সঙ্গে তুলনায় এ যুবকের রূপবৈভব কোন অংশে কম নহে; বরঞ্চ কোন কোন বিষয়ে এই যুবকই তাহার চক্ষে অধিক-তর সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। নবাবজাদা রূপবান যুবক; সে রূপেও কমনীয়তা ছিল, কিন্তু সে কমনীয়তা কেমন যেন স্ত্রীজনো-চিত দুর্ব্বলতা জ্ঞাপক, অতিভোগবিলাসে তোজোহীন। এ যুবকও রূপবান; সে রূপেও কমনীয়তা ছিল, কিন্তু তাহা স্ফুরৎ শৌরলাবণ্য-ময়, পুরুষোচিত দার্ঢ্য-সূচক, তেজোময়, অক্ষুণ্ণ অনাবিল। ফয়েজ-উন্নিসার রমণী-চক্ষে যুবকের রূপ অধিকতর চিত্তহারী বলিয়া বোধ হইল। ফয়েজউন্নিসা দেখিল;—যুবক গুণী সমঝ্‌দার এবং পরম রূপবানও বটে; কিন্তু দরবারের এই প্রথম প্রকাশ্য মজলিশে তাহার লয়ের ক্রটী ধরিয়া যুবক তাহাকে বিষম লজ্জা দিয়াছে। বাইজীর চিত্তে বিষম এক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। এক দিকে গুণের আদর, রূপের আকর্ষণ; অপর দিকে ব্যবসাদারীর ঈর্ষা, প্রতিহিংসা। কিন্তু অবশেষে স্ত্রীহৃদয়েরই বা জয় হইল।

নবাবজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তুমি কে ?"

হেমেন্দ্র নতশিরে উত্তর করিল ;—"জাঁহাপনার গোলাম।"

"কি নাম তোমার ?"

"হেমেন্দ্রলাল রায়।"

নবাবজাদা ক্ষণকালের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে হেমেন্দ্রলালের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, জান ?"

"এ দাসের অপরাধ গুরুতর, প্রাণদণ্ডই তাহার উপযুক্ত শাস্তি ; কিন্তু জাঁহাপনার দয়াও অসীম।"

"কেন তুমি ওরূপ বেআদপি করিলে ?"

"মৃত্যু নিকট হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম।"

নবাবজাদা দেখিলেন, যুবক যে-ই হউক না কেন, শিক্ষিত বটে, কথাবার্ত্তায়ও বেসহবৎ নহে, নবীন বয়স, পরম রূপবানও বটে। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"কেন তোমার এ দুর্ম্মতি হইল ? কাহাকে খবরদার করিয়াছিলে ? কি ত্রুটী পাইয়াছিলে ?"

হেমেন্দ্রলাল উত্তর দিতে সাহস পাইল না, মুখ নত করিয়া রহিল।

"গায়িকা প্রকাশ করিয়াছে, লয়ভঙ্গ হইয়াছিল। তুমি সেই জন্য খবরদার করিয়াছিলে ?"

"দাসের মুখ হইতে হঠাৎ শব্দ বাহির হইয়াছিল ; ইচ্ছা করিয়া এ দাস খবরদার করে নাই। আর—"

"আর কি ?"

"গায়িকার নিজের দোষে লয় ভঙ্গ হয় নাই, সারঙ্গীরই ত্রুটী হইয়াছিল। বোধ হয়, একায়দা সারঙ্গীর অভ্যাস ছিল না।"

ফয়েজউন্নিসা মনে মনে হেমেন্দ্রলালকে শত ধন্যবাদ দিল। তাহার হৃদয় আরও আর্দ্র হইল।

নবাবজাদা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"এ কায়দা তোমার অভ্যাস আছে ?"

হেমেন্দ্রলাল হঠাৎ উত্তর দিতে পারিল না। মজলিশে গীতবাদ্যদক্ষ রাজধানীর বহু শ্রোতা উপস্থিত ; স্বয়ং নবাবজাদার সম্মুখে সেই সমঝদার বৈঠকে নিজের গুণপনার কথা নিজে বলিতে সাহস পাইতেছিল না।

"শুন, তুমি যদি এই গায়িকার সঙ্গে রাগিণীর এই কায়দা ঠিক চালাইতে পার, তাহা হইলে তোমার অপরাধ ক্ষমা করা যাইবে, আর যদি তাহা না পার, তোমার বেআদপির শাস্তি, রাত্রি প্রভাতে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

"জাঁহাপনার আদেশ হইলে দাস চেষ্টা করিতে পারে।"

তখন নবাবজাদার ইঙ্গিতে হেমেন্দ্রলালের পায়ের শৃঙ্খল, হাতের হাতকড়া খুলিয়া দেওয়া হইল। হেমেন্দ্রলাল জানু পাতিয়া বসিয়া অবনতমস্তকে সিংহাসনের সম্মুখে শেলাম করিয়া সারঙ্গ গ্রহণ করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সারঙ্গের ছিন্নসূত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া গায়িকার পূর্ব্বগীত গ্রামে সুর বাঁধিয়া সশঙ্ক কাতর দৃষ্টিতে গায়িকার মুখের দিকে চাহিল। যাহার সঙ্গে পূর্ব্বে গীত সঙ্গত হয় নাই, এমন গায়িকার সঙ্গে লয় রাখিয়া যন্ত্র চালনা সহজ নহে। ফয়েজ উন্নিসা সে কাতর দৃষ্টির অর্থ বুঝিল। হেমেন্দ্রলালের ব্যবহারে তাহার চিত্ত স্নিগ্ধ হইয়াছিল। প্রকৃত গুণবান, এই রূপবান তরুণ যুবকের প্রাণরক্ষা করিতে হইবে। পরশ্রীকাতর সাধারণ ব্যবসাদারের ন্যায় ঈর্ষামূলক কূট কারচুপি দেখাইয়া হেমেন্দ্রলালকে অপ্রতিভ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিল। হেমেন্দ্রলাল সারঙ্গে

সেই নূতন কায়দা একবার আমেজ করিল। ফয়েজউন্নিসা শুনিয়াই বুঝিতে পারিল যে, যুবক গীতশাস্ত্রে অসাধারণ ক্ষমতাশালী, নূতন কায়দায় দক্ষ ওস্তাদ। তখন সেই সুরে আপনার কলকণ্ঠ মিশাইয়া ফয়েজউন্নিসা গান ধরিল। গীত বাদ্যে সূক্ষ্ম স্বরলয়যুক্ত সেই মধুর গানে শ্রোতৃবর্গ বিমোহিত হইলেন; ফেরতা, তেহাই, অবশেষে সম-সন্ধিতে সম্পূর্ণ মিল দেখিয়া সেই নবাবী মজলিশ "বাহবা!" ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

গীত-অন্তে ফয়েজউন্নিসা নবাবজাদাকে শেলাম করিল।

নবাবজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"সারঙ্গে কায়দা আদায় হইয়াছে ?"

গায়িকা। "জাঁহাপনার হুজুরেই তাহা বিদিত হইয়াছে; সঙ্গতে কোন ত্রুটী হয় নাই।"

নবাবজাদা হেমেন্দ্রলালকে ইঙ্গিত করিলেন। হেমেন্দ্রলাল থর-কম্পিত হৃদয়ে অগ্রসর হইয়া শেলাম করিল।

"কোথায় গীতবাদ্য অভ্যাস করিয়াছিলে ?"

"জাহাঙ্গীরনগরে।"

"এখানে কি কর ?"

"জাঁহাপনার গোলামী,—দাস কানুনগো সেরেস্তায় মুহুরী।"

"তোমার বেআদপী মাফ করা গেল।"

হেমেন্দ্রলাল জানু পাতিয়া বসিয়া মস্তক নত করিয়া কুর্ণিশ করিল।

নবাবজাদা বাইজীকে পুনরায় গান ধরিতে ইঙ্গিত করিলেন।

বাইজী হেমেন্দ্রকে ইঙ্গিত করিল। হেমেন্দ্র বড় বিপদে পড়িল, সফরদারকে সারঙ্গ দিবে, কি নিজেই বাজাইবে—বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িল। নবাবজাদা হেমেন্দ্রলালকেই বাজাইবার আদেশ করিলেন। অপরিচিত গায়িকার সঙ্গে লয়সঙ্গত করা বড় দুরূহ। হেমেন্দ্রলাল

বাইজীকে মৃদু কাতর স্বরে বলিল ;—

"একবার প্রাণ বাঁচাইয়াছ !"

গায়িকা বুঝিতে পারিল, মৃদুকণ্ঠে বলিল ;—

"ভয় নাই ; কানেড়া—দরবারী।"

হেমেন্দ্রলাল সারঙ্গে দরবারী কানেড়া আলাপ আরম্ভ করিল। মোহড়া অন্তে প্রশংসাসূচক মৃদু "বহুৎ !" উচ্চারণ করিয়া ফয়েজউন্নিসা গান ধরিল। সে গান শেষ করিয়া আর একটী ধরিল। ক্রমে হেমেন্দ্রলালেরও সাহস বৃদ্ধি হইল। দরবারী সমস্ত লোক মনে মনে স্বীকার করিল, রূপে গুণে গায়িকা লক্ষ মুদ্রার উপযুক্ত বটে। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত মজলিশ চলিল। অবশেষে নবাবজাদার ইঙ্গিতে মুজরা শেষ হইল। আপনার গলদেশ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার খুলিয়া লইয়া নবাবজাদা গায়িকাকে পুরস্কৃত করিলেন। ফয়েজউন্নিসা সসম্মানে নতমস্তকে তাহা গ্রহণ করিল। নবাবজাদা তখন হেমেন্দ্রলালকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"তোমার নাম হেমেন্দ্রলাল রায় ?"

হেমেন্দ্রলাল যুক্তকরে শেলাম জানাইল।

"তোমাকে আর কোথাও দেখিয়াছি ?"

"নিজামতি পত্র লইয়া দাস হুগলীতে জাঁহাপনার নিকট গিয়াছিল।"

"তাহার পরে তুমি কলিকাতা গিয়াছিলে ?"

"হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম।"

"তুমি এখন কানুনগো সেরেস্তার মোহরের ?"

হেমেন্দ্রলাল মস্তক নত করিয়া স্বীকার করিল।

নবাবজাদা বলিলেন ;—"তুমি বিশ্বাসী চাকর, আগামী কল্য খাস দরবারে হাজীর হইও।"

দরবারী সমস্ত লোক হেমেন্দ্রলালের ভাগ্যচক্রের অদ্ভুত পরিবর্ত্তন

লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইল। রাত্রি প্রভাতে যাহার প্রাণদণ্ড হইবে, আদেশ হইয়াছিল, খাস দরবারে তাহার সসম্মান আহ্বান!

সে রাত্রির মত দরবার ভঙ্গ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে হেমেন্দ্রলাল বাড়ীতে পৌছিল। গৃহে প্রবেশের পূর্ব্বেই রামমোহন দৌড়িয়া আসিল; অব্যক্ত আশ্চর্য্য হর্ষ-সূচক শব্দ করিয়া হেমেন্দ্রলালের পায়ে পড়িল।

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল;—"কি রামমোহন? কি হইয়াছে?"

"দাদাবাবু, তুমি বাঁচিয়া আছ!"

"বাঁচিয়া আছি বৈকি; আমি কবে মরিলাম?"

রামমোহন তখন হর্ষোৎফুল্লনেত্রে হেমেন্দ্রলালের মুখের দিকে ক্ষণ-কাল চাহিয়া রহিল, দুই হাতে হেমেন্দ্রের ডান হাত তুলিয়া দেখিল। শেষে একপদ পশ্চাৎ সরিয়া পুনরায় হেমেন্দ্রলালের আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। তখন যেন হেমেন্দ্রলালের জীবন সম্বন্ধে তাহার প্রত্যয় দৃঢ় হইল।

"কিরে, রামা, কি হইয়াছে? অমন করিতেছিস্ কেন?"

"দাদাবাবু, নবাবজাদা তোমার গর্দ্দান কাটিয়া ফেলেন নাই?"

হেমেন্দ্র তখন বুঝিতে পারিল যে, হীরাঝিলের মজলিশের কতক বিবরণ এই সময় মধ্যেই সেখানে পৌছিয়াছে। তখন মৃদু হাস্য করিয়া হেমেন্দ্র বলিল;—

"গর্দ্দান কাটা গেলে আমি আর কেমন করিয়া বাড়ীতে আসিলাম।"

রাম। "তা বটে।—আমি এখনি খাঁসাহেবকে সংবাদ দিয়া আসি।"

নবাবজাদার খাস দরবারে বেআদপি অপরাধে হেমেন্দ্রের যে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইয়াছিল, সে সংবাদ রাত্রিমধ্যেই খাঁসাহেবের নিকট পৌঁছিয়াছিল। সরিফন বেগম, সুরতউন্নিসা এবং পিয়ারের নিকটও তাহা গোপন থাকে নাই। প্রথম সংবাদ পাইয়া খাঁসাহেব হতবুদ্ধি হইলেন, সরিফন বেগম চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, সুরত-উন্নিসার সুন্দর মুখ বিষাদকালিমাময় হইয়া উঠিল। হেমেন্দ্রলাল বেআদপ! তাহার প্রাণদণ্ড! সকলে মহাব্যাকুল, মর্ম্মাহত হইলেন।

সরিফন। "হেমেন্দ্রকে বাঁচাইতে হইবে।"

কাশেম। "নবাবজাদার আদেশ; বাঁচাইবে কে?"

সরিফন। "স্বয়ং নবাব নিজাম সাহেবের কাছে যাও; যেমন করিয়া পার, বাঁচাও।"

"এই রাত্রিকালে নবাবনিজাম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ অসম্ভব। রাত্রি প্রভাতেই আদেশ প্রতিপালিত হইবে, সময় কৈ?—আর বৃদ্ধ নবাবেই বা কি করিবেন? নবাবজাদা তাঁহার শাসনের বাহির হইয়াছে।"

খাঁসাহেবের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, সরিফন বেগম কাঁদিতে লাগিলেন; সুরতউন্নিসা বিকলচিত্তে অগ্রসর হইল, খাঁসাহেবের পায়ে পড়িয়া কাতরকণ্ঠে বলিল;—

"ভাইসাহেবকে রক্ষা করিতে হইবে।"

খাঁসাহেব। "নবাবজাদার কোপ হইতে কাহাকেও রক্ষা করা মানুষের অসাধ্য। অবোধ, জান না, এ প্রাণ দিয়াও হেমেন্দ্রকে রক্ষা করিতে পারিলে তাহা আমার কর্ত্তব্য।"

খাঁসাহেব উঠিলেন। প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। নবাবজাদার নিকট চেষ্টা করা বৃথা। খাস মজলিশের পর রাত্রির অবশিষ্ট কাল নবাবজাদা কোন দিনও প্রকৃতিস্থ থাকেন না। আমলা, আমির, ইয়ার, বক্সীকে

ধরিবেন। যে কোন উপায়ে দণ্ড মহকুপ রাখিয়া স্বয়ং নবাবজাদার সঙ্গে দেখা করিয়া হেমেন্দ্রের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিবেন। এমন সময় সাদেক সংবাদ দিল, হেমেন্দ্রলাল নিরাপদে গৃহে ফিরিয়াছেন।

কাশেম। "কেমন করিয়া জানিলি?"

সাদেক। "খবর লইয়া রামমোহন সিংহ আসিয়াছে।"

কাশেম। "রামমোহনকে বল্, এখনি হেমেন্দ্রকে আমার কাছে লইয়া আসুক।"

তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। হেমেন্দ্র পৌঁছিলে খাঁসাহেব তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ফেলিলেন। হেমেন্দ্র সমস্ত ঘটনা খাঁসাহেবের নিকট নিবেদন করিল। শুনিয়া শুনিয়া খাঁসাহেব, বৃদ্ধা বেগম, বিবি সুরতউন্নিসা শিহরিয়া উঠিলেন। পরিশেষে যেরূপে হেমেন্দ্রের প্রাণ রক্ষা হয় এবং নবাবজাদা সন্তুষ্ট হইয়া হেমেন্দ্রকে খাস দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ দেন, তাহা শুনিয়া সকলে আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

খাঁসাহেব হেমেন্দ্রলালকে সে রাত্রিতে অনেক উপদেশ দিলেন। নবাবজাদা খুসী হইয়াছেন, হেমেন্দ্রের উপর তাঁহার সুদৃষ্টি পড়িয়াছে,—হেমেন্দ্রের অদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এখন হইতে অতি সাবধানে চলিতে হইবে। অসৎসংসর্গদুষ্ট, চঞ্চল-চিত্ত নবাবজাদার মতির স্থিরতা নাই। অনুচিত আবদারে তাঁহার চরিত্র দিন দিন ভয়ানক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতেছে। এরূপ অব্যবস্থিত-চিত্ত লোক আজ যাহার প্রতি প্রসন্ন, কালই তাহার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে পারে। হেমেন্দ্রলাল খাঁসাহেবের সমস্ত উপদেশ শিরোধার্য্য পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া রাত্রি প্রভাতে স্বীয় আবাসে ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন হেমেন্দ্রলাল হীরাঝিলের প্রাসাদে নবাবজাদার খাস দরবারে উপস্থিত হইল। প্রভাতে যাহার মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত হইতেছিল, খাস দরবারে তাহার সাদর আহ্বান! সিপাহী, চোপদার, বরকন্দাজ, মোসাহেব, দরবারী আমীর ওমরাহগণ পর্য্যন্ত সকলে তাহার ভাগ্য-পরিবর্ত্তন দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল। নবাবজাদার সুনজরে দরিদ্র ধনী হয়, ফকীর আমীর হয়;—এই তরুণ যুবক কি অনুগ্রহ, কি পদ পায়, দেখিবার জন্য, জানিবার জন্য অনেকেই ব্যস্তসমস্ত হইল। সীপাহী, চোপদার, বরকন্দাজেরা হেমেন্দ্রকে অভিবাদন করিল; মোসাহেব, ওমরাহগণ পরিচয়সূচক স্মিতইঙ্গিত করিলেন। হেমেন্দ্রলাল নবাবজাদার নূতন অনুগৃহীত; কেহবা তাহার নিকট অনুগ্রহলাভের আশায় মন বাঁধিল, কেহবা নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া ঈর্ষায় জর্জ্জরিত হইল। নবাবী দরবার, কাহাকে ঠেলিয়া কে উপরে উঠিবে, কাহাকে নিগ্রহে ফেলিয়া কে অনুগ্রহভাজন হইবে, পারিষদবর্গের দিন রাত এই চিন্তা; তাহাতে আবার নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী!

নবাবজাদা দরবারে উপস্থিত হইয়া হেমেন্দ্রলালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বক্সী তাহাকে মছনদের সম্মুখে লইয়া গেল। হেমেন্দ্রলাল দরবারী কুর্ণিস করিয়া নতমস্তকে দাঁড়াইল।

"তুমি কানুনগো সেরেস্তার মোহরের? সেরেস্তায় কি প্রতিদিন যাইতে হয়?"

হেমেন্দ্র বিনীত উত্তর করিল;—"প্রতিদিন উপস্থিত থাকিবার নিয়ম।"

"না থাকিলেও চলে?"

"সেখানে জাঁহাপনার আরও অনেক নফর আছে।"

"আচ্ছা, কাল হইতে তুমি অবসর মত সেরেস্তায় যাইও; তোমার সে চাকরী যাইবে না। আমি দেখিয়াছি, গীতবাদ্যে তোমার খুব অধিকার আছে, আমার খাস মজলিশে ভাল বাদক নাই, তোমাকে আমার খাস মজলিশ ও দরবারে থাকিতে হইবে।"

হেমেন্দ্রলাল মাথা নোঁয়াইয়া পুনরায় কুর্ণিস করিল। নবাবজাদা বলিলেন;—"বক্সীর মুখে বিস্তারিত জানিবে।"

হেমেন্দ্রলাল পুনরায় কুর্ণিস করিয়া দরবার হইতে বাহির হইল।

সেই দিন হইতে হেমেন্দ্রলাল নবাবজাদার দরবারে রীতিমত যাতায়াত আরম্ভ করিল। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান হেমেন্দ্রলাল দিন দিন নবাবজাদার অনুগ্রহভাজন হইতে লাগিল।

একদিন বৈকালিক দরবার ভঙ্গের পর হেমেন্দ্রলালকে নিভৃতে ডাকাইয়া নবাবজাদা বলিলেন;—

"পারিষদ মোসাহেবের দল অধিকাংশই স্বার্থপর। তোমাকে বিশ্বাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু"—নবাবজাদা কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিয়া হেমেন্দ্রকে দেখাইয়া অপেক্ষাকৃত গম্ভীর স্বরে বলিলেন;—"কিন্তু তুমি অবিশ্বাসী নিমকহারাম হইবে না তো?"

হেমেন্দ্রের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু সেভাবের কোন বাহ্য লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া মস্তক উন্নত করিয়া হেমেন্দ্র বলিল;—

"দাস কাজে অনুপযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু অবিশ্বাসী অথবা নিমকহারামী কাজ জানে না।"

নবাবজাদা বলিলেন;—"তোমাকে বিশ্বাস করিব। দরবারের বহুলোক স্বার্থপর, তাহারা মুহূর্ত্ত মধ্যে নিমকহারামী করিতে পারে, আমি জানি। আমার বহু শত্রু, স্বার্থের আশায় অথবা প্রলোভনে পড়িয়া তাহাদের দলভুক্ত হইবে না তো?"

হেমেন্দ্র স্থিরনেত্রে নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর দিল ;—

"গোলাম নিমকহারাম নহে।"

হেমেন্দ্রের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির দৃষ্টিতে তাহার নির্ব্বিকার চিত্তের অভিব্যক্তি দেখিয়া নবাবজাদার প্রতীতি হইল ; তিনি স্বাভাবিক স্বরে বলিলেন ;—

"দেখ, অল্পদিন মধ্যে রাজ্যে বিষম অনর্থ উপস্থিত হইতে পারে। আমার পার্শ্বচরের মধ্যে এমন অনেক লোক যুটিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারি না। তোমার বিষয় আমি অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাতে তোমাকে বিশ্বাস করিবার হেতু পাইয়াছি। মনে রাখিও, আমার অনুগ্রহ অসীম ; কিন্তু যদি সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয়, তবে মুহূর্ত্ত মধ্যে জাহান্নমে যাইবে।"

হেমেন্দ্র নতজানু হইয়া নতমস্তকে শেলাম করিল। নবাবজাদা অঙ্গুলি হইতে একটী অঙ্গুরী উন্মুক্ত করিয়া হেমেন্দ্রের হাতে দিলেন। হেমেন্দ্র অতি সন্তর্পণে তাহা দুই হাতে লইয়া মস্তকে স্পর্শ করাইল। নবাবজাদা বলিলেন ;—

"আমার অনুগ্রহ এবং বিশ্বাসের নিদর্শন পাইলে। আজ হইতে আমার পার্শ্বরক্ষা তোমার একটী গুরুতর কর্ত্তব্য হইল।"

এই অচিন্ত্যপূর্ব্ব অনুগ্রহে হেমেন্দ্রের বিশাল চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। নবাবজাদা তখন বলিলেন ;—

"আরও প্রয়োজন আছে; সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

সন্ধ্যার পর নবাবজাদা তাঞ্জামে চড়িয়া এক সুসজ্জিত পুরদ্বারে পৌছিলেন, সঙ্গে পদব্রজে প্রহরী, বরকন্দাজ ও হেমেন্দ্রলাল। প্রবেশ দ্বারে পুরীরক্ষক খোজারা অতিব্যস্তে সেলাম করিয়া দ্বার খুলিয়া দিল প্রহরী বরকন্দাজবর্গকে সেখানে রাখিয়া নবাবজাদা হেমেন্দ্রলালকে

পশ্চাদাগমনের ইঙ্গিত করিয়া মর্ম্মরগ্রথিত সোপানশ্রেণী দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। সজ্জিতমূর্ত্তি বাঁদীগণ অগ্রসর হইয়া শেলাম করিল। দ্বিতলের বারান্দায় পৌছিতেই উন্মুক্ত দ্বারমুখে একটি ক্ষীণাঙ্গী যুবতী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া দুই হাতে নবাবজাদাকে শেলাম অভিবাদন করিল। হেমেন্দ্রলাল তখনও বারান্দায় পৌছে নাই। তাহাকে বারান্দায় অপেক্ষা করিতে বলিয়া নবাবজাদা সেই যুবতীর সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। হেমেন্দ্র কি অভিপ্রায়ে, কোথায় আসিল, জানে না; কিন্তু, কতক বিস্ময়ে, কতক অজ্ঞাতপ্রকৃতি আশঙ্কায় অবাক হইয়া বারান্দায় অপেক্ষা করিতে লাগিল। মর্ম্মর প্রস্তরে আচ্ছাদিত বারান্দার মেঝে, তাহাতে কত মীনার কাজ; পাশে সারী-করা কত প্রস্ফুটকুসুম যুঁই যাতি গোলাপের গাছ; দীপালোকে সমুজ্জ্বল।

কিছুকাল পরেই নবাবজাদার আহ্বানে হেমেন্দ্রলাল কিংখাপের পরদা সরাইয়া অতি সন্তর্পণে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। বৃহৎ কক্ষ, মহার্ঘ শত সরঞ্জামে সুসজ্জিত; গন্ধ দীপালোকে উদ্ভাসিত, সুরভিত। মধ্যস্থলে মহামূল্য গালিচার উপরে পাতা মছনদে জড়াও তাকিয়ায় ঠেঁস দিয়া বসিয়া স্বয়ং নবাবজাদা। মছনদের পাশে হীরা মণি মুক্তা খচিত আলবোলা, আতরদান, গোলাবপাশ; আর গালিচার উপর সারঙ্গ সেতার মন্দিরা পাখোয়াজ তবল তাউস নানারূপ বাদ্য যন্ত্র। বাঁদী পাখা দিয়া বাতাস করিতেছে, বাঁদী তবক-মোড়া খিলিপূর্ণ সোনার ডিবা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নবাবজাদা বলিলেন;—

"হেমেন্দ্রলাল, আজ হইতে তোমার পরিশ্রম বাড়িল। তুমি না বাজাইলে ফৈজীবিবি আমাকে গান শুনাইতে চায় না।"—হাসিয়া বলিলেন;—"আমার বাজানো ফৈজী একেবারেই পশন্দ করে না,—মন হয় না!"— পাশের ঘরের দিকে চাহিয়া নবাবজাদা ডাকিলেন;—

"ফৈজীবিবি!"

তখন পাশের ঘর হইতে ফৈজীবিবি মৃদুপদবিক্ষেপে সেকক্ষে প্রবেশ করিল। দীপালোকে উদ্ভাসিত, আতর গোলাপ গন্ধে সুরভিত, সুসজ্জিত সে কক্ষ ফৈজীর লাবণ্যপ্রভায় যেন আরও উদ্ভাসিত, তাহার মৃদুনিশ্বাসগন্ধে আরও যেন সুরভিত, তাহার আগমনে আরও যেন অলঙ্কৃত হইল।

বিস্মিত হেমেন্দ্রলাল অতর্কিতে দুই পদ পশ্চাৎ গমন করিল, অতর্কিতে মাথা নোয়াইয়া ফৈজীকে শেলাম করিল। নবাবজাদা হাসিয়া উঠিলেন, ফৈজীবিবিও মৃদু হাসিল। নবাবজাদা বলিলেন ;—

"ওস্তাদজী, ভাল সঙ্গত না হইলে আজ তোমার গর্দ্দান যাইবে!"

ফৈজী মৃদু হাসিয়া মধুরকণ্ঠে বলিল ;—

"আজ এখানে তেমন সমঝদার শ্রোতা নাই, সুতরাং কোন ভয় নাই!"

নবাবজাদা আরও হাসিলেন।

তখন পর্য্যন্তও হেমেন্দ্রলাল নীরব। সেই প্রথম মুজরার পর ফৈজী আর কোন প্রকাশ্য আসরে আসে নাই, কোন পুরুষ আর তাহার মুখাবলোকন করিতে পারে নাই। জনশ্রুতিতে হেমেন্দ্রলাল জানিয়াছে, ফৈজীবিবি তখনও রীতিমত বেগমশ্রেণীভুক্ত হয় নাই, কিন্তু তাহার পৃথক ঘর বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেখানে স্বয়ং নবাবজাদা ব্যতীত আর কোন পুরুষের প্রবেশ অধিকার নাই। স্বয়ং নবাবজাদা হেমেন্দ্রকে সেই ফৈজীবিবির ঘরে আনিয়াছেন! প্রথম মুজরার রাত্রিতে হেমেন্দ্রলাল যখন ফৈজীকে দেখিয়াছিল, তখন ফৈজীর নর্ত্তকীগায়িকাসুলভ পেশাদারী বেশভূষা—সেই কমনীয় দেহসৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তিজনক, শ্রোতা এবং দর্শকবৃন্দের নয়নমনমুগ্ধকর; সেদিন তাহার আয়ত চক্ষু লোকচিত্তবিজয়লিপ্সু, বিলোল কটাক্ষ এবং চঞ্চল অপাঙ্গভঙ্গিময়; আজ তাহার সম্ভ্রান্তপুরস্ত্রীবেশ—সহজ এবং স্বাভাবিক; সুন্দর সংযত সরল স্মিতমুখ। অতর্কিতে হেমেন্দ্রলাল দুই পদ পশ্চাৎ গমন

করিয়াছে, অতর্কিতে সেই অসামান্যলাবণ্যবতীকে সসম্মানে শেলাম করিয়াছে।

সেই দিন হইতে হেমেন্দ্রলাল নবাবজাদার সাক্ষাতে সপ্তাহে দুই এক দিন ফৈজীবিবির গৃহে বাদ্য সঙ্গত আরম্ভ করিল।

বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দীখাঁ নিজ দৌহিত্র নবাবজাদার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে নিতান্ত মর্ম্মাহত ছিলেন। দেশের অনেক প্রধান প্রধান লোক যে নবাবজাদা মিরজা মহম্মদখাঁর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ছিল এবং তাঁহার নিজের অভাবে উত্তরাধিকারীত্ব লইয়া যে একটা বৃহৎ গোল-যোগ উপস্থিত হইবে, বৃদ্ধ নবাব তাহা জানিতেন। নবাবজাদাকে উপদেশ দিতে অথবা তাঁহাকে শাসন করিতে তিনি ক্রটী করিতেন না, কিন্তু আবাল্য অতি-আদরে লালিত নবাবজাদা সে সমস্ত উপেক্ষা করিতেন। কিন্তু তাঁহারও চৈতন্য হইতেছিল। তিনি দেখিয়া শুনিয়া সাহসী ও বিশ্বস্ত লোক নিজ দরবারে সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। খাঁসাহেব কাশেমআলি বৃদ্ধ নবাবের কাছে হেমেন্দ্রের সচ্চরিত্র, সাহস, বিদ্যাবুদ্ধি এবং বিশ্বস্ততার কথা অনেক বলিয়াছিলেন; নবাবজাদা তাঁহার মুখে হেমেন্দ্রের কথা শুনিয়া হেমেন্দ্রকে স্বীয় দরবারভুক্ত এবং পার্শ্বচর করিতে সঙ্কল্প করেন। ফৈজী বিবি কোন ইচ্ছা প্রকাশ বা অনুরোধ করিয়াছিল কি না, তাহা প্রকাশ নাই, কিন্তু নবাবজাদা হেমেন্দ্রকে পরিশেষে ওস্তাদী-পদ দিয়া ফৈজীর গৃহে গীতবাদ্যের চর্চ্চা আরম্ভ করেন।

কানুনগো সেরেস্তায় হেমেন্দ্র অবসর মত কোন কোন দিন যাইত; কিন্তু নবাবজাদার দরবারে ঘনিষ্ঠতা নিবন্ধন সর্ব্বত্র তাহার প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। বহু রাজা জমিদার আমীর ওমরাহ হেমেন্দ্রলালের দরবার করিয়া অনেক বিপদ হইতে মুক্ত হইত। এখন আর তাহার অর্থাগমের কোন ক্রটি রহিল না।

অল্প দিনের মধ্যেই হেমেন্দ্রলাল প্রভূত সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিল। তখন

খাঁসাহেব কাশেম আলি হেমেন্দ্রের পৃথক বাড়ী করিবার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। খাঁসাহেবের বাড়ীর সংলগ্ন দক্ষিণ ভাগেই সুবিধামত স্থান পাওয়া গেল। হেমেন্দ্রলাল সেই স্থানে নিজের উন্নত অবস্থার উপযোগী এক সুন্দর বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে বাস আরম্ভ করিল। এই নূতন বাড়ী অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া খাঁসাহেব ও বেগম সাহেবাদের পক্ষে পূর্ব্ববৎ হেমেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে কোন অসুবিধা হইল না।

হেমেন্দ্রলাল রামমোহনকে একবার দেশে পাঠাইবার পরামর্শ স্থির করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রথম প্রহর অতীত হইয়াছে। ফৈজীর গৃহে গান হইতেছিল। সেগৃহে নবাবজাদার আগমন হইয়া থাকে, সাজসজ্জার অভাব ছিল না। মনশুরগঞ্জের রাজপ্রাসাদ হইতে বহু আসবাবপত্র সেগৃহে আনীত হইয়াছে। দিল্লী আগ্রা হইতে, সুরাট কাশ্মীর হইতে, ফিরিঙ্গীর সহর কলিকাতা, চন্দননগর হইতেও সেগৃহের শোভাকর অনেক সামগ্রী আহরিত হইয়াছে। স্বয়ং নবাবজাদার ভোগবিলাসবাসনার উদ্দীপক শত প্রকার মূল্যবান সাজসজ্জায় সেগৃহ নিয়ত পরিশোভিত। ফরাসের উপর মছনদে তাকিয়া ঠেঁস দিয়া বসিয়া নবাবজাদা অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে ঢুলিতে ঢুলিতে গীত শুনিতেছিলেন। বাঁদী মন্নু, সরাবের বোতল, পানপাত্র হাতে করিয়া নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। অদূর ফরাসে বসিয়া হেমেন্দ্রলাল গীতে সারঙ্গের সুর সঙ্গত করিতেছিল ;—

(হিন্দোল-আড়া)

আজু মধু-মাসে রঙ্গণ সুরঙ্গ
ছোড়ত তীখণ বাণা ; জীউ কিয়ে যাওয়ে !
শুক সারী পিকু মধু গাওয়ে ;—
হিয়া চৌকে তরাসে !

এ মজলিশে নবাবী আদব কায়দার আদর ছিল না; অন্য লোকের প্রবেশ-অধিকার ছিল না, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। নবাবজাদার মরজি হইলে কোন কোন দিন অন্য কোন গায়িকা বা নর্ত্তকী অথবা আবশ্যক হইলে কোন বাদিকা আনীত হইত। সপ্তাহে প্রায় দুই দিন বৈঠক হইত। যেরাত্রিতে তিনি ফৈজীর গৃহে আসিতেন, প্রায়শঃ সেই রাত্রিতেই বৈঠক হইত। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গান বাজনা চলিত। যেদিন নবাবজাদা ফৈজীর স্বরে স্বর মিশাইয়া গীত অভ্যাসের অথবা তবল পাখোয়াজ কি সারঙ্গ লইয়া বাদ্য শিক্ষার চেষ্টা করিতেন, সে রাত্রির মজলিশ অনেকক্ষণ চলিত, নবাবজাদা সে সকল রাত্রিতে অপেক্ষাকৃত কম মদ্যপান করিতেন। আবার কোন কোন দিন মজলিশের সূচনাতেই মদ আরম্ভ হইত, অল্প সময়ের মধ্যেই নবাবজাদা নেশায় বিভোর হইয়া পড়িতেন। তখন নৃত্যগীতবাদ্য বন্ধ হইয়া যাইত। আজ নেশা ও সরাবের রাত্রি। আগামী কল্য রাত্রিতে বৃদ্ধ নবাব সাহেবের নিকট যাইতে হইবে, অনেক কথা, অনেক পরামর্শ আছে; সুতরাং আজ মনের সুখে সঙ্গীত ও সরাবে নবাবজাদা গা ঢালিয়া দিয়াছেন।

ফৈজী গাহিল ;—

"ছোড়ত তীথন বাণা—জীউ কিয়ে যাওয়ে!"

চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই নবাবজাদা বাহবা দিলেন ;—

"নেহি, পেয়ারি; জিতে রহ!"

ফৈজী গাহিল ;—

"শুক সারী পিকু মধু গাওয়ে,—
হিয়া চৌকে তরাসে!"

নবাবজাদা ডাকিলেন ;—"সরাব! সরাব!"

ফৈজী হুঁসিয়ার, সরাব খায় না; হেমেন্দ্রলাল তো সরাব স্পর্শও করে না, মন্নু স্বর্ণপাত্রে সরাব ঢালিয়া নবাবজাদার হাতে দিল, আবার

দিল; ক্রমে পুনরায় দিল। নবাবজাদা নিঃসহনির্ভরে তাকিয়ার উপর গা ঢালিয়া দিলেন।

সেদিন ফৈজী গীতে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আকাঙ্ক্ষা মিটে নাই; হেমেন্দ্রলালকে পাখোয়াজ লইতে ইঙ্গিত করিয়া স্বয়ং তম্বুরায় সুর দিয়া গান আরম্ভ করিল;—

(বসন্ত—চৌতাল)

পিকু বোলে রাগ পঞ্চম, বন গহন
মধুরবে ধ্বনিত আজু, মলয়া সুমন্দ বহত রে।
পূর্ণমিক চন্দ্রমা শোহে সুনীল গগনমে,
শত তারকা রাজত, গুঁজত ভোওঁরা, মোহত মন।

নবাবজাদা নীরব। নিদ্রিত?—ফৈজী হেমেন্দ্রলালের দিকে চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গাহিতে লাগিল;—

কুসুম শোভিত চারু কুন্তল,
হাসিময় মুখ মণ্ডল,
ছুটত তড়িত চপল নয়নে;—
পিয়ারে মেরে তুঁহু!

নবাবজাদা নেশা-বিজড়িত ক্ষীণকণ্ঠে মুদ্রিত নেত্রে বলিলেন;—

"পিয়ারে তুঁহু!"

ফৈজী সে দিকে লক্ষ্য করিল না,—স্থির দৃষ্টিতে হেমেন্দ্রলালের দিকে চাহিয়া গাহিল;—

মধুমাস, মনহু উলাস,
পূরব কিয়ে মনো আশ?—
গাওত রাগ বসন্ত,
ঝানানা ঝানানা ঝানানা ঝন্।

ফৈজী পাখোয়াজের সঙ্গে লয় রাখিয়া তেহাই সারিয়া পূর্ণসমে হেমেন্দ্রের দিকে অপাঙ্গভঙ্গি করিল, চাহনিতে বিদ্যুৎপ্রবাহ ঢালিয়া দিল।

হেমেন্দ্রলালের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। এদিকে নবাবজাদা তখন সম্পূর্ণ অচেতন, সুতরাং মজলিশ শেষ হইল। মন্নু পানপাত্র সেপায়ার উপর রাখিয়া দিল। হেমেন্দ্রলাল উঠিলেন, ফৈজীর দিকে কাতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গৃহের বাহির হইলেন।

প্রায় প্রতি সপ্তাহে এইরূপ হইয়া থাকে। ফৈজীর গৃহের নিত্য ঘটনা কিংবা নবাবজাদার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের মলিন চিত্র অঙ্কিত করিবার স্পৃহা আমাদের নাই। নবাবজাদার অসম্ভব, অতিরিক্ত অনুগ্রহ অথবা দুর্নিবার ভয়ঙ্কর আকস্মিক নিগ্রহ দেখিয়া দেখিয়া হেমেন্দ্রলাল দিবারাত্রি সশঙ্ক থাকিতেন। ফৈজীর প্রথম মুজরার দিনের সেই ভয়ঙ্কর দণ্ডাজ্ঞার কথা সর্ব্বদা হেমেন্দ্রলালের মনে জাগিত। তাহার পর নবাবজাদার অনুগ্রহে তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি কত হইয়াছে,—সামান্য মোহরেরগিরি হইতে কানুনগো সেরেস্তায় জমার পরীক্ষক, পরগণার জমিদারী, স্বয়ং নবাবজাদার শরীররক্ষক সিপাহী মহলে নায়কত্ব, খাস মজলিশে মোসাহেবী! নবাবজাদার অনুগ্রহের পরিসীমা নাই, কিন্তু এমন অব্যবস্থিতচিত্ত লোকও আর দেখা যাইত না। অতি সামান্য কারণে, অণুপ্রমাণ সন্দেহে, দাসীবাঁদীর একটী ক্ষুদ্র কথায় তো সে রাজপ্রসাদ মুহূর্ত্তমধ্যে প্রলয়ঙ্কর হইয়া উঠিতে পারে! কিন্তু বিশ্বাসী প্রভুভক্ত হেমেন্দ্রলাল সে ভয়ে তত ভীত ছিলেন না। তাঁহার ভীতির অন্য কারণ ছিল,—ফৈজীর ব্যবহার। কি শুভ বা অশুভক্ষণেই ফৈজীর সঙ্গে তাঁহার দেখা হইয়াছিল! সেই প্রথম দিনেই তো তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইতেছিল! আবার সেই ফৈজীর অকপট উদার ব্যবহারই তো হেমেন্দ্রলালকে যমদ্বার হইতে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। সেই হইতেই তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তন, সৌভাগ্যের সূচনা। হেমেন্দ্রলাল জানিতেন, ফৈজী তাঁহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে; মুহূর্ত্ত বুঝিয়া আবদার করিয়াছে, সময় বুঝিয়া প্রার্থনা করিয়াছে। সে প্রার্থনা, সে

আবদারের ফলে হেমেন্দ্রলাল সৌভাগ্যসোপানের অনেকদূর অধিরোহণ করিয়াছেন।

কিন্তু ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হেমেন্দ্রলালের সাহস-ভরা হৃদয় সময় সময় কাঁপিয়া উঠিত। প্রথম দিন হেমেন্দ্রলালকে দেখিয়া ফৈজীর চিত্ত যে আর্দ্র হইয়াছিল, ফৈজী যে মুগ্ধ হইয়াছিল, কালে যে ফৈজীর হৃদয়ে অন্যায় বাসনার সূচনা হইয়াছিল, দিনে দিনে যে সে বাসনা প্রবল হইতেছিল, হেমেন্দ্রলাল তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন যে সে বাসনা দুর্নিবার হইয়া উঠিতেছে, হেমেন্দ্রলাল তাহাও লক্ষ্য করিয়াছেন। হেমেন্দ্রলালের নিকট হইতে কোন দিন কোনরূপ আশা ভরসার ইঙ্গিত মাত্রও ফৈজী পায় নাই, তথাপি ফৈজী আপন চিত্ত বশ করিতে পারে নাই। হেমেন্দ্র যতই দূরে থাকিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ফৈজী ততই তাঁহাকে নিকটে টানিয়া আনিয়াছে। নবাবজাদার সাক্ষাতে ভিন্ন কোন দিনও হেমেন্দ্রলাল ফৈজীকে দেখা দেন নাই। এখন নবাবজাদার সাক্ষাতেই লয় তাল, সম সঙ্গত, গীতকথার ব্যপদেশে চকিত অপাঙ্গভঙ্গিতে, চতুর অঙ্গবিক্ষেপে, শতপ্রকারে সেই কলঙ্কময় মনোগত ভাব ফৈজী হেমেন্দ্রলালের নিকট অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছে!

দেখিয়া দেখিয়া কত দিন হেমেন্দ্রলালের সর্ব্বশরীর কাঁপিয়া উঠিয়াছে। সর্পবিবরে হাত রাখিয়া, বাঘের মুখের ভিতরে মাথা রাখিয়া আমোদ! মুহূর্ত্তে যে কালসাপ দংশন করিবে, সে বিষে রক্ষা নাই! মুহূর্ত্তে যে বিকট মুখ দন্তপেষণে মস্তক বিচূর্ণ করিবে, পলায়নের উপায় নাই!—আগুন লইয়া খেলা, নিমিষে যে সর্ব্বশরীর, যথাসর্ব্বস্ব দগ্ধ হইয়া যাইবে!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এক দিন রাত্রিতে হেমেন্দ্রলাল নিজের বাসাবাটীতেই ছিলেন। নবাবজাদা বৃদ্ধ নবাবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন, সুতরাং হেমেন্দ্রলাল আর মনশুরগঞ্জ যান নাই, আর কোথায়ও যান নাই। ফৈজীর ব্যবহারে তাঁহার চিত্ত আজ বড়ই উদ্বেগময় হইয়াছে;—এমন করিয়া কি চিরদিন যাইবে? কি সূত্রে কোন্ মুহূর্ত্তে নবাবজাদার সন্দেহের উদ্রেক হইবে, কে বলিতে পারে? যদি একবার সন্দেহই উপস্থিত হয়! হেমেন্দ্রলালের জীবনাকাশ অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যার পর হেমেন্দ্রলাল দ্বিতল বৈঠকখানার বারান্দায় বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন। চাঁদ উঠিয়াছে, সম্মুখে বাগানে শত শত ফুল ফুটিয়াছে, মৃদু বাতাসে ফুলের সৌরভ বহিয়া আনিয়া ঘর বারান্দা আমোদিত করিতেছে, অদূরে ভাগীরথীবক্ষে ক্ষুদ্র তরঙ্গমালার উপর চাঁদের প্রতিবিম্ব ঝিকি মিকি করিতেছে। প্রকৃতির বড় শোভা হইয়াছে, কিন্তু হেমেন্দ্রের চিত্ত অশান্তিময়, মনের উদ্বেগ কিছুতেই দূর হইতেছে না। হেমেন্দ্রলাল উঠিলেন, পাশের ঘর হইতে একটী এসরাজ আনিয়া তাহাতে সুর দিতে লাগিলেন। এমন সময় রামমোহন আসিয়া জানাইল, একজন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিয়াছেন।

ভদ্রলোকটী বিলম্ব করেন নাই, রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে উপস্থিত হইলেন। রামমোহন চলিয়া গেল। ভদ্রলোকটীর অতি নবীন বয়স, সুন্দর গৌরমুখে গোঁফের উদয় হয় নাই। মাথায় আফগানী জরীর টুপী, তাহা ঘিরিয়া বহুমূল্য পাগড়ী; চোস্ত ইজের, কিংখাপের লবেদা, তাহার আস্তিন ঝুলিয়া পড়িয়াছে! পায়ে জরির জুতা, হাতে রুমাল, গলায় মুক্তার মালা ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। প্রথম দর্শনেই হেমেন্দ্রলাল বুঝিতে পারিলেন, যুবক বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোক।

বয়স খুব কম, কিন্তু পরিচয় আলাপ নাই! হেমেন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শেলাম জানাইয়া সমাদরে বসিতে বলিলেন। সেখানে দুই তিন খানা কেদারা ছিল, একখানা চৌকীতে ফরাস ও তাকিয়া ছিল। আগন্তুক শেলাম করিয়া একখানি কেদারায় বসিলেন, হেমেন্দ্রলাল আর এক-খানিতে বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন ;—"আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকট আসিয়াছি।"

হেমেন্দ্র। "কি প্রয়োজন ?"

আগন্তুক। "নিবেদন করিতেছি ; বিষয়টী প্রকাশ না হয়,—এস্থান কি নির্জ্জন ?"

আগন্তুকের কথার স্বর হেমেন্দ্রলালের কাণে যেন কেমন একটুকু পরিচিতের ন্যায় বোধ হইল। বারান্দায় চাঁদের আলো ভিন্ন অন্য আলো ছিল না, ভাল করিয়া দেখা যায় না।

হেমেন্দ্রলাল বলিলেন,—"এখানে কেহ নাই, আপনার যাহা প্রয়ো-জন, বলিতে পারেন।"

আগন্তুক কিছু বলিলেন না, কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া চন্দ্রালোকদীপ্ত উদ্যানের দিকে চাহিয়া বলিলেন ;—

"আপনার সুন্দর বাড়ী, সুন্দর ফুলের বাগান। চাঁদের আলোতে বাগানের অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে!"

হেমেন্দ্রলাল বিস্মিত হইলেন। যুবক বিশেষ প্রয়োজনীয় অথচ গোপনীয় বিষয় লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহার ব্যবহারে ব্যস্ততার কোন লক্ষণ নাই, স্থির চিত্তে চাঁদের আলো আর ফুল বাগানের কথা আরম্ভ করিল!

যুবক নিঃসঙ্কোচে ফরাসের উপর হইতে সারঙ্গ তুলিয়া লইয়া বলিলেন ;—"শুনিয়াছি, আপনি সারঙ্গ খুব ভাল বাজাইতে পারেন, আপনার নিকট বাদ্য শিক্ষা করিব। অনুগ্রহ হইবে ?"

হেমেন্দ্র। "আপনি কে?"

যুবক। "আপনি আমাকে চিনেন না, আমি আপনাকে বহুবার দেখিয়াছি!"

অস্পষ্ট চাঁদের আলোতে ভাল করিয়া দেখা যায় না, লোকটী পরিচয়ও দেয় না!

হেমেন্দ্রলাল চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় নীচে বাগানের দিক হইতে যেন মানুষের কথার আওয়াজ আসিল। যুবক বলিলেন;—

"এ স্থান নির্জ্জন নহে;—লোকের কথা শুনিতে পাইতেছি!"

হেমেন্দ্র বলিলেন;—"তবে ঘরের ভিতরে চলুন।"

হেমেন্দ্রলাল ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, যুবক ও চলিলেন, সারঙ্গ লইয়াই চলিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াও যুবক বসিলেন না; দাঁড়াইয়া গৃহ সজ্জা দেখিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রলাল মনে মনে বিরক্ত হইলেন; কে এ? গৃহে আলো জ্বলিতেছিল। চারিদিক দেখিয়া যুবক হেমেন্দ্র-লালের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন;—

"বাবুসাহেব, আমার বাসনা পূর্ণ হইবে!"

হেমেন্দ্রলাল ব্যস্ত সমস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কে তুমি?"

যুবক তখন টুপীশুদ্ধ মাথার পাগড়ী খুলিয়া একটা সেপায়ার উপর রাখিলেন। ক্ষণকালের জন্য হেমেন্দ্রলাল বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, তাঁহার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইল, দেহ অবশ হইয়া পড়িল;—

ফৈজীবিবি!

ফৈজী গা হইতে লবেদা খুলিয়া ফেলিল; মণিমুক্তা খচিত জড়াও কামদার কোরতা বাহির হইয়া পড়িল। টুপী দূরে ফেলিয়া দিল, পাগড়ীর বেষ্টন খুলিয়া বহুমূল্য সূক্ষ্ম ওড়না বাহির করিয়া গায়ে পরিল। তাহার এক-বেণীবদ্ধ কুন্তলরাশি পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত হইয়া পড়িল, কর্ণ-মূলে হীরক মুক্তা খচিত ঝুম্‌কা ঝল্‌ মল্‌ করিয়া উঠিল। ক্ষুদ্র স্থলকমল

তুল্য, রক্তিমাভ কোমল হস্তে ক্ষুদ্র সেলাম করিয়া ফৈজী স্বাভাবিক স্বরে বলিল ;—

"বাবুসাহেব, আরজী মঞ্জুর ?"

অসম্ভব ঘটনায়, অতি বিস্ময়ে হেমেন্দ্রলালের বাক্যরোধ হইয়াছিল। হেমেন্দ্র এক পদ পশ্চাতে সরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মাথা হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল।

ফৈজী। "নবাবজাদার শরীররক্ষক মহাবলশালী সেপাহী তুমি হেমেন্দ্রলাল রায়, সামান্য এক জন স্ত্রীলোককে দেখিয়া ভয় পাইতেছ!"

হেমেন্দ্র। "ফৈজীবিবি, তুমি এখানে!"

ফৈজী। "হাঁ, এই তো আমি বিবি ফয়েজউন্নিসা, ফৈজী বেগম ; আপনার মঙ্গল তো ?"

হেমেন্দ্র। "কেমন করিয়া এখানে আসিলে ?—কেন আসিলে ?"

ফৈজী গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল ;—

"স্বপনকা বাত, লাজসে কহন না যায়, এরি মায়ী!"

হেমেন্দ্রলাল গৃহদ্বারের কাছে গেলেন, ফৈজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন ;—

"সর্ব্বনাশ করিয়াছ, ফৈজীবিবি! কেহ জানিতে পারিলে কি উপায় হইবে ?—একটুকু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।"

হেমেন্দ্রলাল গৃহ হইতে বাহির হইয়া একেবারে নীচে গেলেন ; রামমোহনকে ডাকিয়া বলিলেন ;—

"রামমোহন, আমি কাজে বড় ব্যস্ত আছি, কাহাকেও উপরে যাইতে দিস্‌নে, কাহারও সঙ্গে আমার দেখা হইবে না। বুঝিতে পারিলি ?"

দাদাবাবুর আজ্ঞা ; রামমোহন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, স্বয়ং নবাবজাদার খাস দরবারের চোপদার জরুরি হুকুম লইয়া আসিলেও আজ তাহাকে বাড়ীতে ঢুকিতে দিবে না!

এদিকে ফৈজী দেয়ালে খাটান আরসীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিজের বেশভুষা যথাযথ সন্নিবিষ্ট করিল, বেণীমুক্ত কেশগুলিকে সরাইয়া গুছাইয়া, রুমালে মুখ মুছিয়া ফেলিল; তখন ফরাসে বসিয়া সারঙ্গ লইয়া মৃদু মৃদু সুর তুলিতে লাগিল। হেমেন্দ্রলাল ঘরে প্রবেশ করিয়া চারিদিকের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন, শেষে বলিলেন;—

"ফৈজীবিবি, একেবারে পাগল—উন্মত্ত হইয়াছ?"

সারঙ্গের সঙ্গে সুর সংযোগ করিয়া ফৈজী মৃদু মৃদু গাহিল;—

(বসন্ত—যৎ)

আবাহন সাধন কত যে করি;
নিঠুর—নিঠুর হিয়া তারি!

"ফৈজীবিবি! ফৈজীবিবি!—"

ফৈজী গাহিতে লাগিল;—

ফুল্লমুকুলে অলিকুল বোলে,
আকুলিত পরাণ হামারি।
সুখবসন্তে পিয়াস একান্তে
আঁখি ভ'রে তাহারে নেহারি!

হেমেন্দ্রলাল নিকটে আসিলেন, ধীরে ধীরে ফৈজীর হাত হইতে ছড়শুদ্ধ সারঙ্গ সরাইয়া লইয়া ফরাসে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন;—

"ফৈজীবিবি, তুমি প্রাণের ভয় কর না, দেখিলাম। প্রাণ ছাড়া আরও কিছু আছে; মান ইজ্জত—"

"প্রাণ মান ইজ্জত ছাড়া মানুষের আরও কিছু আছে; হৃদয় বলিয়া একটা কিছু আছে, জান কি?"

"মান, ইজ্জত,—ধর্ম্ম অপেক্ষা কি হৃদয় বড়?"

"তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি তা কেমন করিয়া বুঝিবে!—ধর্ম্ম আমি জানি না। হেমেন্দ্রলাল, ব'স।"

হেমেন্দ্রলাল ফরাসে বসিলেন না, একখানা কেদারায় বসিলেন।

ফৈজী বলিল ;—"প্রাণ মান মর্য্যাদা আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি, ধর্ম্ম আমি কোন দিন জানি নাই। হেমেন্দ্রলাল, নবাবজাদার মজলিশে আমার প্রথম মুজরার রাত্রিতে অযাচিত অনাহূত তুমি কেন উপস্থিত হইয়াছিলে ?"

"নৃত্যগীতে তোমার অসাধারণ যশের কথা শুনিয়া, তোমার রূপগুণের প্রশংসা শুনিয়া, দেখিতে গিয়াছিলাম।"

"শুধু লোকের মুখে আমার কথা শুনিয়া প্রাণের মায়া ছাড়িয়া, অপমান লাঞ্ছনার ভয় না করিয়া নবাবজাদার খাস মজলিশে তুমি গিয়াছিলে—যাইয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলে ; আর আমি তোমাকে দেখিয়া—তোমার রূপ দেখিয়া, গুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি, প্রাণের মায়া ছাড়িয়াছি বলিয়া তুমি আশ্চর্য্য ভাবিতেছ !"

"খাস মজলিশে যাইয়া প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলাম, সেদিন তুমিই তো প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলে ; কিন্তু আজ তুমি—"

"কিন্তু আজ আমি তোমার গৃহে আসিয়া তোমাকে বিপদে ফেলিয়াছি, তোমাকে সেই প্রাণের আশঙ্কায় ফেলিতেছি।—হেমেন্দ্রলাল, সংসারে প্রাণই যদি তোমার এত প্রিয়, বল, এখনই আমি চলিয়া যাইতেছি।"

হেমেন্দ্রলাল দেখিলেন, এই বাক্‌বিদগ্ধার সঙ্গে তর্কে সুবিধা নাই, তখন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে বলিলেন ;—

"প্রাণ সকলেরই প্রিয় ; কিন্তু, শুন, প্রাণের ভয়ে আমি তোমাকে বিরত করিতে চাহিতেছি না ; প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয় বস্তু সংসারে আছে।—কিন্তু তুমি কেন এ অসঙ্গত বাসনা হৃদয়ে পুষিতেছ ?"

"সঙ্গত অসঙ্গত বুঝিবার শক্তি আমার নাই।"

"নবাবজাদার আদরের বেগম তুমি, সুবা বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার

রাজতক্তের পাশে একদিন তোমার স্থান, তুমি কেন সেই তক্তের এক জন সামান্য চাকরের—”

“তুমি অনুমতি কর, আমি বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রাজতক্তে, বাদসাহী তক্তে পদাঘাত করিয়া গাছের তলায় তৃণ শয্যায় পরম সুখে দিন কাটাইব ; তুমি প্রসন্ন হও।”

অতিদুঃখে হেমেন্দ্রের হাসি পাইল। হেমেন্দ্র বলিলেন ;—

“তৃণ পত্র খাইয়া জীবন কাটাইবে !”

“কাটাইব। তোমার কষ্ট হইবে ? তোমাকে কষ্ট দিব না। এই দেখিতেছ মুক্তার মালা”—ফৈজী গলা হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার খুলিয়া হেমেন্দ্রের সম্মুখে ধরিল—“ইহার মূল্য সহস্র মুদ্রা, ইহা অপেক্ষা অধিক মূল্যের অনেক জিনিষ আমার আছে। তুমি আদেশ কর, রাজ অট্টালিকায়, রাজভোগ-ঐশ্বর্য্যে থাকিব। বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা ছাড়াও তো দেশ আছে ! কাল, পরশ্ব, এক মাস পরে, ছয় মাস পরে, যেদিন তোমার ইচ্ছা, বল, আমি প্রস্তুত।”

“ফৈজীবিবি, সংসারে সকলের চিত্ত কি এক রূপ ? যেপথে চলিবার জন্য তুমি উন্মত্ত, অন্যের চিত্তও যে সেই পথে চলিবে, তাহা কেমন করিয়া জানিলে ?”

ফৈজী একটুকু অগ্রসর হইয়া বসিল, স্থিরনেত্রে হেমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল ;—

“হেমেন্দ্রলাল রায়, বিবি সুরতউন্নিসা কেমন রূপবতী ?”

প্রশ্ন শুনিয়া হেমেন্দ্রলাল শিহরিয়া উঠিলেন; ফৈজীর অনুচিত সন্দেহে তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। হেমেন্দ্র দাঁড়াইলেন, বলিলেন ;—

“শুন, বিবি সুরতউন্নিসা পরম রূপবতী। তুমি তাঁহার কথা শুনিয়াছ, দেখিতেছি ; তবে আরও শুন, তিনি আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী।

বিবি স্থরতউন্নিসা আমার মহোপকারী, আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, পিতৃতুল্য ভক্তিভাজন মহাত্মা কাশেম আলিখাঁর কন্যা। আমরা এক পিতা মাতার সন্তান নহি, কিন্তু বিবি স্থরতউন্নিসা সহোদরা অপেক্ষাও আমার অধিক স্নেহপাত্রী!"

"তোমার মুখের কথায় আমার ধ্রুব বিশ্বাস,—মাফ্ কর।"

হেমেন্দ্রের চক্ষুতে জল আসিল; এমন স্বর্গীয় পবিত্র সম্বন্ধেও মানুষ কলঙ্ক ঢালিয়া দেয়!

ফৈজী আবার বলিল;—"আমি না জানিয়া সন্দেহ করিয়াছিলাম, সন্দেহ দূর হইল। কিন্তু, তবে তুমি আমার কথা শুনিবে না কেন?"

"কেন শুনিতে পারি না? তোমাতে আমাতে কত প্রভেদ!—তুমি নবাবজাদার বেগম, আমি নবাবজাদার একজন ক্ষুদ্র গোলাম।"

"সে কথার উত্তর আমি দিয়াছি।"

"তুমি মুসলমান, আমি হিন্দু—"

"আমি মুসলমান। কিন্তু আমি—আমি যদি হিন্দু হইতাম, তবে কি তুমি আমার কথা রাখিতে?"

"না—তুমি যে পথে ডাকিতেছ, হিন্দু মুসলমান সকল ধর্ম্মেই সেপথে যাওয়া নিষেধ করে।"

"তুমি স্বীকার হইবে না?"

"না।"

"কখনো না?"

"কখনো না।"

ফৈজী বসিয়াছিল, উঠিল; ক্রোধে তাহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ফৈজী বলিল;—

"তুমি ধার্ম্মিক, আমি পাপীষ্ঠা,—তাই তোমার ঘৃণা হইতেছে?"

হেমেন্দ্রলালেরও ধৈর্য্যচ্যুতি হইতেছিল; বলিলেন;—

"তুমি ধার্ম্মিক কি পাপীষ্ঠা, তাহা বলিয়া নহে। পাপকার্য্যে ঘৃণা স্ত্রী পুরুষ সকলেই করিবে।"

"মন ঠিক করিয়াছ।"

"করিয়াছি।"

"শেষ উত্তর ?"

"শেষ উত্তর।"

এমন নির্ঘাত উত্তর যে পাইবে ফৈজী তাহা মনেও ভাবে নাই। অসম্ভব, অতর্কিত প্রত্যাখ্যানে মর্ম্মাহত ফৈজী শ্লেষময় জ্বালাময় স্বরে বলিল ;—

"দাসানুদাস—ক্ষুদ্র কীট তুমি, রাজভোগে তোমার প্রবৃত্তি কেমন করিয়া হইবে!"

"রাজভোগ আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।"

আহত ফণিনী যেমন ক্ষিপ্রতেজে ফণা ধরিয়া গর্জ্জিয়া উঠে, ক্ষুণ্ণ অভিমানে রোষদীপ্ত স্ফুরিতাঙ্গী ফৈজী তেমনি মস্তক উন্নত করিয়া অগ্রসর হইল, হেমেন্দ্রলালের অতি নিকটে আসিয়া গ্রীবা বক্র করিয়া রক্ত চক্ষে বলিল ;—

"নবাবজাদার পিয়ারের মোসাহেব হইয়াছ, মানুষ বলিয়া আর কাহাকেও জ্ঞান কর না!—দেখা যাইবে ; এক কথায় তোমাকে কুকুর দিয়া খাওয়াইতে, পারি জান ? দেখিব, কে তোমাকে রক্ষা করে!"

হেমেন্দ্র মস্তক উন্নত করিয়া, বক্ষ স্ফীত করিয়া ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন ;—"শুন, ফৈজীবিবি, প্রাণের ভয়ে ভীত আমি কোন দিন হই নাই, হইব না। তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, নবাবজাদাকে বলিও ; তোমার কথায় তিনি বিশ্বাস করিবেন ; যে শাস্তি বিধান হয়, মাথা পাতিয়া লইব। আমি দাসানুদাস বটি, কিন্তু তুমি যে বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার নবাবজাদার বেগম হইয়া রাত্রিকালে আমার গৃহে

আসিয়া আমাকে নিমকহারাম করিবার প্রবৃত্তি লওয়াইতে চেষ্টা করিতেছ, শত কুকুরে আমার গা হইতে মাংস ছিঁড়িয়া টানিয়া খাইলেও আমি সেকথা প্রকাশ করিব না ;—আমি নীচ অকৃতজ্ঞ নহি !"

হেমেন্দ্রের নির্ভীক নির্ব্বিকার মুখ, উন্নত স্ফীত বক্ষ, বলশালী বিশাল বাহু, স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চক্ষু, শৌরলাবণ্যময় দেহ দেখিয়া ফৈজী থম্‌কিয়া দাঁড়াইল। ফণিনী যেমন মন্ত্রৌষধিতে নমিয়া পড়ে, ফৈজী রূপমোহে তেমনি পুনরায় মুগ্ধ হইল, পুরুষোচিত অটল সাহস দেখিয়া তাহার রমণী-হৃদয় আর্দ্র হইল। মুগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফৈজী ফরাসের পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

হেমেন্দ্র বলিতে লাগিলেন ;— "আরও শুন। ক্রোধে তুমি আত্মহারা হইয়াছ ; কিন্তু শুন, তোমাকে আমি জানি, প্রথম দিন হইতে তোমার চিত্তের পরিচয় আমি পাইয়াছি। নবাবজাদার সাক্ষাতে প্রথম মুজরার দিনে নিজের যশ মানের দিকে তুমি চাও নাই, সেই খাস দরবারে প্রকাশ্যে নিজের ত্রুটী স্বীকার করিয়া তুমি আমাকে—অপরিচিত আমি, কোন দিন আমাকে দেখ নাই—আমাকে বাঁচাইয়াছিলে ; সেই তুমি, জানিয়া শুনিয়া বিনা অপরাধে আমার অনিষ্ট করিবে ?"— হেমেন্দ্রলাল মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন ;—"ফৈজীবিবি, তুমি তত নীচ নও।"

ফৈজী কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার উদ্দীপ্ত প্রতিহিংসা চলিয়া গিয়াছে, হৃদয় আর্দ্র হইয়াছে, চক্ষুতে জল দেখা দিয়াছে। অভাগিনী একেবারে চিত্ত হারাইয়া ফেলিয়াছে, স্থির থাকিতে পারিল না ; সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গিয়া জল-ভরা চক্ষে উঠিয়া হেমেন্দ্রলালের পায়ে পড়িল ; গদ্গদকণ্ঠে বলিল ;—

"হেমেন্দ্র আমার চিত্ত আর আমাতে নাই ; আমাকে পায়ে রাখ !"

হেমেন্দ্রলাল এক পদ সরিয়া দাঁড়াইলেন ; অতি অতিযত্নে আদর

ফৈজীকে বসিতে বলিলেন, শেষে ফৈজী বসিলে বলিলেন ;—

"ফৈজীবিবি, চিত্ত বশ কর। নবাবজাদার বেগম তুমি,—অতুল ঐশ্বর্য্য তোমার, অতুল গুণে তুমি গুণবতী—তুমি অধীর হইও না।"

ফৈজীর চক্ষু দিয়া তখন টস্ টস্ জল পড়িতেছিল, ভগ্নকণ্ঠে ফৈজী বলিল ;—

"আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি, পারি নাই, তাই এই দুঃসাহস করিয়া রাত্রিকালে তোমার কাছে আসিয়াছি। একবার মন খুলিয়া তোমাকে সকল কথা বলিব বলিয়া আসিয়াছি। তোমার চিত্ত যে এমন পাষাণ, তাহা আমি জানিতাম না!"

ফৈজীর অবস্থা দেখিয়া হেমেন্দ্রলালের চিত্তও ব্যথিত হইয়াছিল ; অতি কোমল স্বরে হেমেন্দ্র বলিলেন ;—"আমার চিত্ত পাষাণ, তোমার এ বিশ্বাস থাকাই ভাল। সংসারে অনেক সময় পাষাণচিত্ত লোকই মানুষের পরম আত্মীয়! আর, আমিও যতকাল বাঁচিব, চিরকাল মনে রাখিব—তুমি আমার প্রাণ রক্ষাকারিণী, চিরকাল হিতকারিণী পরম সুহৃদ।—ফৈজীবিবি, এমন দুঃসাহস তোমার কেমন করিয়া হইল?"

"কেমন করিয়া হইল, জানি না ; তুমি তো বলিয়াছ, আমি আত্মহারা হইয়াছি!"

"আত্ম বশ কর ;—তুমি পারিবে।"

ফৈজী চক্ষু মুছিয়া ফেলিল, চক্ষু মুছিয়া জলভরা চক্ষে ক্ষণকাল হেমেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল ;—"তুমি বলিতেছ, আমি চেষ্টা করিব।—আমাকে ঘৃণা করিবে না?"

"তোমাকে ঘৃণা করিব?—আমি এমন অধম অকৃতজ্ঞ নহি।"

"শুন, হেমেন্দ্রলাল, আমি চেষ্টা করিব, কিন্তু আত্ম বশ যে করিতে পারিব, সে বিশ্বাস আমার নাই।—আশা যাইবে না ; আমি আর তোমাকে বাধ্য করিবার চেষ্টা করিব না ; কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা

যাইবে না; আমি চিত্ত হারাইয়া ফেলিয়াছি। যদি কোন দিন তোমার মতি ফিরে, যদি কোন দিন তোমার দয়া হয়!—আমি নীরবে সে দিনের প্রতীক্ষা করিব।"

"আমার চিত্ত বিচলিত হউক, এ বাসনা করিও না; তোমার সুমতি হউক, সেই চেষ্টা করিও।"

"হেমেন্দ্র, চলিলাম, রাত্রি অধিক হইয়াছে। এরাত্রির কথা ভুলিয়া যাইও,—না, ভুলিও না;—আমি এত দিনেও তোমাকে চিনিতে পারি নাই, আমাকে ঘৃণা করিও না।"

ফৈজী ফরাস হইতে নামিল।

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন;—"কেমন করিয়া আসিয়াছ?"

"নৌকায়,—অর্থের অসাধ্য কিছুই নাই! তোমার বাগানের ঘাটে নৌকা রহিয়াছে।—আর বিলম্ব করিব না।"

"চল।—এবেশে যাইতে পারিবে না। আমি নৌকা দেখিয়া আসি, তুমি বেশ পরিবর্ত্তন কর।"

হেমেন্দ্র গৃহ হইতে বাহির হইলেন। নীচে যাইয়া রামমোহনকে ডাকিয়া জানিলেন, সেরাত্রিতে কেহ হেমেন্দ্রের সঙ্গে দেখা করিতে আসে নাই। রামমোহনকে সিঁড়ির কাছে রাখিয়া হেমেন্দ্রলাল একাকী বাগানের ঘাটে গেলেন। তখন চন্দ্র অস্ত গিয়াছে, ফৈজীর নৌকা ফুল-বাগানের ঘাটে বাঁধা ছিল। হেমেন্দ্রলাল তখন বৈঠকখানার বারান্দায় আসিয়া বলিলেন;—

"সব ঠিক আছে, তুমি প্রস্তুত হইয়াছ?"

ভিতর হইতে ফৈজী উত্তর করিল;—

"প্রস্তুত হইয়াছি, ঘরে এস।"

হেমেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ফৈজী বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া অজাতশ্মশ্রু সুকুমারদেহ তরুণ যুবকের মনোহর শ্রী ধারণ করিয়াছে!

ফেজী অগ্রসর হইয়া স্মিতমুখে বলিল ;—

"শেলাম, বাবুসাহেব ; আমি মিরজা মহম্মদ আলি খাঁ, মুসাফের, দিল্লী হইতে আসিয়াছি।"

ফৈজীর সাহসে হেমেন্দ্রলাল আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন ; সম্পূর্ণ নিরাশ হৃদয় এবং প্রত্যাখ্যানক্ষুণ্ণ অভিমান লইয়া ফিরিবার সময়ও তাহার এই পরিহাসরসিক বাক্‌বৈদগ্ধ্যে অবাক হইলেন। তখন অপেক্ষাকৃত কোমল স্বরে ফৈজী বলিল ;—

"হেমেন্দ্র, বিদায় হইলাম। বহু, বহুবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, আর তোমাকে বিরক্ত করিব না ; কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিব না।"

হেমেন্দ্র। "পারিবে।"

ফৈজী। "আমার মনে হইতেছে, একদিন তুমি একান্তে আমার গৃহে যাইবে, আমি সেদিনের প্রতীক্ষা করিব।"

ফৈজীর স্বর ক্ষীণ হইয়াছে। ক্ষিপ্রহস্তে চক্ষু মুছিয়া ফৈজী হেমেন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নীচে নামিয়া গেল।

ফৈজীকে বিদায় করিয়া দিয়া হেমেন্দ্রলাল ব্যথিতচিত্ত লইয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। অসঙ্গত কামনায় ফৈজী চিত্ত হারাইয়াছে, হেমেন্দ্রলাল আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে।

অগাধ অপরিমেয় স্নেহ প্রীতি ভালবাসা লইয়া কত কোমল হৃদয় লোক-লজ্জার অন্তরালে থাকিতে চায়, আবার রূপলুব্ধ কত প্রতপ্ত উদ্দাম হৃদয় রূপমোহকে ভালবাসা ভাবিয়া সমাজ ধর্ম্ম কুল মানের শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া উন্মত্ত উচ্ছৃঙ্খল বেগে ছুটিয়া চলে!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

জয়নগর গ্রামে একটা ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। গ্রামের লোক জন ছুটোছুটী করিতেছে, তৈজসপত্র সরাইতেছে। গরিবেরা সামান্য সম্পত্তি দুই চারিটা ঘটি বাটী, ধনীরা তামা কাঁশা পিতল আসবাবপত্র নিবিড় জঙ্গলে অথবা পুকুর খানা ডোবার জলে লুকাইতেছে। যে ভাগ্যবানের গৃহে কিছু সোণা রূপা ছিল, তাহা মাটির নীচে প্রোথিত হইতেছে। স্ত্রীলোকেরা নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিতেছে, বালক বালিকারা মায়ের অঞ্চল ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িতেছে। লোকে গরুবাছুর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া জঙ্গলে লইয়া যাইতেছে। লোকের আহারবিহার, রান্না-বাড়া, গ্রামের হাট বাজার বন্ধ।

রায়মহাশয়ের বাড়ীতেও বড় গোলযোগ। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর-আঁটা অন্দর মহল। পাড়ার ভদ্র অভদ্র অনেক স্ত্রীলোক তাহার ভিতর আশ্রয় লইয়াছে। অন্দর দেউড়ির দরজা আঁটিয়া দিয়া রাধামোহন, কালাচাঁদ, মাণিক, গহের, কাদের প্রভৃতি হাতিয়ারবন্দ সরদারেরা মালকোচা মারিয়া, একদল দেউড়ির ভিতরে, এক দল বাহিরে দরজার সম্মুখে উৎগ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। গৃহিণী মহামায়া রায়মহাশয়কে বাড়ীর ভিতর আসিবার জন্য পুনঃ পুনঃ মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া পাঠাইয়াছেন, কিন্তু রায়মহাশয় কয়েকজন লোক সহ ঠাকুর আঙ্গিনার সম্মুখে তাঁহার বসিবার ঘরেই প্রতীক্ষা করিতেছেন। সকলেই সন্ত্রস্ত, সকলের মুখেই মহা ত্রাসের লক্ষণ।

গ্রামে খবর পৌছিয়াছে, তিন পানসী বোঝাই নবাবের ফৌজ জয়নগরের ঘাটে আসিয়া নোঙ্গর করিয়াছে, ফৌজেরা সাজ পোষাক পরিয়া হাতিয়ারবন্দ হইয়া গ্রামের ভিতর আসিতেছে, আসিল প্রায়!

নবাবের ফৌজ! কি অভিপ্রায়ে আসিতেছে, কে জানে? গ্রামে খুন খারাবি, লুঠ তারাজ, গুম গ্রেপ্তার, ঘরদুয়ার জ্বালান, ভিটা মাটি উৎসন্ন, কত অত্যাচার, কত অঘটন ঘটিবে, কে বলিতে পারে?

ধাই, কল্যাণী পুকুর হইতে তাড়াতাড়ি এক কলসী জল আনিতে গিয়াছিল; ভরা কলসী কাঁখে লইয়া সিঁড়ি উঠিবে, এমন সময় কল্যাণী দেখিতে পাইল, পুকুর পারে অপর কোণে নবাবী ফৌজ আসিতেছে, পাঁচ ছয় জন সিপাহী আসিয়া পৌছিয়াছে। তাহাদের মাথায় লাল পাগড়ী, গায়ে মেরজাই, কোমরে তলবার, পিঠে ঢাল, হাতে লাঠি। দেখিয়া কল্যাণীর শরীর ভয়ে ফুলিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি উঠিতে উঠিতে ফৌজের দল নিকটে আসিয়া পৌছিল। কল্যাণী দ্রুতগতিতে বৈঠকখানার কোণ দিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবে এমন সময় এক জন সীপাহী বলিল;—

"এ বুড্টী, খাড়া রও!"

জল-ভরা কলসী কল্যাণীর কাঁখাল হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। কল্যাণী কাঁপিতে কাঁপিতে দৌড় দিল। সীপাহী আবার হাঁকিল;—

"এ বুড্টী, পালাও মৎ; খাড়া রও!"

কল্যাণী ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়, ফৌজেরাও পাছে পাছে অগ্রসর হইল। কল্যাণীর অস্ফুট চীৎকারে বাড়ীর লোকজন কেহ কেহ অগ্রসর হইল, তাহারা সভয়ে দেখিল, ফৌজ আসিয়া বৈঠকখানার আঙ্গিনায় পৌছিল। চারিজন সিপাহী বৈঠকখানার আঙ্গিনায়ই দাঁড়াইল, একজন চারিদিকে চাহিতে চাহিতে ঠাকুর দালানের আঙ্গিনার দিকে অগ্রসর হইল। বাড়ীর নূতন গোমস্তা রামকানাই সরকার (কানে কলম, পায়ে খরম) অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

"আপনারা কে?—কোথা হইতে আসিতেছেন?"

"আমরা মুরসিদাবাদ হইতে আসিতেছি। তুমি কে?"

এমন সময় কর্ত্তা ভৈরবচন্দ্র রায় ও সেখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সীপাহী পিঠের ঢাল, হাতের লাঠি মাটিতে রাখিয়া অগ্রসর হইল। ভৈরব রায় স্থির থাকিবেন কি পশ্চাৎপদ হইবেন, ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময় একটা প্রকাণ্ড কুকুর দৌড়িয়া লাফাইয়া আসিয়া সীপাহীর সম্মুখে দাঁড়াইল, লেজ নাড়িতে নাড়িতে সীপাহীর চারিদিকে লম্ফ ঝম্প আরম্ভ করিল, পেছনের দুই পায়ে দাঁড়াইয়া সীপাহীর কোমরে সম্মুখের দুই পা তুলিয়া দিল। সীপাহী মুখে অব্যক্ত শব্দ করিয়া কুকুরটাকে সরাইয়া, মাটিতে পড়িয়া ভৈরব রায়কে প্রণাম করিল। রায়মহাশয় অবাক্; নবাবের ফৌজ, তাঁহাকে প্রণাম করে! তিনি বলিলেন;—

"তুমি কে?"

"আজ্ঞা, আমি রামমোহন!"

"রামমোহন! তুই রামমোহন?" রায়মহাশয় রামমোহনের পাগড়ী-বেষ্টিত মাথায় হাত দিয়া বলিলেন—"তুই রামমোহন? কখন আসিলি?"

রামমোহন মাথার পাগড়ী খুলিয়া ফেলিল, পুনরায় রায়মহাশয়ের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল;—

"মুরশিদাবাদ হইতে বাবু সাহেব"—রামমোহন দাঁতে জিভ্ কাটিয়া বলিল;—"দাদাবাবু আমাকে বাড়ীতে পাঠাইয়াছেন। দুই পানসী ভরা মাল পত্র, সঙ্গে আমি আর চারিজন দেশোয়ালী পাহারা।—কেহই আমাকে চিনিতে পারে নাই। কেবল বাঘা আমাকে চিনিয়াছে।"—বাঘার দিকে চাহিয়া—"কেমন রে বাঘা?"

বাঘা তখন আনন্দে উৎফুল্ল, নৃত্যে উন্মত্ত!

মুরশিদাবাদ হইতে আরিন্দার মারফত হেমেন্দ্রলালের প্রথম পত্র পাইয়া রায়মহাশয় তাহাকে বাটীতে ফিরিয়া আসিতে লিখিয়াছিলেন

মহামায়া এবং কল্যাণীর কান্নাকাটীতে রায়মহাশয় দিবারাত্রি অস্থির থাকিতেন। বিশেষতঃ পিতৃমাতৃহীন বালককে তিরস্কার করিয়া তিনিই তো বাড়ী হইতে তাড়াইয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া রায়মহাশয় স্বতঃই সর্ব্বদা মর্ম্মপীড়িত থাকিতেন। হেমেন্দ্রলাল বাটীতে ফিরে নাই, কিন্তু শেষে যখন ক্রমে তাহার পত্র এবং তাহার বৈষয়িক উন্নতির সংবাদ আসিতে লাগিল, তখন সকলেই কতকটা শান্ত হইলেন। এতদিন শুধু পত্রে অথবা লোকমুখে সংবাদ পাইতেছিলেন, আজ হেমেন্দ্রলাল রামমোহনকে বাটীতে পাঠাইয়াছে!

মুহূর্ত্ত মধ্যে কথা বাড়ীময় প্রচার হইল। নবাবের ফৌজ নহে; নৌকাবোঝাই মালপত্র দেশোয়ালী বরকন্দাজ পাহারা লইয়া রামমোহন বাড়ীতে আসিয়াছে! ভিতর দেউড়ির দরজা খোলা হইল, দলে দলে লোক আসিয়া রামমোহনকে ঘিরিয়া ফেলিল। বৈঠক-খানার আঙ্গিনা হইতে চারিজন দেশোয়ালীও আসিল। উপস্থিত কথা শেষ হইতে না হইতে ভিতর বাড়ী হইতে সংবাদ আসিল, গৃহিণী ডাকিতেছেন, রামমোহনকে অন্দর মহলে যাইতে হইবে।

ভিতর আঙ্গিনায় বাড়ীর, পাড়ার বালক বালিকা বৃদ্ধা যুবতী একত্র হইয়াছে। গৃহিণী মহামায়া, পিসী রক্ষাকালী, নবদুর্গা বগলা বিশখা শ্যামা বামা বুঁচি ফেলী সকলে সেখানে উপস্থিত। রামমোহন সেখানে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই তাহার প্রতি শত প্রশ্ন হইল;—তুই রামমোহন! কবে আসিলি? কোথা হইতে আসিলি? নবাবের ফৌজ কোথায়? তুই ফৌজ সীপাই ন'স্!—ইত্যাদি, ইত্যাদি। রামমোহন সেই অবলাদগুলীর অবিশ্রাম প্রশ্নে ক্ষণকাল অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"রামা, কেমন আছিস্? হিমু কেমন আছে?—আমার কাছে আয়।"

রামমোহন তখন কোমরবন্দ খুলিয়া তলবারসহ দূরে নিক্ষেপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া মহামায়ার চরণে প্রণাম করিল। তখন মাথা উঠাইয়া সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে সকল দিকে চাহিয়া বারবার উপস্থিত রমণীমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল ;--

"দাদাবাবু খুব ভাল আছেন।"

মহাত্রাসে কল্যাণী নিজের ঘরে লুকাইয়াছিল, সংবাদ পাইয়া সেখানে আসিল এবং বিস্ফারিত নেত্রে বলিল ;—

"ওরে হতভাগা আবাগীর পুত, তুই ?"

রামমোহন জননীকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল ;—

"আমি তো তোমাকে ডাকিলাম, তুমি না শুনিয়াই দৌড় !"

"তুই যে হিন্দি-মিন্দি বকিলি, আমি ভাবিলাম, সীপাহী সন্তরিতে বুঝি আমাকে ধরিয়া ফেলিল !"

সুস্থদেহ বলিষ্ঠ পুত্রকে এতকাল পরে দেখিয়া কল্যাণীর মুখ হাসিময়, মাতৃহৃদয় উৎফুল্ল হইয়াছে। হাসিমুখে, সজল নেত্রে কল্যাণী বলিল ;—

"তুই যে তুই, সীপাহী ন'স্, তা আমাকে বলিলি না কেন ?"

চারিদিকে হাসির ফোয়ারা খুলিয়া গেল। এমন সময় লক্ষ্মীপ্রিয়া ঘর হইতে আঙ্গিনার কোণে আসিয়া কোল হইতে খোকাকে নামাইয়া দিলেন। কল্যাণী বলিল ;—

"রামা, ঐ যে খোকা।"

রামমোহন তখন সমস্ত প্রশ্ন ভুলিয়া গেল, দৌড়িয়া গিয়া একেবারে খোকাকে কাঁধে তুলিয়া লইল। খোকা হাসিবে কি কাঁদিবে, প্রথমে ঠিক করিতে পারিল না ; শেষে রামমোহনের লম্ফে ঝম্পে হাসিয়া ফেলিল।

——o——

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নৌকা হইতে বহু তৈজস পত্র গৃহে আনীত হইল। তামা কাঁসা, পিতল পাথর, শাল বানাত, ধুতি সাড়ী, চেলি গরদ, ঝাড় ফানুস, সিন্ধুক পেটারা, সোনা রূপা—বহু আসবাবপত্র মুরসিদাবাদ হইতে আসিয়াছে। রাশি রাশি জিনিস ভিতর আঙ্গিনায় আনীত হইল। রামমোহন একে একে সমস্ত জিনিস বাহির করিয়া সকলকে দেখাইতে লাগিল। পাড়ার, গ্রামের বহু স্ত্রীলোক পুরুষ আসিয়া সে সমস্ত দেখিতে লাগিল এবং তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল। হিমু বিদেশে যাইয়া উপার্জ্জন করিয়া এত জিনিস বাড়ীতে পাঠাইয়াছে, মহামায়া প্রফুল্লনেত্রে সমস্ত দেখিতে লাগিলেন। সংসারের সকল দুঃখ দূর হইল, সুদিন দেখা দিল। মহামায়ার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল উচ্ছ্বসিত, স্নেহে আর্দ্র হইয়া উঠিল। খোকা আসিয়া এটা কি? ওটা কি? ওটা কাহার জন্য?—কত কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল; সকল জিনিস যে তাহারই, মহামায়া তাহা বহুবিধ প্রকারে খোকাকে বুঝাইতে লাগিলেন।

রায়মহাশয় ভিতর বাড়ীতে আসিলে মহামায়া হাসিতে হাসিতে চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন;—

"ওগো, হিমু রূপার থালা বাসন পাঠাইয়াছে!"

সে সুখের কথার মর্ম্মভেদী অর্থ আর কেহ বুঝিতে পারিল না। কথা শুনিয়া সেই আনন্দের দিনে ভৈরব রায়ের চক্ষেও জল দেখা দিল।

রামমোহন সিন্ধুক খুলিয়া এক খানি পত্র এবং এক তাড়া কাগজ রায়মহাশয়কে দিল। পত্র হিমুর। গৃহমধ্যস্থা বধূর শ্রবণযোগ্য উচ্চৈ-স্বরে রায়মহাশয় সে পত্র মহামায়া নবদুর্গা কল্যাণী প্রভৃতি সকলকে

পড়িয়া শুনাইলেন। কাগজের তাড়ার মধ্যে পাইলেন কয়েকখানি সনদপত্র এবং দখলি পরওয়ানা, তাহাতে নেজামতি মোহর অঙ্কিত ছিল। জ্যেষ্ঠতাতের নামে তিন পরগণার জমিদারী স্বত্ব নবাব সরকারে বন্দোবস্ত করিয়া তাহার সনদ এবং দখলি পরওয়ানা হিমু বাড়ীতে পাঠাইয়াছে।

রায়পরিবারের এই সর্ব্বপ্রকার উন্নতির কথা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইল। আরও অনেক কথা প্রচারিত হইল। কয়েকদিন যাবৎ রামমোহনের আর অবসর রহিল না। ঘরে দুয়ারে, পথে ঘাটে যেখানে রামমোহন, সেই খানেই লোকের ভিড়। মুরশিদাবাদযাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত রামমোহন অনেক ঘটনা বিবৃত করিল। পথে খাঁসাহেব কাশেমআলির সহিত সাক্ষাৎ, ডাকাতের হস্ত হইতে সুরতবিবির উদ্ধার, হুগলীতে নবাবজাদার দরবার, ফৈজীবিবির প্রথম মুজরা, হেমচন্দ্রের প্রতি নবাবজাদার নির্ঘাত দণ্ডাজ্ঞা, পরিশেষে নবাবজাদার দরবারে হেমেন্দ্রের উন্নতি, আমীর ওমরাহ, সিপাহী বরকন্দাজ, বেরার রোসনাই মহরমের মিশিল—অনেক কথা রামমোহন বলিল। এই সকল কথা নানাপ্রকারে রূপান্তরিত হইয়া গ্রামে প্রচারিত হইল। গোপাল রামমোহনের নিকট শুনিল, ফেলি গোপালের নিকট শুনিল, রামা ফেলির নিকট শুনিল, শ্যামা রামার নিকট শুনিল। যে যাহা শুনিল, চড়াইয়া রঙদার করিয়া সে তাহা অন্যকে শুনাইল; তিলকে তাল করিল, তালকে তিল করিল।

শ্যামা একদিন লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বলিল;—

"বৌ তোর তো পাথরে পাঁচ কিল; সোয়ামির উপর নবাববেগমের সুনজর পড়িয়াছে।—এবার তোর মতির মালা হইবে।"

কথাগুলি লক্ষ্মীপ্রিয়ার বুকে শেল বিঁধিয়া দিল। লক্ষ্মীপ্রিয়া জানিত, শ্যামা দুচোখে তাহাকে দেখিতে পারে না; হেতু আর কিছু নহে—লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর সোহাগিনী স্ত্রী, শ্যামার চোখে তাহা সহিত না।

পরের সৌভাগ্যে অনেকের চিত্ত জ্বলিয়া যায়। লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিল ;—

"নবাববেগমের সুনজর আবার কি ?"

শ্যামা। "কেন, সে কথা কি শুনিস্ নাই ? পাড়ার সকলে শুনিয়াছে, দেশ ভরিয়া কথা রাষ্ট্র হইয়াছে ; তুই শুনিস্ নাই !—তোর কাছে কেই বা বলিবে ? আর বলিলেই বা তোর কি ক্ষতি ?—নবাবের বেগমই হউক, আর আমীরের মেয়েই হউক, বিদেশে প্রবাসে কে কি না করে ?"

এমন সময় বামা ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কিলো, শ্যামা, বৌয়ের সঙ্গে কি কথা হইতেছে ?"

শ্যামা। "কথা আর কি হইবে ?—এই যে শুনা যায়, হিমুদাদাকে নাকি নবাবের বেগম খুব অনুগ্রহ করেন। তুই কি শুনিস্ নাই ?"

যেমন শ্যামা, তেমনি বামা ! বামা বলিল ;—

"সে তো বেগম নয়, একটা নাচওয়ালী ; তা আর বেশী কি ?—আমি শুনিয়াছি, কোন্ এক আমিরের বাড়ীতে নাকি মেজ দাদার খুব গতিবিধি ; শুনিয়াছিস্ কি ?"

এমন সময় নবদুর্গা সেঘরে আসিল।

নব। "কি লো বামা ! শ্যামাও যে !—কি বলিতেছিলি ?"

বামা। "শ্যামা বলিতেছিল, মুরসিদাবাদে নবাববেগম নাকি মেজদাদাকে খুব ভালবাসে।"

শ্যামা। "বামা বলিতেছিল, সেখানে কোন্ একজন আমিরের মেয়ে নাকি হিমুদাদার খুব বাধ্য।"

নব। "যত রাজ্যের অনাসৃষ্টি কথা তোদের নিকট আসে। তোরা কি ভাটের মুখে এত কথা শুনিয়াছিস্ ? না আরিন্দার হাতে পত্র পাইয়াছিস্ ?"

বামা। "ভাটে আবার কি বলিবে ? রামাই নাকি সব কথা বলিয়াছে।"

শ্যামা। "আরিন্দার মারফত পত্র পাঠাইবার আমাদের কেহ বিদেশে নাই, আমরা পথ চাহিয়াও থাকি না। এই তো বামন বাড়ীতে বসিয়া ওপাড়ার ফেলি কত লোকের কাছে আরও কত কথা বলিল। তোমরা কাণে তুলো গুঁজিয়া বসিয়া থাকিবে, লোকে কি বলে, কি না বলে, কেমন করিয়া জানিবে?"

রাগ করিয়া শ্যামা আর বামা চলিয়া গেল। লক্ষ্মীপ্রিয়া মুখ নত করিয়া রহিল, তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। নবদুর্গা বলিল;—

"ওরা পরের ভাল দেখিতে পারে না; ওদের কথা শুনিস্?"

"আমি কি আর শুনিতে যাই? ওরা গায়ে পড়িয়া শুনাইতে আসে।"

"সব মিছা কথা।"

"সাঁচা মিছা ঈশ্বর জানেন।"

"সব মিছা। রামমোহনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিস্।"

"ছি! কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না।"

শ্বশুর শাশুড়ী রক্ষিত ভদ্র গৃহস্থ ঘরের কুলবধূ, স্বামী সম্বন্ধে কোথায় কে কি বলে, ইঙ্গিত প্রসঙ্গে কে কি জানায়, তাহার তদন্ত অনুসন্ধান করিবে? সাক্ষী প্রমাণ লইয়া স্বামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবে? ছি! বড় লজ্জার কথা।

নব। "তুই কেন অকারণ মনের মধ্যে সন্দেহ পুষিবি?"

লক্ষ্মী। "সন্দেহ?—আমার মনে সন্দেহের ঠাঁই নাই।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মনে করিতেছিল—তুমি স্বামী, প্রভু; আমি দাসী। তুমি তো আমার দেবতা!—দেবতার উপর সন্দেহ?

সেরাত্রিতে শয্যায় শয়ন করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া বুকের কাছে

খোকাকে টানিয়া লইয়া নীরবে চক্ষুর জলে বালিস ভিজাইতেছিল। সে তো নবদুর্গাকে বলিয়াছে—তাহার হৃদয়ে সন্দেহের ঠাঁই নাই। ঠাঁই যথার্থই নাই—তথাপি তাহার রমণী-হৃদয় আন্দোলিত হইয়াছে। কেন শ্যামা, বামা, কালিন্দী নানা কথা বলে? কেন তাহার আরাধ্য দেবতার গায়ে কলঙ্কক্ষেপ করে? করে, করুক; প্রাণেশ্বর, তুমি একবার ঘরে ফিরিয়া এস। অনেক দিন গিয়াছ, একবার শীঘ্র এস। তোমার পা দুখানি বুকে লইয়া বুক শীতল করিব; যদি এক বিন্দু অশ্রু পাদপদ্মে পড়ে, তবে, হে আমার প্রাণের দেবতা, অবলা জানিয়া ক্ষমা করিও।

রামমোহন অধিক দিন বাড়ীতে বিলম্ব করিল না। মহাসমারোহে খোকার হাতে-খড়ি হইল; রামমোহন তাহার পরেই মুরসিদাবাদ পুনর্যাত্রা করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

ফৈজীবিবির গৃহে আজ বড় আমোদ। সন্ধ্যার পরেই মজলিশ বসিয়াছে। আজ নবাবজাদা অতিরিক্ত নেশায় ভোর নহেন। মৃদু মন্দ গোলাপী নেশায় তাঁহার মুখ প্রফুল্ল, হৃদয় উদার, চক্ষু জ্যোতির্ম্ময়, বাক্য প্রসঙ্গ রহস্যপূর্ণ। ক্ষণে ক্ষণে ফৈজীর কলকণ্ঠের সঙ্গে নিজের স্বর মিশাইতেছেন, তবল ধরিয়া সঙ্গত করিতেছেন, সময় সময় সারঙ্গ লইয়া সন্তর্পণে ফৈজীর গীতানুসরণ করিতেছেন। নবাবজাদা সঙ্গীতে ওস্তাদ ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার সুরলয়বোধ মন্দ ছিল না; হেমেন্দ্রলালের শিষ্য হইবার পর হইতে সঙ্গীতে তাঁহার ব্যুৎপত্তিই হইতেছিল। হেমেন্দ্রলাল বাদক আর ফৈজী

গায়িকা। গীতবাদ্যে নবাবজাদা আজ বড় প্রীতি লাভ করিয়াছেন।

যেদিন ফৈজীবিবি ছদ্মবেশে হেমেন্দ্রলালের বাড়ীতে দেখা করিতে গিয়াছিল, সেই দিন হইতে হেমেন্দ্রের মনে শান্তি ছিল না। ফৈজী তাহার পর হইতে নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে ত্রুটী দেখায় নাই; গীতাবসরে প্রশ্নসূচক সেরূপ লালসাময় অপাঙ্গভঙ্গি আর করে নাই, সেরূপ ইঙ্গিতময় অঙ্গবিক্ষেপ অথবা গীতপদব্যপদেশে গুপ্ত মনোভাব বিজ্ঞাপনের চেষ্টাও করে নাই; কিন্তু অনেক সময় তাহার স্থির কাতর দৃষ্টি ও করুণ মৃদু কথায় হেমেন্দ্রের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছে। ফৈজী সেই হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিরাশ-করুণ প্রেম-গীতি নির্ব্বাচন করিয়াছে, গীত কথার ভাবার্থ যেন আরও করুণতর করিয়া ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছে। তাহার চাহনিতে সে প্রখর বিদ্যুৎ-বিভাস নাই, তাহাও স্নিগ্ধ মধুর হইয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া হেমেন্দ্রলাল বুঝিতে পারিয়াছিলেন, ফৈজী আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করে নাই, শুধু তাহার উদ্দাম চঞ্চলতা শমিত করিয়াছে মাত্র।

ফৈজী ইচ্ছা করিয়া বাঙ্গলা গান ধরিল;—

(সিন্ধু মধ্যমান)

সাধিলে কি হবে? বল, সই,
সাধিও না আর তারে।
না থাকিলে ভালবাসা,
সাধিলে কি হ'তে পারে?
ভাল যদি সে বাসিত, তবে কি দূরে থাকিত?
নয়নে নয়নে রাখে ভাল যেবা বাসে যারে!
সাধিলে কি হবে?—

সমাবসরে ফৈজী সারঙ্গী হেমেন্দ্রের দিকে চাহিল। সে চাহনিতে সে প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন ছিল না, তথাপি হেমেন্দ্রের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। ফৈজী সারঙ্গের সঙ্গে সুর মিলাইয়া পুনরায় ধরিল;—

না বুঝে অবোধ মন, চাহে তারি দরশন!
এই ভাবে এ জীবন যাবে কি সই? বো'লো তারে।
সাধিলে কি হবে?—

এবার হেমেন্দ্রলাল দৃঢ় মনে নবাবজাদার পার্শ্বস্থিত মণিমুক্তাখচিত গোলাবপাশের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন, ফৈজীর চকিত কাতর দৃষ্টি দেখিয়াও দেখিলেন না। ফৈজীর দিকে চাহিতেও তাঁহার সাহস হইল না। হেমেন্দ্রলাল বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। ফৈজীর অন্তরস্থ গুপ্ত তুষানল হঠাৎ উদ্দীপ্ত হুতাশনে পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে; সে হুতাশনে তো হেমেন্দ্রকে মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মরাশি করিতে পারে!

নবাবজাদার ইঙ্গিতে মজলিস শেষ হইলে হেমেন্দ্রলাল ফরাস ছাড়িয়া যোড়হস্তে নবাবজাদার দিকে চাহিয়া কিছু আরজ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। নবাবজাদা জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"ওস্তাদজী, কি প্রার্থনা?"

ফৈজী হাসিয়া বলিল;—"ওস্তাদজীর ঘি-ময়দার অভাব পড়িয়াছে!"

নবাব। "সত্য কি?"

হেমেন্দ্র। "জাঁহাপনার অসীম দয়াতে দাসের কোন অভাব নাই; তবে—তবে অনুমতি হইলে, একটি প্রার্থনা—"

ফৈজী। "বাবুসাহেব বোধ হয় আর একটি বিবাহ করিবেন, জাঁহাপনার কাছে তাহার অনুমতি চাহেন!"

ফৈজীর কথায় নবাবজাদা হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন:—

"বিবি বুঝি বড় খুবসুরত?"

হেমেন্দ্রলাল অপ্রতিভ হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নবাবজাদার নিকট বিদায় লইয়া দেশে যাওয়ার জন্য যে তাঁহার ইচ্ছা, ফৈজী-বিবি তাহা অনুমান করিয়াছে এবং তাহাতে বাধা দিবার জন্যই ফৈজী পরিহাসের সূচনা করিয়া আরজী হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা

করিতেছে। কিন্তু হেমেন্দ্র আজ আর থামিলেন না। কেমন করিয়া নবাবজাদার নিকট কথাটি উপাস্থত করিবেন, অনেক দিন হইতে তাহা ভাবিয়া আসিতেছেন, বিষম আশঙ্কায় তাঁহার মন উদ্বেগময়।

হেমেন্দ্রলাল বলিলেন ;—

"বহুদিন ঘর বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছি, জাঁহাপনা অনুমতি করিলে একবার—"

নবাবজাদা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার মুখ গম্ভীর হইল; তিনি বলিলেন ;—

"হেমেন্দ্র, এখন হইবে না ; আরও কতক দিন যাক্। হজরত নিজাম সাহেব পীড়িত ; রাজ্যে চারিদিকে প্রবল ঝড় তুফানের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। অনেক কথা, ক্রমে জানিতে পারিবে। এ সময় তোমাকে বিদায় দিতে পারি না। রাজধানীতে বিশ্বস্ত লোকের বড় অভাব।"

হেমেন্দ্রলাল আর কিছু বলিতে সাহস পাইলেন না, মাথা নোয়াইয়া দুই হাতে শেলাম করিলেন। ফৈজী আন্তরিক হর্ষ গোপন করিয়া পরিহাস ছলে বলিল ;—

"জাঁহাপনা, বাবুসাহেবের ভাল রুটীর কিছু ভাল বন্দোবস্ত হউক!"

নবাবজাদা হাসিয়া বলিলেন ;—"হেমেন্দ্র, তোমার আজকার বে-আদপীর উচিত দণ্ডাজ্ঞা কাল জানিতে পারিবে।"

ফৈজী। "প্রথম দিনের বে-আদপীতে তো বাবুসাহেবের গর্দ্দান মারা যাইতেছিল!"

নবাব। "সেবার যাহা হয় নাই, এবার তাহা হইবে!"

স্মিতমুখে নবাবজাদা স্বহস্তে গোলাবপাশ তুলিয়া সুবাসিত গোলাপ-জলে হেমেন্দ্রের মুখ মাথা সিঞ্চিত করিয়া দিলেন। হেমেন্দ্র ভূমিতে জানু পাতিয়া বসিয়া দরবারী কুর্ণিস করিলেন।

মজলিস ভঙ্গ হইল।

পরদিন অপরাহ্নে হেমেন্দ্রলাল এক নিজামতী পরওয়ানা প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে হেমেন্দ্রলালের নামে পরগণা আহম্মদপুর মহাল নাওয়ারা ময় মাল সায়েরী জমিদারীর সনদ।

রাজধানীতে হেমেন্দ্রলালের অনেক বন্ধু বান্ধব যুটিয়াছিল। নবাব-জাদার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত পাত্র বলিয়া অনেক আমীর ওমরাহ জমিদার রাজরাজড়া হেমেন্দ্রের বাড়ীতে যাতায়াত করিতেন। বহু লোক তাঁহার নিকট উপকৃত, বহুলোক উপকারপ্রত্যাশী ছিল। কিন্তু সেদিন আর হেমেন্দ্রের বৈঠকখানায় লোক ধরিল না। বহু মানী বহু ধনী হিন্দু মুসলমান অনেক লোক সেদিন হেমেন্দ্রের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

সুরতউন্নিসা নিজের শয়নকক্ষে পালঙ্কে শয়ন করিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিল, নিকটে মেজেতে বসিয়া পিয়ার চুলের দড়ি বুনিতেছিল। দড়ি বুনান তো হাত আর চোখের কাজ; কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় পূরা একদণ্ড কাল কথা না বলিয়া, উত্তর প্রত্যুত্তর না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকা কিংবা কাজ করা বাঁদী পিয়ারের অসাধ্য। দণ্ড বহিয়া যায় দেখিয়া পিয়ার আর থাকিতে পারিল না। পালঙ্কের পায়ায় বদ্ধ চুলের দড়ি রাখিয়া দিয়া বলিল;—

"তুমি পড়, আমি এখন যাই।"

সুরতের কোন সাড়া না পাইয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য হাতের পৈছা দ্বারা পালঙ্কের নিম্নস্থ রুপার পিকদানীতে আঘাত করিয়া পিয়ার পুনরায় বলিল ;—

"আমি যাই।"

বুকের উপর পুস্তক রাখিয়া সুরতউন্নিসা পড়িতেছিল, পুস্তক সরাইয়া মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"কি রে, পিয়ার ?"

"আমি এখন যাই।"

"যাবি ? কেন ? দড়ি কি শেষ হইয়াছে ?"

"না, এখনো একটুকু বাকী আছে।"

"তবে যাবি কেন ? শেষ কর্ না ; আমি একা পড়িয়া থাকিব ?"

"মানুষ কাছে থাকিলেই বা তোমার কি লাভ ? বই বুকে লইয়া পড়িয়া থাকিবে, মুখে একটি কথা নাই ; আমি তো আর বোবা নই !'

"রাগ করিয়াছিস্ !—বো'স, কেমন সুন্দর কথা পড়িতেছি, শুনিবি ?'

পিয়ার বসিল ; সুরতউন্নিসা বলিল ;—"আচ্ছা শোন্—

"ছালেহা দর্ কেছক এসঁয়া মান্দায়েম।
হাম করিলে নাক্শওয়াতা মান্দায়েম॥"

বুঝিতে পারিতেছিস্ ?"

"তোমার ও সকল হিজিবিজি আমি বুঝিতে পারি না। পড়িলে যাহা বুঝা যায় না, মানুষ তা পড়ে কেন ?"

"তুই বুঝিতে পারিস্ না বলিয়া কি তা মন্দ হইবে না কি ? শোন্ আমরা পাপী, অনেক দিন হইতে কুপ্রবৃত্তি ও শয়তানের সংসর্গে থাকিয়া নানা পাপ কার্য্য করিয়াছি, কত আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি—

"বেশ তোমার পাপের তো কামাই নাই !"

সুরত পড়িতে লাগিল ;—

"রে'জও সব আন্দর মাআছি বুগায়েম।
গাফেল আজ্ আমরো নওয়াহি বুগায়েম॥"

দিবারাত্রি আদেশ অমান্য করিয়াছি, আদেশ কিংবা নিষেধ মানি নাই—"

পিয়ারের মুখ হাসিময় হইয়া উঠিল, পিয়ার বলিল ;—

"তা ঠিক, তুমি দিন রাত ঘরে বসিয়া লোকের সর্ব্বনাশ চিন্তা কর! কোরান সরিফে যত আদেশ নিষেধ আছে, একটীও তুমি মানিয়া চল না! তোমার উপায় কি হইবে?—আচ্ছা, কোন কেতাবে কি দুটো, হাস পরিহাসের কথা নাই? সুখের কোন কথা নাই? কেতাব-ওয়ালারা কি পাপ, দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণার কথাই শুধু লেখে?"

"কেন, থাকিবে না কেন? ঈশ্বরের আদেশ মানিয়া চলিলে, তাঁহার চরণে মন থাকিলে কত সুখ হয়, তাঁহাকে ভাল বাসিলে চিত্তে যে কত আনন্দ হয়, পুস্তকে তাহাও লিখিয়াছে।"

"তা আছে, মানিয়া লইলাম। আচ্ছা, তা ছাড়া কি আর কোন সুখের কথা নাই? মানুষ কি মানুষকে ভাল বাসিবে না? তাহাতে কি কোন সুখ নাই?"

"ভালবাসিবে বৈ কি। সে ভালবাসায়ও সুখ আছে; কিন্তু সে কয় দিনের জন্য?"

"যত দিন এ দুনিয়ায় আছি।"

"সে কয় দিন?"

"দুদিনই হউক না কেন?—সে দুদিনই কেন পাপ পাপ, দুঃখ দুঃখ করিয়া কাটাইব? ঈশ্বর কি কেবল দুঃখের চিন্তা, পাপের ভয় করিবার জন্য মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন?—চক্ষু দিয়াছেন, ভাল জিনিসটি দেখিব না?—কাণ দিয়াছেন, দুটো মিষ্টি কথা শুনিব না?—"

সুরতের মুখ হাসিময় হইয়া উঠিল; সুরত বলিল ;—

"মুখ দিয়াছেন, দুটো ভাল মেঠাই খাইব না ?"

"তাতেই বা কি দোষ ?—না খাইয়া শুধু পরকালের চিন্তায় মানুষের দিন যায় না !"

"তা যায় না, জানি। দুটো মিষ্টি কথার জন্যও কি মানুষের প্রাণ পাগল হয় ?"

"হয় বৈ কি!—তোমার কচি-খুকি কাল কি এখনো গেল না ?"

"তুই তো নাকি প্রায় রোজই মিষ্টি কথা শুনিস্, সাদেকের ভাগ্যে এক দিনও একটী মিষ্টি কথা যোটে না কেন ?"

পিয়ারের মুখ রক্তাভ হইয়া উঠিল, সে বলিল ;—

"মিষ্টি কথার যোগ্য লোক হইলে তো যুটিবে। তা দেখি, তার ভাগ্যে যদি থাকে, তবে—তবে মিষ্টি কথা যুটিতেও পারে।"

"কবে যুটিবে, বল্। আমি বাবাকে বলিয়া উৎযোগ করি।"

"তা করিও। এখন আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ;—দুএকটা মিষ্টি কথা শুনিবার সাধ কি আর তোমার হয় না ?"

"কেন, তুই তো মিষ্টি ছাড়া কোন দিনও একটী কটু কথা আমাকে শুনাস্ নাই।"

"বটে ! দাসী বাঁদীর মিষ্টি কথায় যদি সাহজাদিদের সাধ মিটিত, তাহা হইলে ঘর সংসার ছাড়িয়া আমির ওমরাহের দল ফকিরী লইত। —তোমার চিত্ত কি ঈশ্বর পাষাণ দিয়া গড়িয়াছিলেন ? না, এখনো তুমি পাঁচ বৎসরের কচি খুকি রহিয়াছ ?"

"এইমাত্র তুই বলিলি, মিষ্টি কথার যোগ্য লোক কি সহজে মিলে ?"

"বাঁদী চেড়ীর ভাগ্যে সহজে না মিলিতে পারে, কিন্তু—" পিয়ার উঠিয়া দাঁড়াইল—"ওমুখের একটী মিষ্টি কথার জন্য জাহাঙ্গীর নগর, মুরসিদাবাদের কত ধনী, কত মানী, কত রূপবান আমীরউল-ওমরাহ তো চেষ্টা করিল, এখনো করিতেছে ; তাহাদের আকাজ্ক্ষা মিটে না কেন ?"

"কে ?—জাহাঙ্গীরনগরের মিরজা সাহেব ?"

"মিরজা সাহেবই যেন না হইল; সেখানে তো আরও অনেক আরজী পড়িয়াছিল। তার পর এখানেও প্রার্থীর অভাব নাই;—একে একে তুমি সকলকেই জবাব দিয়াছ!"

"সৈয়দ আহম্মদ খাঁসাহেব ?"

"খারাপ লোক ?—অমন সুচেহারার মানুষ আমার নজরে আর পড়ে নাই।"

"তুই-ই না বলিয়াছিলি, সৈয়দ সাহেবের চরিত্র—"

"অত বড় আমীরের পুত্র, অমন রূপবান পুরুষ, অমন—"

"পূর্ণিয়ার একরাম খাঁ ?"

"যাক্, সে সকল তো ছাড়িয়াই দিয়াছ; এখন যেটী—"

"পিয়ার, আমি তো তোকে বলিয়াছি, আমি—"

"এ দুনিয়ায় তোমার মনে ধরে, এমন লোক কি নাই ?"—সহসা পিয়ার সুরত-উন্নিসার হাত দুহাতে ধরিয়া ক্ষণকাল তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টে চাহিয়া বলিল—"একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ?"

"কি কথা ?"

"বাঁদীর কথা বলিয়া তুচ্ছ করিবে না ?"

সুরতও ক্ষণকালের জন্য পিয়ারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল;—"তুই বাঁদী ?" সুরত তখন জোর করিয়া পিয়ারকে টানিয়া নিজের পাশে পালঙ্কের উপর বসাইল।

"কি কথা, পিয়ার ?"

"মনের কথা বলিবে ? গোপন করিবে না ?"

"তুই জিজ্ঞাসা করিবি—তোর কাছে কিছু লুকাইব ?"

"আচ্ছা; সাহজাদা, নবাব, রাজা, রাজপুত্র, আমির ওমরাহ, হিন্দু কি মসলমান, এমন কেহ কি কখনো তোমার নজরে পড়িয়াছে, এমন

কাহারও কথা কখনো কি কাহারও মুখে শুনিয়াছ যে, তোমার—তোমার—"

"কি, পিয়ার ?"

"এমন কোন মানুষ, সুপুরুষ, সুন্দর, এমন কোন মানুষ কি তোমার—তোমার মনে লাগিয়াছে ?"

"তুই পাগল হইয়াছিস্ ?"

"আমি পাগল, না তুমি কাঠের পুতুল ? এই দুনিয়ায় তোমার মনের মত মানুষ কি ঈশ্বর এক জনও সৃষ্টি করেন নাই ?—এখন যে সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়াছে, সেটা কিসে মন্দ ? সৈয়দ মহম্মদ খাঁ তো যে সে লোক নন্; সহরে কে তাঁহার নাম না জানে ? নবাবজাদার ভগ্নীপতি, বৃদ্ধ নবাবের অতি আদরের পাত্র, নবীন বয়স; রূপে বল, গুণে বল, ধন মান মর্য্যাদায় দরবারে একজন প্রধান আমীর।"

"সব শুনিয়াছি।"

"শুনিয়াছ, তবে কেন রাজী হইবে না ?"

"আমি তো তোকে বলিয়াছি, আমি—

"আমি সেকথা শুনিব না; কেন আপত্তি করিতেছ ?"

"নবাবজাদীর বাঁদী হইব ?"

"নবাবজাদীর বাঁদী !"

"মৈমুন বিবির সতীন মৈমুনবিবির বাঁদী না হইয়া থাকিতে পারিবে ?"

"মৈমুনবিবির বাঁদী ? তোমার পৃথক মহল, পৃথক দাসী বাঁদী, তোমার গৃহে তুমি মুনিব থাকিবে। তুমি প্রভুর বাঁদী !"

"মৈমুনবিবি যে নবাবজাদার ভগ্নী।"

পিয়ার পালঙ্ক হইতে নামিয়া দাঁড়াইল, সুরতকেও নামাইল, তাহার হাত ধরিয়া দুই পদ অগ্রসর হইয়া দেয়ালে খাটান সুবৃহৎ আরসির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল ;—

"একবার চাহিয়া দেখ আরসির দিকে—"

সুরতউন্নিসা অতর্কিতচিত্তে আরসির দিকে চাহিল। নিজের শয়নকক্ষে বয়স্যা বাঁদীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে রত সুরতের স্বভাবমাধুর্য্যময়ী বিস্রস্ত-বেশা অসজ্জিতা মোহিনী মূর্ত্তি মুকুরে প্রতিবিম্বিত হইল। কি রূপ! কি রূপ! মুহূর্ত্তমধ্যে মুখ ফিরাইয়া সুরত লজ্জায় নতমুখী হইল, তাহার আরক্তগণ্ড রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। পিয়ার বলিল;—

"দেখিলে? স্বর্গের যে পরী, সেও তোমার নিকট দাঁড়াইলে লোকে তাহাকেও তোমার বাঁদী বলিয়া ধরিবে! নবাবজাদার বহিন্?—সৈয়দ সাহেবের যদি চোখ থাকে, মৈমুনবেগম এক দিনে সুরতবিবির বাঁদী হইবে।"

"বেগমসাহেবার অপরাধ?"

"দুনিয়ায় দুর্লভ সুরতবিবির রূপ।"

সুরত পিয়ারের স্কন্ধে দুই হাত রাখিয়া বলিল;—

"পিয়ার, তুই চিরকাল বলিস্—আমি বড় সুন্দরী—"

"শুধু আমি বলি?"

"শোন্, আমি কাল কুৎসিতা হইলে আমার এত কষ্ট হইত না।"

"রূপ কি তুচ্ছ করিবার জিনিস, সুরতবিবি? সংসারে কে না রূপ চায়? বাদসাহজাদী হইতে কাঙ্গাল গরিবের মেয়ে পর্য্যন্ত সকলেই রূপের কাঙ্গাল। ঘর সংসার করিতে হইবে, অচেনা অজানা লোককে আপনার করিতে হইবে,—রূপের বড় দরকার। সুন্দর ফুলটী দেখিলে মানুষের চক্ষু জুড়ায়, সুন্দরী স্ত্রী পাইলে কি পুরুষ সুখী হয় না? রূপ তুচ্ছ করিবার জিনিস নয়, সুরতবিবি।"

"কিন্তু আমি তো তোকে কতবার বলিয়াছি, আমি—"

"তোমার সে কথা আমি শুনিব না। তুমি এইমাত্র বলিতেছিলে, দিবারাত্রি আমরা কোরান সরিফের আদেশ অমান্য করিতেছি; তা ঠিক

কথা, বার বার তুমি আজ্ঞা-অমান্য করিতেছ।”

“আমি!”

“হাঁ তুমি। তোমার পিতা তোমার সম্বন্ধের যত প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, তুমি সকল গুলিই অস্বীকার করিয়াছ। এরূপ করা কি তোমার উচিত?”

“আমি—”

“এই যে এখন সৈয়দ মহম্মদখাঁর সঙ্গে প্রস্তাব চলিতেছে, এ প্রস্তাবেও তোমার অমতের কথা শুনিয়া তিনি ভারি বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি চেষ্টা ছাড়েন নাই। আজ সকালে সেই কথা ঠিক করিবার জন্য তিনি রোসনাবাদে গিয়াছেন। শুনিলাম তিনি এইখানেই তোমার বিবাহ দিবেন।—ঘর সংসারেও সুখ আছে। সাহজাদী হইতে বাঁদী চেড়ী পর্য্যন্ত এ দুনিয়ার সকলেই স্বামী পুত্র কন্যা আকাঙ্ক্ষা করে। তুমি কেন করিবে না? এই ধন দৌলত, এই রূপ যৌবন, এই শিক্ষা সহবত—সমস্ত নিষ্ফল করিবে?”

পিয়ার দেখিল, সুরতের আয়ত চক্ষু জলপূর্ণ হইয়া উঠিল। দুই এক করিয়া অশ্রুবিন্দু তাহার গণ্ড বহিয়া বক্ষে পড়িতে লাগিল।

পিয়ার বলিল;—“তুমি কাঁদিলে? সুরতবিবি, বাঁদীর কথায় কাঁদিলে?”

সুরত পালঙ্কের উপর শয্যায় বসিয়া পড়িল। পিয়ার তাহার পদপ্রান্তে বসিয়া তাহার প্রফুল্ল স্থলকমলতুল্য আরক্ত কোমল পাদুখানি আপনার ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া তাহাতে হাত বুলাইতে আরম্ভ করিল। আঁচলে চক্ষু মুছিয়া সুরত কহিল—“পিয়ার ওঠ, আমার কাছে আয়, এখানে বোস্।”

সুরত পিয়ারের হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের পার্শ্বে বসাইল; তাহার গলা দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল;—

"পিয়ার, আমার বড় বোন্ যদি কেহ থাকিত, তাহাকেও তোর চেয়ে অধিক ভাল বাসিতে পারিতাম কিনা, জানি না ; মনের কথা তার কাছে আরও খুলিয়া বলিতে পারিতাম কিনা বলিতে পারি না—"

"আমি তোমার বাঁদী, চিরদিনের দাসী ; আমার প্রতি তোমার অপার অনুগ্রহ।"

"শোন্, বিবাহে, ঘরসংসারে আমার প্রবৃত্তি নাই। এ দুনিয়ার মায়ায় বদ্ধ হইবার ইচ্ছা আমার নাই। বাবা কাবা সরিফে যাইবেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে যাইব। যতদিন তিনি বাঁচিবেন, তাহার পদসেবা করিব। অভাগিনীকে ফেলিয়া যদি তিনি স্বর্গে চলিয়া যান, ঈশ্বর আমার গতি করিবেন। পবিত্র ভূমি আরবদেশ, হজরতের পদধূলি সে দেশের মাটীতে মিশিয়া রহিয়াছে! পুণ্যভূমি মক্কাসরিফ, মানুষের পরিত্রাণের জন্য স্বয়ং প্রভু সেখানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! সে দেশের, সেই সহরের রাস্তায় পড়িয়া জীবন কাটাইব। মনে মনে যাহা ঠিক করিয়াছি, তোকে বলিলাম।"

পিয়ারের চক্ষেও জল দেখা দিল। ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, রাজা প্রজা, সাহজাদী বাঁদী—মানুষের চিত্ত একসুরে বাঁধা ; মানুষ মনুষ্যত্ব হারাইয়া চিত্ত বিকৃত করিয়া ফেলে, তাই তো সুরে লয় বাঁধে না!

পিয়ার বলিল ;—"সে আকাঙ্ক্ষা কাহার না হয়, সুরতবিবি? সে মাটিতে পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা কাহার না হয়?—কিন্তু তাহার সময় কি হইয়াছে? বৃদ্ধ পিতার ইচ্ছা, তুমি বিবাহ কর। কচি বয়সে ঘর সংসার ছাড়িয়া ফকিরী লওয়াই যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে এতদিন সৃষ্টিনাশ হইত।"

"আমি ছেলে মানুষ নই, এই বয়সেই আমি অনেক দেখিয়াছি। ঘর সংসারের বন্ধন বড় দৃঢ় বন্ধন। আমার দুর্ব্বল চিত্ত, একবার সে ফাঁস পরিলে আর ছাড়াইতে পারিব না ; আমার সে সাহস নাই।"

পিয়ার কিছুকাল নীরব হইয়া রহিল, সুরতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় সন্দেহ করিতে পারিল না ; শেষে বলিল ;—

"এখন উপায় কি ? বেগম সাহেবা এ প্রস্তাবে তোমার অমতের কথা তোমার বাবাকে জানাইয়াছিলেন, শুনিয়া তিনি ভারি বিরক্ত হইয়াছেন, রাগ করিয়াছেন। এবার কাবা সরিফে যাত্রার স্থির সংকল্প করিয়াছেন, তোমার বিবাহ না হইলে কাহার কাছে তোমাকে রাখিয়া যাইবেন ?"

"রাখিয়া যাইবেন ! কেন ? আমি সঙ্গে যাইব।"

"তাহা তাঁহার ইচ্ছা নহে,—"

এমন সময় দরজার নিকট আসিয়া নূতন বাঁদী হাবি ডাকিল ;—

"পিয়ারবিবি, ঘরে আছিস্ ? খাঁসাহেব ডাকিতেছেন, শীগ্‌গীর আয়।"

পিয়ার। "এই আসিতেছি।"

নূতন বাঁদী হাবি চলিয়া গেল।

সুরত বলিল ;—"পিয়ার, এ নূতন বাঁদীটা কেমন লোক রে ?'

"কেমন আবার হইবে ?—কাজ কর্ম্ম করে, ফরমাইস খাটে, মন্দ বোধ হয় না।"

"আমার তো ভাল বোধ হয় না। কেমন করিয়া যেন চাহিয়া থাকে, কেমন করিয়া যেন থামিয়া থামিয়া-চলে। একদিন কপা-টের আড়াল হইতে আমাদের কথা বার্ত্তা শুনিতেছিল, আমি দেখিয়াছি। আমার কোন কাজে উহাকে ফরমাইস্ দিস্‌নে।

"আমি এখনো মরি নাই, তোমার কাজ এখনি পরে করিবে কেন ?"

পিয়ার ঘর হইতে বাহির হইল। সুরতউন্নিসা শয্যায় পড়িয়া নিজের ভবিষ্যত চিন্তা করিতে লাগিল।

পঞ্চম ভাগ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে ; গৃহ আলোকিত হইয়াছে। গৃহকর্ত্রী স্বয়ং এটি, ওটি, অমনটী করিয়া আজ সে ঘরের শোভা সম্পাদন এবং আসবাবপত্রের বিশেষ শৃঙ্খলা করিয়াছেন। ফুল আর ফুলের মালা, আতর আর গোলাপের গন্ধে গৃহ পরিপূরিত, আমোদিত হইয়াছে।

শয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় তাকিয়া ঠেস দিয়া ফৈজী গান করিতেছিল ; বসন্তে পল্লবান্তরে লুক্কায়িত জীবনসঙ্গীকে নিকটে অহ্বান করিবার সময় পিকবধূ যেমন মধুর কণ্ঠে ডাকে, সেইরূপ মধুর কণ্ঠে ফৈজী মুহুর্মুহু গাহিতে ছিল ;—

(শ্রী—আড়া)

হিয়া মোরে কহেরে,—
পিয়া মিলব ঘর!
স্ফুরে, সখি, কলেবর,
প্রফুল্ল চিত মোর
বহুত দিনানা পর!
ফুল শেজ বিছাওত,
রতন দীপ জ্বার ;—
মিলব নাগর বর।

বাঁধ, সখি, কেশভার
যতনে গাঁথি মালা;
ত্যাগহুঁ কুসুম শর।
বাজাও, সখি, সুমঙ্গল,
গাওত শ্রীরাগ;—
পিয়া মিলব ঘর।

ফৈজী শয্যা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, চঞ্চল চরণে জানালার পাশে গেল। জানালা বন্ধ ছিল। ফাল্গুন মাস, শীত তখনও যায় নাই; কিন্তু হৃদয়ের উদ্দাম তাণ্ডবে ফৈজীর দেহস্থ রক্তস্রোত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, মস্তিষ্ক গরম হইয়াছিল, তাহার কপোলে,ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিয়াছিল। গোলাব সুবাসিত রুমালে মুখ মুছিয়া ফৈজী জানালা খুলিয়া ভাগীরথীর জলকণস্পর্শশীতল মৃদু বাতাসে সন্তপ্ত দেহ শীতল করিতে চাহিল। রাত্রি অধিক হয় নাই, কিন্তু অন্ধকার। নির্ম্মেঘ পরিষ্কার আকাশে শত গ্রহতারকা; আর ভাগীরথী বক্ষে তাহার প্রতিচ্ছায়া, তটবদ্ধ এবং সঞ্চরমান শত নৌকার দীপাবলী;—আকাশের এবং ভাগীরথী-বক্ষের বড় শোভা হইয়াছিল। ক্ষণকাল অন্যমনস্কে সেখানে দাঁড়াইয়া ফৈজী জানালা বন্ধ করিয়া ফিরিল। ঘরের যেখানে যে কিছু বিশৃঙ্খলার ভাব দেখিল, নিজ হাতে তাহা সারিতে লাগিল। সেপায়ার উপর ফুলের তোড়া গুলি ঠিক করিয়া বসাইল। কোমল মখমলে আবৃত কেদারা-গুলি সরাইয়া ফিরাইয়া রাখিল। পাশের ঘরে পালঙ্কের উপরিস্থিত চাঁদোয়ার ঝালর এক স্থানে কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত হইয়া ছিল, কেদারার উপর দাঁড়াইয়া তাহা যথাযোগ্য বিলম্বিত করিয়া দিল। গোলাপের কয়েকটা পাপড়ী একস্থানে পড়িয়া ছিল, এক একটী করিয়া সেগুলি তুলিয়া নিকটস্থ রূপার পিকদানীতে ফেলিয়া দিল; কতকটা গোলাপ-জল পিকদানীটাতে ঢালিয়া দিল; তখন সেই সুখসেবা, সজ্জিত গৃহের সমস্ত আসবাবের দিকে পুনরায় একবার চাহিয়া লইয়া ফৈজী ডাকিল;—

"মন্নু, মন্নু, এখানে আয়।"

বাঁদী মন্নু গৃহে প্রবেশ করিল। ফৈজী জিজ্ঞাসা করিল ;—

"তাঁহার সঙ্গে তোর কোথায় সাক্ষাৎ হইয়াছিল ?"

"একবার তো বলিয়াছি।"

"আবার বল্। সেখানে কি আর কেহ ছিল ?"

"বাসা বাড়ীতেই সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; সেখানে তখন আর কেহ ছিল না।"

"তিনি কি বলিলেন ?"

"আসিবেন, বলিলেন।"

"কখন আসিবেন ?"

"প্রথম প্রহরের নহবৎ বাজিয়া গেলে।"

"তাঁহাকে কেমন দেখিলি ?"

"কেমন আবার দেখিব ?"

"মুখ হাসি-হাসি দেখিলি ?"

"বেগমসাহেব, আরসিতে নিজের মুখের দিকে চাহিয়া দেখ।—ওচোখের কৃপাদৃষ্টিতে নবাবসাহেব গলিয়া যান !"

"তা যাক্। আঙ্গটী দিয়া আসিয়াছিস ?"

"কতবার বলিব ?—দিয়াছি। তিনি তাহা নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলে পরিতে চেষ্টা করিলেন, ঢুকিল না ; হাসিয়া তাকিয়ার নীচে রাখিলেন !"

ফয়েজউন্নিসা মৃদু হাসিল, চাঁপার কলিকার [illegible] গঠিত নিজের ক্ষীণ অঙ্গুলিদামের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিল ; বলিল ;—

"আচ্ছা তুই এখন যা।"

মন্নু চলিয়া গেল। ফৈজী সে গৃহে একাকিনী বসিয়া বসিয়া, হাঁটিয় হাঁটিয়া, ক্ষণে ক্ষণে চারু অঙ্গ শয্যায় নিঃসহ ঢালিয়া দিয়া চঞ্চলচ‍ে

সময় কাটাইতে লাগিল। রাত্রি বেশী হইল, প্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল; নিস্তব্ধ রজনীতে সাহানার মোহন আলাপে ফৈজীর হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠিল। ফৈজী শয্যা ছাড়িয়া দেয়ালে সংলগ্ন সুবৃহৎ মুকুরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল; তাহার আপাদমস্তক সর্ব্বাঙ্গ মুকুরে প্রতিফলিত হইল। একে তো সেই ক্ষীণাঙ্গের বিশ্ববিজয়িনী রূপমাধুরী, তাহাতে আবার রাজদুর্লভ মহার্ঘ মণিমুক্তার সজ্জা;—দেখিয়া দেখিয়া ফৈজীর মুখ স্মিত-প্রভাসিত হইয়া উঠিল।—না, এ ছড়ায় মানাইতেছে না!—ফৈজী গলার মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণহার খুলিয়া ফেলিল; হীরা চুনি পান্না মুক্তা জড়িত দীপ্তিমান সপ্তলহরী বাহির করিয়া গলায় পরিল। দীপালোকসম্পাতে তাহার চারুকণ্ঠে, উন্নতবক্ষে সপ্তলহরীর হীরা চুনি পান্না নানা বর্ণের জ্যোতি বিকাশ করিতে লাগিল। বড় গরম! শীতোপযোগী মূল্যবান ওড়না ফৈজী রাখিয়া দিল, কারুকার্য্য-করা সূক্ষ্ম ঢাকাই মলমলের গোলাপী ওড়না পরিল।—সময় হইল বুঝি?— না! পল দণ্ড হইল, দণ্ড প্রহর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল! ফৈজী মৃদুস্বরে গান ধরিল;—

(মালকোষ—সুরফাঁক্)

আজু, সখি কাঁহে পিয়া
অবহু না আওয়ে?
গগণ পটমে শোহে
সো শুক তারা!
চন্দ্রকা কাঁতি জ্যোতিহীন ভেই;
পরশে দহতি মোহে মোতিম হারা।
মঝু মন তাক লিয়ে
সোয়াথ না পাওয়ে,
অরস নিদয় সো হি;
ত্রিযামা ভোরা;—
কুসুমরাজী ফুটন্ত মধু হসতি,
মঝুহি নয়না বহে নিঝর ধারা!

"মন্নু তো ঠিক বুঝিয়া আসিয়াছে?—এতদিনে পাষাণ গলিয়াছে!"—ফৈজী পুনরায় মুকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আপনার দেহকান্তি দেখিতে লাগিল। অনিন্দ্যসুন্দর সে রূপ; দিল্লী, আগ্রা, মুর্শিদাবাদ,—অনেক রাজধানী, অনেক দুর্গ জয় করিয়াছে; সেই রূপ আজ বিনা মূল্যে স্বয়ং বিক্রীত হইতেছে! আর, একাল পর্য্যন্ত অজিত অজেয় যে হৃদয়, তাহাও সেই সঙ্গে স্বয়ং বিতরিত হইতেছে! এ বিক্রয়ে, এ বিতরণে ফৈজীর হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতেছিল। নিজের সামগ্রী পরকে দিয়াই তো সুখ; উপযুক্ত পাত্রে ধন রত্ন দিয়াই তো আনন্দ; পরের দত্ত সামগ্রী পাইয়া, দান গ্রহণ করিয়া আর মহত্ত্ব কোথায়? ফৈজী সেপায়ার উপরস্থিত সোণার ডিবা হইতে কর্পূরকস্তুরী-বাসিত পাণের খিলি লইয়া মুখে দিল। কি গৌর মুখমণ্ডল! কি স্ফুরদারক্ত গণ্ড! কি মসৃণ, স্বচ্ছ, কোমল গ্রীবাদেশ! তাহার স্বভাবরক্ত অধরোষ্ঠ আরও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। চর্ব্বিত তাম্বুলরস গলাধঃ হইবার সময় সেই গৌর মসৃণ গ্রীবাভাগ রক্তিমাভ করিয়া ফেলিল। ফৈজী রুমালে অধরপ্রান্ত মুছিয়া কবরী-বিলম্বিত কুসুমদাম যথাযোগ্য সন্নিবিষ্ট করিল।

এমন সময় কাহার মৃদুপদশব্দ যেন শুনা গেল। ফৈজী নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, চক্ষু ফিরাইয়া চাহিতে পারিল না; স্বভাব-বিদগ্ধার হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল।—আসিতেছেন! শতবার তো তিনি সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, তবে আজ কেন হৃদয়ের এ কম্পন? শেষে ফৈজী ফিরিয়া চাহিল, মৃদু পদবিক্ষেপে, স্মিতমুখে অগ্রসর হইল;—

"এত কাল পরে কি—"

ফৈজী হঠাৎ থামিয়া গেল, এক পদ পশ্চাৎ সরিল, চকিত স্বরে বলিল;—"তুমি কে?"

যে ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার নবীন বয়স, সুন্দর রূপ

বহুমূল্য পরিচ্ছদ। শুধু রূপের তুলনায় আকাঙ্ক্ষিতের অপেক্ষা ব্যক্তি কিঞ্চিন্মাত্রও হীন নহে। যুবক অগ্রসর হইল; ফৈজী আর একপদ পশ্চাৎ সরিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল;—

"কে তুমি?"

"তোমার গোলাম।"

পার্শ্ব হইতে এক খানা কেদারা সম্মুখে স্থাপন করিয়া ফৈজী আবার জিজ্ঞাসা করিল;—

"তুমি কে?"

"অনেক বার আমাকে দেখিয়াছ।"

"তোমাকে দেখিয়াছি?—কে তুমি?"

"সৈয়দ মহম্মদ খাঁ।"

"সৈয়দ মহম্মদ তো নবাবজাদার ভগ্নীপতি; এখানে কেন?"

"আমিই সৈয়দ মহম্মদ খাঁ—তোমার অনুগ্রহপ্রার্থী।"

"তুমি!—যাও, ঘর হইতে বাহির হও।"

"আমি—"

"যাও!"—ক্রোধে ফৈজীর সমস্ত দেহ কম্পিত হইতেছিল, বিশাল চক্ষু হইতে যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ছুটিতেছিল! ফৈজী আবার বলিল;—

"যাও, এই মুহূর্ত্তে বাহির হও।"

"আমার একটা কথা শুন—"

"তোমার কথা! নিমকহারাম, বেইমান, চোর! নবাব মহালের বাঁদী-পোষা কুকুর!—বাহির হও।"

দারুণ অপমানে ক্ষণকালের জন্য সৈয়দ মহম্মদের মুখ ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহার লুব্ধচিত্তে ফৈজীর লাবণ্যচ্ছটা অধিকতর প্রতিভাত হইল; সৈয়দ মুহূর্ত্তে অপমান ভুলিয়া গেল; জানু পাতিয়া বসিয়া ফৈজীর চরণস্পর্শের চেষ্টা করিল।

এমন সময় গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল; নবাবজাদা মিরজা মহম্মদ স্বয়ং সে গৃহে প্রবেশ করিলেন! ক্রোধান্ধ ফৈজী অথবা রূপমুগ্ধ সৈয়দ কেহই প্রকৃতিস্থ ছিল না। ক্ষণকালের জন্য কেহই নবাবজাদার অতর্কিত আগমন লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কিন্তু তন্মুহূর্ত্তেই উভয়ে দেখিল,—স্বয়ং নবাবজাদা!—নবাবজাদা কোষ হইতে তরবারী উন্মুক্ত করিতেছেন! সৈয়দ পশ্চাতের দ্বারাভিমুখে দৌড়িল। নবাবজাদার দ্রুতবিক্ষিপ্ত তরবারী তাহার শরীরে লাগিল কি না, জানা গেল না, কিন্তু কবাটের কোণে ঠেকিয়া দ্বিখণ্ডিত তরবারী ঝনাৎ শব্দে কক্ষতলে পড়িয়া গেল।

ফৈজী যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, সেই ভাবেই রহিল। নবাবজাদার সর্ব্ব শরীর কম্পিত হইতেছিল, তিনি অগ্রসর হইয়া বলিলেন;—

"পাপিয়সি, তোর কি প্রায়শ্চিত্ত?"

"আমার অপরাধ নাই, জাঁহাপনা! সৈয়দ চোরের ন্যায় ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল।"

"চোর না জার!"

"ধর্ম্ম সাক্ষী, আমি নির্দ্দোষী।"

"বেশ্যার আবার ধর্ম্ম! মুর্শিদাবাদ আসিয়া বেগম সাজিয়াছিস্! দিল্লীর চকের বেশ্যা তুই, এখনো তুই তাহাই আছিস্!"

ফৈজী অপমানে আত্মহারা হইল; যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে মনুষ্যমস্তক স্কন্ধচ্যুত হইত, সেই নবাবজাদার মুখের উপর বলিয়া ফেলিল;—

"জাঁহাপনা যথার্থই বলিয়াছেন, সামান্যা নাচওয়ালী তো চিরকাল বেশ্যা; আমার পক্ষে সে কথা আর নিন্দার বিষয় কি হইতে পারে? কিন্তু জাঁহাপনার মাতা কিংবা মাসীর সম্বন্ধে ওরূপ কথা গালি হইতে পারে!"

মুহূর্ত্তকালের জন্য নবাবজাদা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পর মুহূর্ত্তেই

এই নিদারুণ, ভয়ঙ্কর, মর্ম্মভেদী কথায় তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়
উঠিল। কোষে তরবারী ছিল না, তাই তৎক্ষণাৎ ফৈজীর মস্তক
দ্বিখণ্ডিত হইল না। শূন্য কোষ পরিত্যাগ করিয়া নবাবজাদা ফৈজী
মুখ লক্ষ্য করিয়া নিদারুণ মুষ্ঠ্যাঘাত করিলেন; ফৈজী পাশ কাটাই
দাঁড়াইল। তাহার কর্ণমূলে সামান্য আঘাত লাগিল, কিন্তু কর্ণসংস
মুক্তাজড়িত কর্ণভূষণ আঘাতবেগে ভূমিতে পড়িয়া গেল।

"হতভাগিনি, তোর শরীরে পদাঘাত করিয়া পদ কলঙ্কিত করিব ন
—রাত্রিভোরে ওমুখ কুকুর দিয়া খাওয়াইব।—না, তাহাতে তো
প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তিল তিল করিয়া তোর প্রাণ বাহির করিতে
হইবে,—রাত্রি প্রভাতে জীবন্তে তোর কবর হইবে!"

রক্তচক্ষে ফৈজীর দিকে বিষম বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নবাবজাদ
সে স্থান হইতে বেগে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সে রাত্রিতে কাশেম আলিখাঁ সাহেবের সঙ্গে হেমেন্দ্রলালের কথা হইতেছিল।

কাশেম। "ভবিষ্যত ভাল নহে, চারিদিকেই গোলযোগের লক্ষণ।"

হেমেন্দ্র। "তাহা তো দেখিতেছি; তবে আপনি যতদূর গুরুতর মনে করিতেছেন, ততদূর নাও হইতে পারে।"

"এক দিক হইতে গোলযোগের সূচনা হইলে তত গুরুতর মনে করিতাম না। নোয়াজেস মহম্মদের নিজের তেমন সাহস নাই, কিন্তু ঘেসেটী বেগমের অদম্য সাহস। যত কিছু তদ্বিরের কথা শুনিতে পাইতেছি, সমস্তই বেগমের চেষ্টায় হইতেছে। শুনিতেছি, রাজবল্লভ ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পরামর্শ চালাইতেছে। ওদিকে ইংরেজ জানে যে, নবাবজাদা তাহাদের পরম শত্রু। বৃদ্ধ-নবাব যে ভাবে যে কৌশলে ইংরেজদিগকে শাসনাধীনে রাখিয়াছেন নবাবজাদা তাহা পারিবেন না। সেপাহীর অধ্যক্ষগণ নবাবজাদার ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট। আমীর ওমরাহগণ, বিশেষতঃ হিন্দু রাজা জমিদারেরা নবাবজাদার অত্যাচারে মহাবিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শেঠগণ সর্ব্বদা সশঙ্ক। গদী প্রাপ্ত হইলে নবাজাদার অত্যাচার শতগুণে বৃদ্ধি পাইবে; ধনীর ধন, মানীর মান তখন রক্ষা করা দুর্ঘট হইয়া উঠিবে। সুবার সমস্ত লোক এখনি ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণিয়াতে সৈয়দ আহম্মদ ষড়যন্ত্র করিতেছে। চারিদিক হইতে বিপদ চাপিয়া আসিতেছে। বাঙ্গালার ভবিষ্যত বড় খারাপ; বৃদ্ধ নবাবের অভাব

হইলে বাঙ্গালা দেশে বিষম বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।”

“আজ বিশেষ করিয়া এ সকল বিষয়ের অবতারণা কেন করিতেছেন?”

“কেন করিতেছি, শুন। আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ যে জন্য চেষ্টা করিতেছি, জান। আমি আর তিষ্ঠিতে পারি না, এবৎসর আমি নিশ্চয়ই যাত্রা করিব। এ বৎসর না হইলে আমার ভাগ্যে আর হইবে না। আমার মন নিতান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কোন কার্য্যে মনোনিবেশ করিতে পারি না; রাত্রিতে নিদ্রা নাই। কেবল মনে হয়, কত দিনে সে পূণ্য ভূমি দর্শন করিয়া চক্ষু সার্থক করিব।”

“আপনি চলিয়া গেলে আমরা নিঃসহায়, নিরাশ্রয় হইব, কিন্তু ঈশ্বর আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুণ।”

“আমার বাসনা পূরণ পক্ষে এক বিষম প্রতিবন্ধক আছে।”

“প্রতিবন্ধক!”

“সুরতকে পাত্রস্থ করিতে পারিলাম না; তাহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব?”

“শুনিয়াছি, দিদিসাহেবা আপনার সঙ্গে মক্কা সরিফে যাইতে ইচ্ছা করেন।”

“তাহা হইবে না। কন্যা সঙ্গে থাকিলে আমার দুনিয়ার বন্ধন ঘুচিবে না; দিবা রাত্রি আমাকে কন্যার চিন্তায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে।—আমি শীঘ্রই সুরতের বিবাহ দিব।”

“শীঘ্রই দিদিসাহেবার বিবাহ হইবে, সে তো আনন্দের কথা। কোথায় ঠিক করিয়াছেন?”

“সৈয়দ আহম্মদখাঁর সহিত কথা হইতেছে।”

হেমেন্দ্র একটুকু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন;—

"পিয়ারের নিকট শুনিয়াছি, দিদি সাহেবা এ প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করেন নাই।"

"তাহার সম্মতি অসম্মতির অপেক্ষা আর করিব না। একাল পর্য্যন্ত যত সম্বন্ধ উপস্থিত করিয়াছি, কোনটীতেই তাহার সম্মতি বুঝিতে পারি নাই, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না।"

হেমেন্দ্রলাল চিত্তে ব্যথা পাইলেন। খাঁসাহেব কন্যাকে যে প্রাণের অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন, হেমেন্দ্রলাল তাহা জানিতেন। কিসে কন্যার সুখ হইবে, সংসারে খাঁসাহেবের যে একমাত্র তাহাই চিন্তার বিষয়, তাহাও হেমেন্দ্রলাল জানিতেন। কিন্তু আজ খাঁসাহেবের মনের গতি দেখিয়া হেমেন্দ্রলাল বড়ই ব্যথিত হইলেন। যে বিবাহে কন্যার অনিচ্ছা, পিতা তাহাকে সেই বিবাহেই প্রবৃত্ত করিতে কৃত-সংকল্প! হেমেন্দ্র বলিলেন;—

"সৈয়দের সঙ্গে বিবাহে দিদিসাহেবার অমত, অন্যত্র চেষ্টা করিলে হয় না?"

"আর কোথায় হইবে? আজ কতদিন যাবৎ চেষ্টা করিতেছি, কোথাও হইতেছে না। এবার আমি ঠিক করিয়াছি, এই খানেই করিব।—সাদেক, বেগমসাহেবাকে খবর দে, আমরা সাক্ষাৎ করিব।—হেমেন্দ্র, তুমিও চল, পিয়ারকেও ডাকাই; আজ সকলের সাক্ষাতে কথাবার্ত্তা ঠিক করিব।"

খাঁসাহেব উঠিলেন, হেমেন্দ্রলালও উঠিলেন। ভিতর বাড়ীর প্রথম অংশে অন্দরের বৈঠকখানা ঘর, হেমেন্দ্রলালকে লইয়া খাঁসাহেব সেই দিকে চলিলেন। এমন সময় রামমোহন সেখানে উপস্থিত হইল, তাহার সঙ্গে নবাবজাদার খাস দরবারের চোপদার। চোপদার সেলাম করিয়া নেজামতি পাঞ্জা দেখাইয়া বলিল;—

"হুজুরের খাস্ কামরায় এখনি হাজীর হইতে হইবে।"

হেমেন্দ্রলাল দাঁড়াইলেন; নেজামতি পাঞ্জার দিকে অবনত মস্তকে সেলাম জানাইয়া খাঁসাহেবকে বলিলেন;—

"নবাবজাদার তলপ, আমাকে এখনি যাইতে হইবে।"

কাশেম। "এত রাত্রিতে তলপ! আজ না নবাবজাদা নবাব-নিজাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছেন!"

চোপদার কহিল;—"যাইবার কথা ছিল, রওয়ানা হইয়াছিলেন, কিন্তু ফিরিয়া হীরাঝিলে আসিয়াছিলেন।"

হেমেন্দ্রলাল খাঁসাহেবকে সেলাম করিলেন।

খাঁসাহেব বলিলেন;—"যাও; আমি আজ রাত্রিতেই সব ঠিক করিব।"

হেমেন্দ্রলাল রামমোহন ও চোপদারকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

খাঁসাহেব অন্দর মহলের বৈঠকখানায় যাইয়া বসিলেন; সেখানে সরিফন বেগম উপস্থিত ছিলেন। পিয়ারও ছিল।

কাশেম। "সৈয়দ মহম্মদের সঙ্গে সুরতের সম্বন্ধ ঠিক করিতেছি; একমাস মধ্যে সুরতের বিবাহ দিব; তোমরা এখন হইতে তাহার উদ্যোগ কর।"

পিয়ার। "সেদিন সৈয়দ সাহেবের কথা তুলিয়াছিলাম,—"

কাশেম। "সুরত কি বলিল?"

পিয়ার। "সুরতবিবি আপনার সঙ্গে কাবা সরিফে যাইবেন।"

কাশেম। "তা এখন হইতে পারে না।—সৈয়দের কথায় কি বলিল?"

পিয়ার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আশু বিবাহে যে সুরত উন্নিসার ইচ্ছা নাই, পিতার সঙ্গে কাবা সরিফে যাইবারই যে তাহার ইচ্ছা, পিয়ার তাহা জানিত; কিন্তু খাঁসাহেবের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে সাহস পাইতেছিল না।

সরিফন। "সৈয়দ মহম্মদখাঁ রাজধানীর মধ্যে একজন অগ্রগণ্য আমীর। ধনসম্পত্তি, রূপগুণ, মানমর্য্যাদা—সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সুরতকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিয়াছিলি ?"

পিয়ার। "খুব বলিয়াছি ; কিন্তু বিবির আলাপে বুঝিলাম তাঁহার সম্পূর্ণ অমত।"

কাশেম। "যেখানেই উপস্থিত করি, সেইখানেই অমত! সুরত পাগল হইয়াছে ? আমি আর তাহার মতামতের দিকে চাহিব না। পিয়ার, সুরতকে এখানে ডাকিয়া আন্।"

সরিফন। "এখানে ডাকিয়া আনিয়া কি হইবে ?"

কাশেম। "কেন সে আপত্তি করে, শুনিব।—পিয়ার, এখনি তাহাকে লইয়া আয়।"

পিয়ার সেঘর হইতে বাহির হইল।

সরিফন। "সে বড় হইয়াছে ; সে রাজী না হইলে কেমন করিয়া তাহাকে একাজে প্রবৃত্ত করিবে ?"

খাঁসাহেবের সহিষ্ণুতা কমিয়া আসিতেছিল, তিনি বলিলেন ;—

"ছেলেমানুষ, ভবিষ্যৎ বুঝে না ; আমি যাহা ভাল বুঝি, তাহাই করিব।"

সরিফন। "সে আর এখন নিতান্ত ছেলেমানুষ নয় ; তাহার চিত্ত যে দিকে অগ্রসর হয় না, কেমন করিয়া তাহাকে —"

কাশেম। "আমি আর কোন কথা শুনিব না। সেদিনের বালিকা সে, কিসে তাহার ভাল হইবে, কিসে মন্দ হইবে, তার চেয়ে আমি তাহা ভাল বুঝি। তোমরা কোন আপত্তি করিও না। বছরের পর বছর যাইতেছে, আমি আর—"

সরিফন। "আর কয়েকটা দিন দেখ না কেন ? সৈয়দের সঙ্গে বিবাহে যদি সুরতের একান্তই অনিচ্ছা, অন্য কোন স্থানে চেষ্টা করিলে হয় না ?"

কাশেম। "না, আর কোন খানেই হইবে না, এইখানেই হইবে।"

খাঁসাহেব এই কথাগুলি এত দৃঢ়ভাবে বলিলেন, যে সরিফন বেগম চমকিত হইয়া উঠিলেন। যে কন্যা খাঁসাহেবের প্রাণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রিয়, আজ খাঁসাহেব তার মতের দিকে একবারে দৃষ্টি করিতেছেন না!

এমন সময় পিয়ারের সঙ্গে সুরত সেখানে উপস্থিত হইল। সেই সুন্দর মুর্ত্তি দেখিয়া খাঁসাহেবের চিত্ত স্নেহে উথলিয়া উঠিল, তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা বা বিচলিত হয়! একমাত্র সন্তান, মাতৃহীনা, দিনরাত্রি পিতৃ-সেবায় রত, ধীর, নম্র, কুসুমকোমল; সেই মায়ার পুতলীকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে—তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—যে লোকের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া যাইতে হইবে; এ জন্মে আর তাহার সহিত দেখা হইবে না; সাত সমুদ্রের অপর পারে, সুদূর আরবের মরুপ্রান্তরে বসিয়া এই স্নেহভিখারিণীর কচি মুখের কথা স্মরণ করিতে হইবে! খাঁসাহেবের চিত্ত আকুল হইয়া উঠিল।

পিতা গালিচার উপর পাতা পুরু গদীর উপর মছনদে বসিয়াছিলেন, কন্যা তাঁহার পদপ্রান্তে গালিচার উপর বসিল।

খাঁসাহেব স্নেহে কন্যার মস্তক স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"মা, সুরত, তোমার শরীর আজ কেমন আছে?"

সুরত। "আমি বেশ ভাল আছি, আমার কোন অসুখ নাই।"

খাঁসাহেব কেমন করিয়া প্রসঙ্গ তুলিবেন, কি বলিবেন, ঠিক করিতে পারিতেছেন না; শেষে বলিলেন;—"সুরত, তুমি অনেক দিন হইতে জান,—আমি—আমি প্রাচীন হইয়াছি—সংসারে আবদ্ধ থাকিতে আমার আর ইচ্ছা নাই।—আমি শীঘ্রই কাবা সরিফে যাত্রা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি—"

খাঁসাহেবের বক্তব্য শেষ হইল না, আরও যেন কি বলিবেন। কন্যা

মায়ামুগ্ধনেত্রে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। পিতা পুনরায় আরম্ভ করিলেন ;—"ঈশ্বর যদি আশীর্ব্বাদ করেন, তবে এবার আমি যাত্রা করিব।—কিন্তু, মা, আমি এক বিপদে পড়িয়াছি।"

কন্যা চকিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিল ;—"বিপদ!—কি বিপদ, বাবা?"

পিতা। "তোমাকে কোথায়, কাহার কাছে রাখিয়া যাইব।"

কন্যা। "আমাকে রাখিয়া যাইবেন! কেন? আমি সঙ্গে যাইব।"

পিতার কণ্ঠ বাধ বাধ হইতেছিল, তিনি বলিলেন ;—

"তোমার যাইবার সময় হয় নাই, যখন উপযুক্ত সময় হইবে, তখন যাইবে।—তুমি বালিকা; শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, লোকে সংসারধর্ম্ম করিবে, ঘর গৃহস্থালী করিবে, পরে যখন সময় হইবে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া নিবিষ্টচিত্তে পরমার্থচিন্তার জন্য সেই পবিত্র ধামে যাইবে।—তোমার সে সময় এখনো আসে নাই।"

সুব্রত কাঁদিয়া ফেলিল; কাঁদিয়া পিতার পদতলে পড়িয়া সেই আরাধ্য পদ চুম্বন করিল; দরবিগলিতঅশ্রুবর্ষী চক্ষে পিতার দিকে চাহিয়া বলিল ;—

"আমাকে ফেলিয়া যাইবেন না, আমি সঙ্গে যাইব, এই পদ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব।"

পিতার চক্ষু অশ্রুপরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন ;—

"মা, মা, বৃদ্ধের আকাঙ্ক্ষা; বাধা দিও না। তোমার সম্বন্ধে যাহা যাহা ঠিক করিয়াছি তাহা তোমার দিদিমা এবং পিয়ারকে বলিয়াছি ;—সংসারে তুমি ধনধান্যে স্বামীপুত্রে সুখী হইবে।"

অবদ্ধকেশপাশযুক্ত ক্ষুদ্র মস্তক পিতার পদতলে বিলুণ্ঠিত করিয়া সুব্রত পুনরায় কাঁদিল। খাঁসাহেবের চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল,

বেগবতী স্রোতস্বিনীর সম্মুখে বালির বাঁধের ন্যায় তাঁহার একদেশদর্শী সঙ্কল্প অপরিমেয় স্নেহস্রোতে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল। কন্যার মস্তক পুনরায় স্পর্শ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া পিতা সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সরিফন বেগম অশ্রুমুখী স্বুরতকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন।

সেরাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে স্বুরতউন্নিসা পালঙ্কে বসিয়া পিয়ারকে কাছে ডাকিল। সরিফন বেগম কত বুঝাইয়াছেন, পিয়ার কত বুঝাইয়াছে, কিন্তু তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উদ্বেলিত, মথিত হইতেছিল। এত কালের আকাঙ্ক্ষা—পিতার সঙ্গে সেই দুর্লভ, দুর্গম পবিত্র ভূমিতে যাইবে; সংসারের মায়ামোহে আবদ্ধ হইবে না, পিতার চরণসেবা করিয়া আর পরম পিতার চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া জীবন কাটাইবে;—কিছুই হইবে না? দুশ্ছেদ্য, অকাট্য শৃঙ্খলে এখন হইতেই আজীবন বদ্ধ থাকিতে হইবে? মৈমুন বেগম! সৈয়দ!—স্বুরতের আপাদ-মস্তক সমস্ত দেহ কাঁপিয়া উঠিল।

পিয়ার কাছে আসিয়া তাহার পার্শ্বেই বসিল। অতি যত্নে তাহার দুখানি হাত ধরিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, স্বুরতের সেই সুন্দর মুখ বিবর্ণ মলিন হইয়াছে, সেই স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রশান্ত চক্ষু ম্লান, অশ্রুভারপরিনম্রই রহিয়াছে, তাহার আরক্ত ওষ্ঠাধর কাঁপিতেছে! পিয়ার বলিল;—

"কেন কাঁদিতেছ? পিতা তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন না, কিন্তু যাহাতে তুমি সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবে তাহার ব্যবস্থা তো করিয়া যাইতেছেন।"

"কি ব্যবস্থা?—সৈয়দসাহেবের অন্তঃপুরে?"

"স্বয়ং নবাবজাদী সেখানে যাইতে আপত্তি করেন নাই, তুমি কেন এত আপত্তি, এত ভয় করিবে?"

"সংসারে সকল মানুষের রুচি কি এক প্রকার?—বাবা সঙ্গে লইয়া যাইতে ইচ্ছা না করেন, অনুমতি করুন, আমি ভাগীরথীর জলে আত্ম বিসর্জ্জন করি।"

"সে কি কথা, সুরতবিবি? তিনি শুনিলে কি ভাবিবেন?—এখনো সময় আছে, তুমি অধীর হইও না।"

"অধীর হইব না!—কি ভরসা আছে?"

"মানুষ সমুদ্রে পড়িলেও ভরসা ছাড়ে না।—আমি রাত্রি প্রভাতে পুনরায় বাবুসাহেবের নিকট যাইব।"

"ভাইসাহেব! ভাইসাহেব আর কি করিবেন?"

"বাবুসাহেবের কথা বাবা সহজে ঠেলিতে পারিবেন না।"

"তিনি তো চেষ্টা করিয়াছেন, আর কেন?"

"আমি আরও একবার চেষ্টা করিব। তুমি স্থির হও, ঈশ্বর কি একবার মুখ তুলিয়া চাহিবেন না?"

সুরত দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িল;—"জগদীশ্বর!"

পিয়ার। "তুমি বাবুসাহেবের সঙ্গে কাল একবার দেখা করিবে?"

সুরত। "কেন?"

"তোমার মনের ভাব স্পষ্ট করিয়া তাঁহাকে বলিবে; তিনি প্রাণপণে তোমার হিতচেষ্টা করিবেন।"

"না, পিয়ার! বিবাহে আমার অনিচ্ছা, ভাইসাহেবকে তাহা কেমন করিয়া জানাইব?"

"আচ্ছা, আমিই কাল দেখা করিব।"

তখন রাত্রি আর অধিক নাই। পিয়ার অনেক বলিয়া কহিয়া সুরতকে শয়ান করাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রভাতের অধিক বিলম্ব নাই।

সারারাত্রি ফৈজী সেই শূন্যগৃহে একাকিনী কাটাইয়াছে। বাহির ফটকে যে অস্ত্রধারী নূতন সান্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছে, ভিতর দরজায় যে নূতন প্রহরী বসিয়াছে, গৃহের দ্বারে যে অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর বিকটাকার মূক বধির হাবসী খোজা বসিয়াছে, ফৈজী তাহা দেখিয়াও দেখে নাই; দাসী বাঁদী যে কেহই নাই, ফৈজী তাহা লক্ষ্য করে নাই; রাত্রি যে প্রভাত হইবার বিলম্ব নাই, ফৈজী তাহাও বুঝিতে পারে নাই। সন্ধ্যা হইতে অতিযত্নে সেই কমনীয় দেহ যে হীরা মণিমুক্তা রত্নালঙ্কারে, যে মহার্ঘ পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়াছে,—সে রত্নালঙ্কার, সে মহামূল্য বেশভূষা এখনো সে দেহে তেমনি শোভা পাইতেছিল; ফৈজী অঙ্গ হইতে তাহার কোনটী সরায় নাই। নবাবজাদার হঠাৎ আগমনে—সেই লোমহর্ষণ ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎ, নির্ঘাত দণ্ড এবং দণ্ডাজ্ঞা প্রদান কালে সে বেশ-ভূষা যেখানে যেটুকু বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, ফৈজী তাহা আর পুনর্ব্বিন্যস্ত করে নাই। তাহার বামকর্ণবিচ্যুত দীপ্তিমান্ ঝুম্‌কা ভূমিতলে তেমনি পড়িয়া রহিয়াছে, ক্ষত কর্ণপ্রান্ত হইতে যে দুই চারি বিন্দু রক্ত অংস-সংন্যস্ত ওড়নায় পড়িয়াছিল তাহা শুখাইয়া গিয়াছে, তাহার কলঙ্কলেখা স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে। গৃহস্থ দীপমালা তেমনি জ্বলিতেছে। ফুল আর ফুলের মালা, আতর আর গোলাবের গন্ধে গৃহ তেমনি আমোদিত রহিয়াছে। সেপায়ার উপর গোলাবপাশ, আতরদান, পাণের বাটা তেমনি রহিয়াছে। তাহার পার্শ্বে সুকোমল কেদারায় নিশ্চল ফৈজী গণ্ডে হাত দিয়া চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া রহিয়াছে। চক্ষু নিস্পন্দ। সেই আয়ত

চক্ষুর স্বাভাবিক ঈষদারক্ত ক্ষেত্র আরও যেন রক্তিম হইয়াছে, কৃষ্ণোজ্জ্বল তারকা আরও যেন উজ্জ্বল হইয়াছে।

নীরবে, নতমুখে হেমেন্দ্রলাল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ফৈজী দ্বারের দিকে চাহিয়া ছিল, হেমেন্দ্রলাল যে গৃহে প্রবেশ করিলেন তাহা দেখিয়াও দেখিল না। হেমেন্দ্রলাল অগ্রসর হইলেন, ফৈজী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, একভাবে নিস্পন্দ অবিচলিতনেত্রে চাহিয়া রহিল। হেমেন্দ্র আরও অগ্রসর হইলেন, ফৈজীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন বা বুঝি ফৈজীর চৈতন্য হইল, তখন বা বুঝি ফৈজী তাহাকে চিনিতে পারিল। হেমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়াই ফৈজী কেদারা ছাড়িয়া দাঁড়াইল, দাঁড়াইয়া আবার ক্ষণকাল হেমেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; শেষে চকিতের ন্যায় বলিল ;—

"কি! হেমেন্দ্রলাল?—হেমেন্দ্রলাল আসিয়াছ! সেই তুমি আসিলে, এত বিলম্ব কেন করিলে? প্রহরের নহবত তো অনেক ক্ষণ বাজিয়াছে!"

হেমেন্দ্রলাল কি বলিবেন ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না; তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল। ফৈজী বলিল ;—

"কেন এত বিলম্ব করিলে? তোমার আশায় আমি সারারাত জাগিয়া কাটাইয়াছি! মন্নুকে বলিয়া দিয়াছিলে, তুমি প্রথম প্রহরের নহবত বাজিলেই আসিবে!"

হেমেন্দ্রলাল কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; বলিলেন ;—

"মন্নুকে বলিয়াছিলাম! মন্নুকে তো আমি কিছুই বলি নাই!"

ফৈজী। "দাঁড়াইয়া রহিলে কেন, হেমেন্দ্র?—ব'সো। রাগ করিয়াছ, হেমেন্দ্রলাল?—একটা গীত শুনিবে?"

হেমেন্দ্রলাল দেখিলেন, ফৈজীর চিত্ত অব্যবস্থিত হইয়াছে; একি উন্মাদের লক্ষণ? হেমেন্দ্রের হৃদয় মথিত হইতে লাগিল।

ফৈজী গুণ্ গুণ্ করিয়া গান ধরিল ;—

"এৎনে মিনতি মোরি, হামারি রাজপিয়রওয়া,—

সুন্দর পিয়রওয়া।"

হেমেন্দ্রলাল আরও একটুকু অগ্রসর হইলেন। হেমেন্দ্রের পশ্চাতে দুই জন খোজা ছিল—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার। তাহাদের বিকট মুখে অস্বাভাবিক ভয়াবহ হাসি ; এক হাতে তরবারী, অপর হাতে শৃঙ্খল। ফৈজী এতক্ষণ তাহাদিগকে লক্ষ্য করে নাই, এখন দেখিতে পাইল ; দেখিয়া তাহার সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। অতিভয়ে ফৈজী চীৎকার করিয়া জড় সড় গাত্রে হেমেন্দ্রকে প্রায় জড়াইয়া ধরিল ; আবেগের সহিত বলিল ;—

"হেমেন্দ্র, নবাবজাদার আদেশ পালন করিতে আসিয়াছ! আমি [illegible] ; কিন্তু ইহারা কেন?—বারণ কর ; ইহারা আমাকে ছুঁইবে?"

হেমেন্দ্রলাল ফৈজীকে বসিবার ইঙ্গিত করিলেন। ফৈজী হাত দিয়া খোজাদিগকে দেখাইয়া দিল, তাহার আপাদ মস্তক কম্পিত হইতেছিল।

সেকালের বাদসাহ, নবাব, এমন কি—অনেক আমীর ওমরাহের অন্তঃপুরে প্রহরীর কার্য্যে খোজা নিযুক্ত থাকিত। এই খোজাদিগের মধ্যে আবার এক দল ছিল, তাহার প্রায় অধিকাংশই কাফ্রী—বিকটাকার, লম্বিত-অধর, উচ্চ-ওষ্ঠ, বিকটদন্ত ; তাহাদের মাথার চুল কোঁকড়া, চিবুকের অস্থি উচ্চ, চক্ষু ক্ষুদ্র, ললাট নিম্ন, নাসিকা চাপা, —আজন্ম মূক বধির। দাস ব্যবসায়ীরা অতি অধিক মূল্যে ইহাদিগকে বিক্রয় করিত। দাসী বাঁদী এবং অনেক অন্তঃপুরিকার শারীরিক দণ্ড বিধান ইহাদের দ্বারা নির্ব্বাহ হইত, কিন্তু মূখ বধির বিধায় ইহারা কাহারও নিকট কোন বিষয় প্রকাশ করিতে পারিত না। নিতান্ত

নৃশংসপ্রকৃতি এই সকল খোজার শান্তমূর্ত্তি দেখিলেও লোকের ভয়-সঞ্চার হইত, মুনিবের ইঙ্গিতে যখন ইহারা কোন অপরাধিনীর দণ্ড বিধানে অগ্রসর হইত, তখন ইহাদের বীভৎস রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়াই তাহার মূর্চ্ছা হইত।

হেমেন্দ্রলাল খোজাদিগকে ঘরের বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিলেন, তাহারা চলিয়া গেল। অতিভয়ে ফৈজীর চিত্ত প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। ফৈজী কেদারায় বসিয়া পড়িল; হেমেন্দ্র দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ফৈজী। "ব'সো, হেমেন্দ্র; রাত্রি ভোর হয় নাই; ভোর হইলেই তো রাজাজ্ঞা পালন করিবে?—ততক্ষণ ব'সো।"

নিদারুণ দণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সময়ও নিকট হইতেছে; কিন্তু ফৈজীর কথায় কি আচরণে তাহার চিত্তের চাঞ্চল্য, ভয়ের উদ্বেগ কিছুই প্রকাশ পাইতেছে না। ফৈজীর কথার স্বর স্বভাবতঃই মধুর, কোমল; এখন যেন আরও মধুর, আরও কোমল হইয়াছে।

হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন;—"ফৈজীবিবি, কি হইয়াছে?"

"আমার জীয়ন্তে কবরের আদেশ হইয়াছে।"

"—আর তুমি এমন করিয়া স্থিরচিত্তে বসিয়া আছ?"

"রক্ষা নাই। বহু পাপের ফলভোগ করিব।"

হেমেন্দ্রের স্বরও ক্ষীণ কোমল হইয়া আসিতেছিল; হেমেন্দ্র বলিলেন;—

"সংসারে আমরা সকলেই পাপী;—কিন্তু—কিন্তু আজ কেন এ নিদারুণ আদেশ হইল?"

"শুনিয়া কি হইবে? —সামান্য নাচওয়ালী আমি, আমার কথায় বিশ্বাস করিবে?"

"ফৈজীবিবি, তোমার কথায় আমার অবিশ্বাস নাই। আমার মনে হইতেছে, তুমি নিরপরাধী।"

এতক্ষণে ফৈজীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। ফৈজী বলিল ;—

"সামান্যা নাচওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস কর?—নবাবজাদা বলিয়াছেন, নাচওয়ালী চিরকাল—চিরকাল—, যাক্, সে কথায় আর কি কাজ? তুমি রাজাদেশ পালন করিতে আসিয়াছ, শুনিয়া কি করিবে?"

"নবাবজাদা তোমাকে চিনিতে পারেন নাই, আমি তোমাকে চিনি।"

ফৈজীর চক্ষু বুঝি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিতেছিল; ওড়নার অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল ;—

"হেমেন্দ্র, তুমি কি মন্নুকে বলিয়াদিয়াছিলে—আজ রাত্রিতে তুমি—তুমি আমার গৃহে আসিবে?"

হেমেন্দ্র বিস্মিত হইলেন, এ কি কথা! ফৈজী ইতিপূর্ব্বেও একবার এই প্রশ্ন করিয়াছে!—হেমেন্দ্র বলিলেন ;—

"তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। মন্নুর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নাই; আমি তাহাকে কিছুই বলি নাই। কেন এ প্রশ্ন করিতেছ?"

ফৈজী ললাটে করাঘাত করিয়া বলিল ;—

"পাপীয়সী আমি, কেন এমন সৌভাগ্যে বিশ্বাস করিয়াছিলাম!"

"ফৈজীবিবি, কি সৌভাগ্যের কথা বলিতেছ?"

"সে কথায় আর কি কাজ, হেমেন্দ্র?"

"বল।"

"দেখ, জ্ঞানোদয় কাল হইতে আমি ঘোর পাপীয়সী। আমাকে কেহ সুশিক্ষা দেয় নাই, কেহই আমাকে পাপপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করে নাই। এই বয়সে আমি দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ—বহুস্থানে বেড়াইয়াছি, বহু পাপ করিয়াছি। কিন্তু মুরসিদাবাদ আসিয়াই আমি আত্মহারা হইয়াছি। কেন তুমি আমাকে তোমার দাসী বাঁদীর মধ্যে একজন করিয়া রাখিলে না? তোমার শিশু পুত্র আছে,

তাহাকে কোলে করিয়া, তাহার পরিচর্য্যা করিয়া দিন কাটাইতাম!—তোমার স্ত্রী আছে, আমি তাহার উচ্ছিষ্টভোজী হইয়া অস্পৃশ্যা দাসীর ন্যায় তোমার দুয়ারে দিন কাটাইতাম!—হেমেন্দ্র, সে সৌভাগ্যের অধিকারী হইবার অদৃষ্টও আমার ছিল না!"

হেমেন্দ্রের চিত্ত দগ্ধ হইতেছিল; তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ফৈজী বলিতে লাগিল;—"আজ আর কিছুই গোপন রাখিব না। শুন, প্রথমে তোমাকে দেখিয়া তোমার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছিলাম; তাহার পর তোমার গুণে, গীতবাদ্যে অপূর্ব্ব কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম; তাহার পর—হেমেন্দ্রলাল, বিশ্বাস করিও, তাহার পর তোমার জীবনে, তোমার সত্যনিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি দেখিয়া—"

"ফৈজীবিবি! ফৈজীবিবি! কাহার প্রশংসা করিতেছ?—সহস্র দোষে দোষী আমি! তুমি স্ত্রীলোক, তুমি তাহা কি করিয়া জানিবে?"

"ভ্রম, বড় ভ্রম!—স্ত্রীলোকেই পুরুষকে যথার্থ চিনে। আমি এতদিন, তোমাকে দেখিতেছি, প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে তোমার কথা ভাবি!—তোমাকে আমি চিনিয়াছি।—রূপ দেখিয়া তোমাকে আত্মসাৎ করিবার জন্য পাগল হই; গুণ দেখিয়া তোমার সহচরী হইবার জন্য ব্যাকুল হই; তার পর তোমাকে চিনিতে পারিয়া—হেমেন্দ্র, আমি সামান্য নাচওয়ালী, কিন্তু তুমি বলিয়াছ, আমার কথার তুমি বিশ্বাস কর, তাই আজ বলিতেছি—যখন তোমাকে চিনিতে পারিলাম, সেই হইতে আমার আমিত্ব গেল, আমি আর তোমাকে চাহি নাই, তোমার হইতে চাহিয়াছি,—তোমার অনুচর হইয়া দাসী বাঁদী হইয়া দিন কাটাইবার প্রার্থনা আমার অন্তরে জাগিয়াছে। আমি অভাগিনী, সে প্রার্থনা আমার সফল হইল না!"

ফৈজী পরিষ্কার মৃদু স্বরে কথা বলিতেছিল; কিন্তু হেমেন্দ্রের আর দৃষ্টিশক্তি রহিল না; চক্ষুর জলে তাহার গণ্ড বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছিল।

ফৈজী আবার বলিতে লাগিল ;—

"দুর্ব্বল স্ত্রীলোক আমি, দেহ আমার অধীন নহে, কিন্তু মন আর আমার রহিল না—তাহা দিয়া ফেলিয়াছি, স্বয়ং চলিয়া গিয়াছে ; ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা কি শক্তি আর আমার নাই !—আজ যাহা ঘটিয়াছে, শুন। তুমি জান, আজ রাত্রে নবাবজাদার এখানে আসিবার কথা ছিল না। বিকালে মন্নুকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম ;—প্রার্থনা, তুমি একবার আসিয়া আমাকে দেখা দাও, মন খুলিয়া কয়েকটা কথা তোমাকে বলিব ! মন্নু আসিয়া জানাইল, তুমি স্বীকার হইয়াছ, প্রহরের নহবত বাজিলেই তুমি আসিবে—"

হেমেন্দ্র ভগ্ন স্বরে কহিলেন ;—"মন্নু মিছা কথা বলিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমার দেখাও হয় নাই।"

"তাহা বুঝিতে পারিয়াছি, বাঁদী নিমকহারামী করিয়াছে।—তুমি স্বীকার পাইয়াছ, দীর্ঘ দিনের সাধ আমার পূর্ণ হইবে ! কুরূপ কুৎসিত বেশে তোমাকে দেখা দিব না, তাই—তাই রত্নালঙ্কারে আমি সাজিয়াছি।"—বলিতে বলিতে ফৈজী উঠিয়া দাঁড়াইল, দুই বাহু বিস্তার করিল। মহার্ঘ রত্ন রাজীতে যথাযথ অলঙ্কৃত সেই দিব্য বপু স্নিগ্ধ দীপালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।—"কখন তুমি আসিবে, বিলম্ব অসহ হইল, পলকে প্রহর ভাবিতে লাগিলাম,—এমন সময় ঘরে প্রবেশ করিল—সৈয়দ মহম্মদখাঁ !"

"কি ! সৈয়দ মহম্মদ ?—নবাবজাদার ভগ্নীপতি ?"

"হাঁ, সেই বাঁদী মহলের পোষা কুকুর ! কুকুর আসিয়া পায়ে পড়িতে চাহিল ! এমন সময় স্বয়ং নবাবজাদা উপস্থিত ! সৈয়দ ঐ দরজা দিয়া পলাইল। নবাবজাদা তরবারি ছুঁড়িয়া মারিলেন, তাহার গায়ে লাগিল কি না, জানি না, দরজায় ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঐ দেখ, ভগ্ন তরবারী পড়িয়া রহিয়াছে। হেমেন্দ্র, আমি নিরপরাধী;

নবাবজাদা তাহা মানিলেন না; আমাকে নিষ্ঠুর নিদারণ গালি দিলেন। আমার রাগ হইল, আমিও গালি দিলাম; নবাবজাদা আমাকে প্রহার করিলেন।—তাহার পর যে দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে, তাহা তুমি জান।"

কাতরকণ্ঠে হেমেন্দ্র বলিলেন;—"ফৈজীবিবি, তোমাকে বাঁচাইবার কি কোন উপায় নাই?"

"রক্ষার কোন উপায় নাই। যাহাকে কালসাপে কাটিয়াছে, তাহাকে কি আর বাঁচান যায়?"

"আমি একবার—"

"পাগল হইয়াছ! কোথায় আমাকে লুকাইবে? কেমন করিয়া আমাকে লইয়া যাইবে?—দ্বারে, ফটকে প্রহরী বসিয়াছে। অসম্ভব কার্য্যে প্রয়াস পাইও না।"

"একদিন তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলে।"

"কিছু না; তুমি নিজ গুণে রক্ষা পাইয়াছিলে। প্রয়াস ছাড়, আমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না, তুমিও মরিবে।"

"ক্ষতি কি?"

"না, তুমি মরিতে পার না। সংসারে আমার কেহ নাই, কিছু নাই। আমি মরিলে কাহারও কোন ক্ষতি হইবে না; আমি মরিলে কাঁদিবার কেহ নাই। তুমি মরিতে পার না,—আমার জন্য তুমি মরিবে কেন? আমি তোমার কে? তোমার স্ত্রী আছে, পুত্র আছে; ঘর সংসার আছে; তোমার প্রাণ পরের।—আর শুন, মৃত্যুই আমি স্থির করিয়াছি।"

ফৈজী পালঙ্কের দিকে অগ্রসর হইল; শয্যার নীচ হইতে কি যেন বাহির করিয়া আনিল। নিকটে আসিলে হেমেন্দ্র দেখিতে পাইলেন, কোষবদ্ধ একখানা ক্ষুদ্র ছুরিকা; সোণার কাজ-করা

মুক্তা বসান বহু মূল্য কোষ ; তাহার ভিতর হইতে হইতে বিঘত প্রমাণ অতি তীক্ষ্ণধার, ঈষৎ বক্রাকার দামাস্ক ছুরিকা। তাহার বাঁটে হীরা জ্বলিয়া উঠিল। ফৈজী সেই কোষমুক্ত ছুরিকা ডান হাতে লইয়া হেমেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিল ;—

"দেখ, এ অস্ত্র আমার সঙ্গে সঙ্গে লুক্কায়িত থাকে। নবাবজাদা চলিয়া গেলে আমি ইহা বাহির করিয়াছিলাম, বুকে বসাইয়া মরিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম ; কিন্তু মরিলাম না ; কেন যেন মনে হইল, মরিবার আগে একবার তোমার সঙ্গে দেখা হইবে !—এত সাজসজ্জা করিয়া—এত আকাঙ্ক্ষা করিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিলাম, একবার যেন সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ! তাই মরি নাই। আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে ; তোমাকে দেখিলাম , যে অপরাধে আমার দণ্ডাজ্ঞা হইয়াছে সে অপরাধ যে আমি করি নাই, তাহা তোমাকে জানাইলাম ;—এখন বাঁচিয়া থাকার সাধ আমার নাই !"

ফৈজীর চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; দৃঢ়মুষ্টিতে ছুরিকা লইয়া কথা শেষ হইতে না হইতে ফৈজী নিজের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া হাত উত্তোলিত করিল ; সেই মুহূর্ত্তেই ক্ষিপ্রহস্তে হেমেন্দ্রলাল ছুরিকাসহ ফৈজীর হাত ধরিয়া ফেলিলেন। ফৈজীর হাত হইতে ছুরিকা সরাইয়া কোষবদ্ধ করিয়া হেমেন্দ্রলাল আপনার মেরজাইর নীচে তাহা লুকাইয়া রাখিলেন ।

বিফলমনোরথ হইয়া ফৈজী বসিয়া পড়িল, হেমেন্দ্রের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার সর্ব্ব শরীর নিশ্চেষ্ট হইল, চক্ষুর সে উজ্জ্বলতা চলিয়া গেল। হেমেন্দ্র বলিলেন ;—

"আত্মহত্যা করিবে ?—মহাপাপ ! মহাপাপ !—কেন আর পাপসমুদ্রে ডুবিবে ?

ফৈজী হেমেন্দ্রের মুখের দিকেই চাহিয়া ছিল, শুধু বলিল ;—"না।"

হেমেন্দ্র। "ফৈজীবিবি, আমি চলিলাম।"

ফৈজী কোন উত্তর দিল না, কেবল চাহিয়া রহিল।

হেমেন্দ্র। "ফৈজীবিবি, আমি চলিলাম; আমি এ আজ্ঞা পালন করিতে পারিব না।"

হেমেন্দ্র দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তখন হঠাৎ ফৈজী দাঁড়াইল, বলিল;—"কোথায় যাও?"

হেমেন্দ্র। "আমি চলিলাম।"

ফৈজী। "চলিলে?—নবাবজাদার আজ্ঞা!

হেমেন্দ্র। "আমি পারিব না, আমি—"

এমন সময় প্রভাতের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। হীরাঝিলের উচ্চ প্রমোদাবাস হইতে সুকোমল ললিত স্বরলহরী মৃদু মৃদু সে কক্ষে প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্রের শরীর কম্পিত হইয়া উঠিল, ফৈজীর শরীর শিহরিয়া উঠিল।

হেমেন্দ্র। "আর সময় নাই, ফৈজীবিবি; আমি—"

ফৈজী। "চল, আমি প্রস্তুত।"

হেমেন্দ্র। "ফৈজীবিবি, নবাবজাদার আজ্ঞা পালন করিতে—"

ফৈজী। "তুমি পারিবে না! নবাবজাদা অতি অনুগ্রহ করিয়া তোমাকে পাঠাইয়াছেন; তুমি পারিবে না! অন্য লোক আসিবে? জল্লাদে আমাকে লইয়া যাইবে? জল্লাদ আমাকে টানিয়া নিবে?—হেমেন্দ্র আমার রক্ষা কিছুতেই নাই, তবে কেন এই ভয়ঙ্কর খোজাদের হাতে—চণ্ডাল জল্লাদের হাতে আমাকে দিয়া যাইবে?"

বাহিরের ফটকে সঙ্কেত তূর্য্যধ্বনি হইল। হেমেন্দ্রের সর্ব্ব শরীর অবশ আকুল হইয়া উঠিল;—আয়োজন প্রস্তুত, রাজাজ্ঞায় রাজমিস্ত্রী সান্ত্রী প্রহরী প্রতীক্ষা করিতেছে;—আর রক্ষা নাই, রক্ষা নাই! তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া ফৈজীও বুঝিতে পারিল; তাহার আপাদমস্তক কম্পিত হইয়া

উঠিল। হেমেন্দ্র ফৈজীর দিকে চাহিলেন, ফৈজীও হেমেন্দ্রের দিকে চাহিল;—আবার সেই পলকশূন্য, বোধশূন্য, স্থির দৃষ্টি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! হেমেন্দ্র দ্বারাভিমুখে চলিলেন; ফৈজীও চলিল, কলের পুতুলের মত চলিল, গুন্ গুন্ করিয়া গীত ধরিল;—

"যায় ক্যায়ছে যাঁও যমুনা—
ঘাট বাট মাঠ পর সো কাহ্নাইয়া!—"

হেমেন্দ্র কক্ষ ছাড়িয়া বারান্দায় পৌছিলেন, ফৈজীও পৌছিল। সেখানে দীপালোক নাই, প্রভাতের মৃদু আলো তখনো স্ফুটীকৃত হয় নাই। হঠাৎ ফৈজী চীৎকার করিয়া উঠিল; তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছিল। ক্ষীণ-আলোকিত বারান্দার পথে সেই বীভৎস, বিকটাকার প্রেতমূর্ত্তিবৎ খোজার দল উভয়কে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, অব্যক্ত বিকট হাস্যরব করিয়া ফৈজীর অতি নিকটস্থ হইয়াছে। হেমেন্দ্র ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে দূরে দূরে থাকিতে বলিলেন।

আবার তূর্য্য ধ্বনি হইল; আর বিলম্ব নাই! রক্ষা নাই!

হেমেন্দ্র, ফৈজী এবং খোজাগণ ধীরে ধীরে বারান্দা হইতে পাশের সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে লাগিল।

আবার তূর্য্যধ্বনি হইল। রক্ষা নাই! রক্ষা নাই! কালসর্পে দংশন করিয়াছে—রক্ষা নাই! রক্ষা নাই!

মর্ম্মভেদী অপমানে ক্রোধান্ধ নবাবজাদা রাত্রি মধ্যেই তলপ দিয়া এই নৃশংস কার্য্যের অধ্যক্ষতায় হেমেন্দ্রকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নবাবজাদার অনুগ্রহভাগিনী হওয়ার পর হইতে ফৈজী হেমেন্দ্রলাল ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের চক্ষুগোচর হয় নাই। এই ভয়াবহ অন্তিম সময়েও ফৈজীকে অন্য কেহ দেখিতে পায়, নবাবজাদার সে ইচ্ছা ছিল না; সেই জন্যই হেমেন্দ্র নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই জন্যই এই ভয়ঙ্কর দণ্ড বিধান।

সেই অরুণোদয় সময়ে সেই অলোকসামান্যা রূপবতী ফয়েজ-উন্নিসার জীবন্তে সমাধি হইল। ইষ্টক নির্ম্মিত দৃঢ় গঠিত এক ক্ষুদ্র কক্ষ; মণি মুক্তা রত্নালঙ্কার ভূষিতা ফৈজী তাঁহার ভিতর প্রবেশ করিল। সেই ভয়াবহ মুহূর্ত্তেও

"মায় ক্যায়ছে যাঁও যমুনা!—"

অদূরবর্ত্তী প্রহরীগণ রমণীকণ্ঠের এই মৃত্যুগীতিধ্বনি শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কক্ষের দ্বিতীয় দ্বার কি জানালা ছিল না, নিমেষ মধ্যে রাজমিস্ত্রীরা এক মাত্র প্রবেশদ্বার ইট দিয়া গাঁথিয়া ফেলিল; এবং সেই বদ্ধদ্বার কক্ষের চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত হইল।

* * *

কালে সেই রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছিল। কৌতূহল পরবশ হইয়া যাহারা সে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারা এক অতি বীভৎস, লোমহর্ষণ, ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিল। কোথায় সেই কমনীয় অলোকসামান্য লাবণ্যময় দেহলতা?—সে সুবলিত ললিত বাহু, সে স্বচ্ছ মসৃণ কোমল গণ্ড, সে স্ফুরদ্বিদ্যুদুজ্জ্বল আয়ত চক্ষু আর ছিল না। সে পক্কবিম্বরক্ত অধর, কর্ণিকার কুসুম তুল্য সে ক্ষুদ্র কর্ণ, সুগঠিত সে নাসা, সে উন্নত বক্ষ, সে বিপুল নিতম্ব—কিছুই ছিল না। ঘোর ভীতি-উদ্দীপক কৃমিকীটভক্ষিতাবশিষ্ট কঙ্কাল মাত্র পড়িয়া ছিল! সেই কঙ্কাল মূর্ত্তির হস্তে মণিময় বালা, কঙ্কন, প্রকোষ্ঠে মণিমুক্তা খচিত তাড়, বক্ষপ্রান্তে স্বর্ণসূত্রগ্রথিত বিপর্য্যস্ত হীরক চুণি পান্না মুক্তাময় মালা, স্কন্ধ বিচ্যুত চক্ষুকর্ণগণ্ডোষ্ঠ বর্জ্জিত শুষ্ক দন্তপাটী সংযুক্ত ভয়াবহ মুণ্ডাস্থি পার্শ্বে চিক্কণ কেশপাশ, আর সেই কেশপাশবিচ্যুত মুক্তা-জাল,—চারিদিকে বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত রত্নালঙ্কার!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

খাঁসাহেবের অন্দর মহল হইতে বাহির হইতে হইলে অন্দরের দেউড়ি কোঠার মধ্য দিয়া আসিতে হইত; সে কোঠায় অতি বিশ্বস্ত পুরাতন প্রহরী। দেউড়ি কোঠা পার হইলেই সম্মুখে সদর মহলের সোজা পথ; কিন্তু দেউড়ির পার্শ্ব দিয়া আর একটী পথ ছিল, অন্দরের দাসী বাঁদীরা এই পথ দিয়া বাহিরে যাওয়া আসা করিত। এই পথের পাশেই খাঁসাহেবের ভৃত্য শেখ সাদেকের গৃহ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পরদিন বিকাল বেলায় সুরতউন্নিসার বাঁদী পিয়ার সাদেকের গৃহকোণে উপস্থিত হইল। সেখানে জলিমের সঙ্গে তাহার দেখা হইল। জলিমের বয়স দশ এগার বৎসর। চাকরের ও চাকর থাকে; জলিম সাদেকের সাহায্যকারী চাকর অন্দর মহলেও তাহার গতিবিধি ছিল; দাসী বাঁদীদিগের অনেক ফরমাইস সে খাটিত। অন্দর মহলের সকলেই তাহাকে ভাল বাসিত। জলিম পিয়ার বিবির অতি প্রিয়পাত্র ছিল। পিয়ার জিজ্ঞাসা করিল;—

"জলিম, তোর মুনিব কি করিতেছে?"

জলিম। "সেখ সাহেব ঘুমাইয়া আছেন।"

পিয়ার। "একবার ডাক্ তো;—না, আমিই ডাকিতেছি। তুই আমার সঙ্গে আয়।"

পিয়ার সেই গৃহে প্রবেশ করিল। খাঁসাহেবের প্রিয় ভৃত্য শেখ সাদেক বৈকালিক নিদ্রা যাইতেছিল, দ্বার খোলার শব্দেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল না। জলিম তাহাকে ডাকিতে চাহিল, পিয়ার মানা করিল। চৌকির নীচে ঘটি ভরা জল ছিল, পিয়ার ঘটি হইতে জল লইয়া সাদে-

কের মুখে ছিটাইয়া দিল। হঠাৎ জলস্পর্শে সাদেক জাগিয়া উঠিল; চক্ষু মুছিতে মুছিতে পিয়ারকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি শয্যা হইতে নামিয়া বলিল;—

"সে কি! পিয়ারবিবি যে!—সাজগোজ করিয়া কোথায় যাইতেছ?"

পিয়ারের বয়স ঠিক করিয়া বলা সহজ নহে। বোধ হয় প্রায় ত্রিশ হইয়া থাকিবে; কিন্তু তাহাকে দেখিলে তাহার বয়স যে পঁচিশের উপর হইতে পারে, এ বিশ্বাস কাহারও হইত না। রং ফরসা না হইলেও উজ্জ্বল শ্যাম। বাঁদী মহলে পিয়ার সুন্দরী বলিয়াই প্রসিদ্ধা, অনেক মুনিব বেগম মহলেও তাহার রূপ উপেক্ষণীয় হইত না। সমস্ত শরীর সুগঠিত; বড় বড় চক্ষু বড়ই উজ্জ্বল, তাহাতে সুর্ম্মা; দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশপাশ যখন বেণীবদ্ধ না থাকিত, তখন তাহার অগ্রভাগ পশ্চাতে প্রায় জানুদেশ স্পর্শ করিত; কিন্তু এখন সে কুঞ্চিতকেশ বেণীবদ্ধ হইয়া উচ্চ খোঁপায় পরিণত হইয়াছে। হাতপায়ের নখ মেহেঁদি পাতার রসে, অধরোষ্ঠ তাম্বুলরসে রঞ্জিত। পরিধানে কামদার আঁচলাযুক্ত নীলরঙ্গের সাড়ী; গায়ে ফুলতোলা রঙ্গিল ওড়না; হাতে রূপার পৈছা, বাউটী; গলায় সোণার দানা, নাকে বেসর; কাণে ফুল। সাদেক পুনরায় বলিল;—

"সেজেগুঁজে কোথায় যাত্রা করিয়াছ, পিয়ারবিবি?"

"কোথায় আর যাত্রা করিব?—এই তো তোমার ঘরেই আসিয়াছি।"

"এত খোস নসিবে আমার বিশ্বাস হয় না!—বসিবে না? দাঁড়াইয়া রহিলে কেন?—এখানে বসো।"

সাদেক তক্তপোষের উপর নিজের শয্যা দুহাতে ছাড়িয়া মুছিয়া দেখাইয়া দিল। পিয়ার বসিল না। সাদেক তখন একখানি ছোট চৌকি আনিয়া নিজের ছাড়া একটা ইজারে তাহা মুছিয়া দিয়া পিয়ারকে বসিতে বলিল। পিয়ার বসিল।

সাদেক বলিল ;—"একটা পাণ খাইবে পিয়ারবিবি ?—জলিম, খানসামার ঘর হইতে পাণ লইয়া আয়।"

পিয়ার জলিমকে বাহিরে যাইতে নিষেধ করিল। আপনার বস্ত্রাভ্যন্তরে রুমালে বাঁধা খিলি পাণ ছিল ; দুইটী খিলি বাহির করিল ; একটী নিজের মুখে দিল, অপরটি সাদেককে দেখাইয়া বলিল ;—

"লইবে কি, শেখসাহেব ?"

"এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে, আমার ভাগ্যে মিলিবে ?"

"যে পুণ্যে ঘুম থিকে উঠিয়াই আমার মুখ দেখিয়াছ, সে পুণ্যে কি একটা পাণের খিলি মিলিতে পারে না ?"

সাদেকের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল।

পিয়ার। "এই লও।"

সাদেক হাত বাড়াইল, পিয়ার পাণের খিলি শয্যার উপর ফেলিয়া দিল, বলিল ;—

"দিলাম ; কিন্তু আপন পুণ্যে তোমার বিশ্বাস নাই, তোমার সাহস কম,—আমার সাক্ষাতে তুমি পাণ খাইতে পারিবে না।"

সাদেক শয্যা হইতে পানের খিলি তুলিয়া লইল, মাথা নোয়াইয়া খিলিকে সেলাম জানাইল। তাহার পর সেই কর্পূর পূগ সুবাসিত খিলি মুখে ফেলিয়া দিয়া হৃষ্টচিত্তে চর্ব্বন আরম্ভ করিল।

পিয়ার। "সে কি ! আমার কথা রাখিলে না ?"

সাদেক। "পিয়ারবিবি, তোমার কথা ?—অনেকদিন যাবৎ তোমার মুখের একটী কথার জন্য আরজী দাখিল করিয়া বসিয়া আছি, আজও তাহা দিলে না !"

পিয়ার অতিমৃদু গুন্ গুন্ স্বরে গান ধরিল ;—

বহুত দিনানা পরা পিয়া কি বোলত রে !
বহুত দিনানা—

সাদেক। "আমার আরজীটা কি রহস্যের মধ্যে ধরিয়াছ ?"

পিয়ার। "তোমার কোন্ কার্য্য রহস্যের মধ্যে নহে?—কেবল ঢাল তরোয়াল হাতে পাইলে তুমি একটা কিছু কাজ করিতে পার !"

সাদেক। "পাঁচ হাতিয়ারবন্দকে তুমি চোখের এক চাহনিতে হটাইতে পার !"

পাশের দেয়ালে কতকগুলি অস্ত্র—ঢাল, তলোয়ার, বর্শা, লাঠি, রামদা ঝুলান ছিল। জলিম নিকটে যাইয়া সেগুলির দিকে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। বোধ হয় ভাবিতেছিল, কখন সেদিন আসিবে, যখন নিঃশঙ্কচিত্তে কোমর বাঁধিয়া হাতিয়ারগুলি ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইবে !—পিয়ারের গীতের শব্দ শুনিয়া জলিম ফিরিয়া চাহিল।

পিয়ার। "জলিম, তুই তলোয়ার ভাঁজিতে শিখিয়াছিস্ ?"

জলিম। "লাঠি ভাঁজিতে পারি।"

সাদেক। "আমার কথাটা—"

পিয়ার। "জলিম, এতবড় যোয়ান হইলি, এখন তলোয়ার খে আরম্ভ কর্।"

সাদেক। আমি—"

পিয়ার। "তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।"

সাদেক। "কোথায় যাইব ?"

পিয়ার। "বাবুসাহেবের বাড়ী।"

সাদেক। "বাবু সাহেব ঘুম থেকে উঠেছেন ?

পিয়ার। "উঠিয়াছেন, খবর পাইয়াছি।"

সাদেক। "তা চল।—আমার কথাটা ?"

পিয়ার। (অতি মৃদুস্বরে)—

"পিয়া বোলাওয়ে, ক্যায়সে যাউ রে—

ননদিয়া বৈরন [illegible] রে !"

পিয়ার কথা পাড়িতে দেয় না, সাদেক তাহা জানিত, একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল ;—

"কতকাল আর এই এক ভাবে কথা কাটাইবে ?"

পিয়ার। "বড় জরুরি কাজ, আমায় যাইতেই হইবে।—রাস্তা হইতে বর্গী বরকন্দাজে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাইবে না কি ?"

সাদেক। "তা জানি !—চল।"

লাঠি হাতে আগে আগে সাদেক, তার পর পিয়ার, পিয়ারের সঙ্গেই জলিম ঘর হইতে বাহির হইল। অতটুকু দূর রাস্তা ; কোথায় বা বর্গী, কোথায় বা বরকন্দাজ ! তথাপি, পিয়ার কোন দিন সাদেকের সঙ্গে ব্যতীত হেমেন্দ্রলালের বাড়ীতে যাইত না ; বাড়ী ছাড়িয়া পিয়ার অন্য কোন স্থানে তো কোন দিনই প্রায় যাইত না। সদর পথ দিয়া হেমেন্দ্রলালের বাড়ী যাইতে ঘুরিয়া যাইতে হয়, কিন্তু পিয়ার কোন দিন সদর পথ দিয়া যাইত না। খাঁসাহেবের বাড়ীর ফুল বাগানের মধ্য দিয়া গেলেই হেমেন্দ্রলালের বাড়ী সংলগ্ন ফুল বাগানের ক্ষুদ্র দরজা। মালীকে ডাকিলেই সে দরজা খুলিয়া দিত, ডাকা মাত্র মালী দরজা খুলিয়া দিল। বাগানের পথে তিন জনে হেমেন্দ্রলালের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রামমোহন নীচের ঘরেই ছিল, শব্দ শুনিয়া বাহিরে আসিল।

রাম। "শেখজী আসিয়াছ ? সেলাম।—পিয়ারবিবিও যে ! সেলাম ! সেলাম !"

পিয়ার হাসিল, বলিল ;—

"সিংজী, জলিমকে সেলাম করিলে না ?"

তখন সাদেক, রামমোহনও হাসিয়া উঠিল।

সাদেক। "বাবুসাহেব কতক্ষণ উঠিয়াছেন ?"

রাম। "এই [illegible] হইল।"

সাদেক। "সুরতবিবির বাঁদী বাবুসাহেবের সঙ্গে দেখা করিবে, এখন দেখা হইবে কি?"

রাম। "পিয়ারবিবি আসিলেই তাহাকে উপরে লইয়া যাইবার আদেশ আছে।"—পিয়ারের দিকে চাহিয়া বলিল;—"চল বিবি।"

রামমোহন তাহাকে ভিতর বারান্দার সিঁড়ি দিয়া হেমেন্দ্রের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া নীচে সাদেকের সঙ্গে মিলিত হইল।

হেমেন্দ্রলাল অনেক বেলায় হীরাঝিল হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ভাল করিয়া স্নান আহার করেন নাই। কাহারও সঙ্গে বিশেষ আলাপ করেন নাই, নির্জ্জনে শুইয়া পড়িয়া দিন কাটাইয়াছেন। প্রভাতে পিয়ার হেমেন্দ্রলালের তত্ত্ব করিয়াছিল, হেমেন্দ্র তখনও ফিরেন নাই; দুপুরে খবর লইয়াছিল, হেমেন্দ্র তখন নিদ্রায়!

হেমেন্দ্রলাল পিয়ারকে দেখিয়া উঠিলেন, একখানি ছোট চৌকী ছিল, তাহা পিয়ারকে দেখাইয়া দিয়া বসিতে বলিলেন। পিয়ার নত-মস্তকে দুই হাতে হেমেন্দ্রলালকে সেলাম করিল। হেমেন্দ্র বসিলেন। তাঁহার মুখ নিতান্ত বিমর্ষ ও ক্লিষ্ট দেখিয়া পিয়ার দাঁড়াইয়াই জিজ্ঞাসা করিল;—

"বাবুসাহেব, আপনার কোন অসুখ করিয়াছে?"

"না, কোন অসুখ নাই।"

"আপনাকে এত মলিন দেখাইতেছে কেন?"

"অনেক রাত জাগিয়াছি, অবেলায় নিদ্রা গিয়াছিলাম, তাই হয় তো তোমার সন্দেহ হইয়াছে।—তুমি বসো।"

পিয়ার চৌকির নিকট মেজেতে বসিল, জলিমও পিয়ারের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। জলিম পিয়ারের সঙ্গে অনেকবার হেমেন্দ্রের ঘরে আসিয়াছে। পিয়ার ইতঃস্তত করিতে লাগিল, কেমন করিয়া কু সঙ্গ তুলিবে—ভাবিতেছিল। শেষে বলিল;—

"আমরা বড় বিপদে পড়িয়াছি, বাবুসাহেব।"

"বিপদ!—কি হইয়াছে?"

"সুরতবিবির—"

হেমেন্দ্রলাল চমকিত হইয়া বলিলেন;—"দিদিসাহেবার কি হইয়াছে?"

"আপনি স্থির হউন, অত ব্যস্ত হইবার কারণ নাই।—আপনি জানেন, সৈয়দ মহম্মদ খাঁসাহেবের সঙ্গে সুরতবিবির বিবাহের প্রস্তাব ঠিক হইতেছে।"

"তাহা তো জানি।"

"আশু বিবাহে বিবিসাহেবার মতি নাই; তাঁহার ইচ্ছা, পিতার সঙ্গে কাবা সরিফে যান।"

"তাহাও শুনিয়াছি। কিন্তু এখন, এ বয়সে দিদিসাহেবার কাবা সরিফে যাওয়া খাঁসাহেবের ইচ্ছা নহে। তাঁহার ইচ্ছা, দিদিসাহেবা বিবাহ করিয়া ঘর সংসার করুন; শেষে উপযুক্ত সময়ে কাবা সরিফে যাইবেন।—পিয়ার, দিদিসাহেবা বিবাহ করিলে আমাদেরও পরম আনন্দ হইবে।"

"বৃদ্ধা বেগম সাহেবা হইতে আরম্ভ করিয়া দাসী বাঁদী আমাদের সকলেরই আনন্দ। কিন্তু দেখিতেছি, বিবাহে সুরতবিবির মন নাই!"

"তুমি—তুমি এত বুদ্ধিমতী, বিবাহে দিদিসাহেবার মত করাইতে পারিলে না!"

"অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিছুতেই সুরতবিবির মন ফিরাইতে পারি নাই। এ দিকে খাঁসাহেব এবার কাবা সরিফে যাইবেন, মন বাঁধিয়াছেন। সৈয়দসাহেবের সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিয়া যাইবেন, ঠিক করিয়াছেন;—গত রাত্রিতে সুরতবিবিকে পর্য্যন্ত তাহা জানাইয়াছেন।

"তাহাতে কি দিদিসাহেবার মন ফিরিয়াছে ?"

"পিতার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া অবধি বিবিসাহেবা কাঁদিয়া আকুল। কাল সারারাত্রি নিদ্রা যান নাই। বাবুসাহেব, এ বিবাহ যদি বারণ রাখিতে না পারেন, তবে সুরতবিবিকে বাঁচাইয়া রাখা বিষম হইবে। এখন আপনিই এক মাত্র ভরসা।"

হেমেন্দ্রলাল কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—

"পিয়ার, হীরাঝিলের গত রাত্রির বৃত্তান্ত কিছু শুনিয়াছ ?"

"ভোর হইতে সহরময় অনেক কথা রাষ্ট্র হইয়াছে ; কতক কতক শুনিয়াছি।—ফৈজীবিবির নাকি জীবন্তে কবর হইয়াছে ? যথার্থ কি ?"

"যথার্থই বটে। আর কিছু শুনিয়াছ ?"

"আরও কিছু কিছু শুনিয়াছি, কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস হয় না।"

"ফৈজীবিবির অপরাধের কথা ?"

"ফৈজীবিবির পাপের কথা, আর—আর—"

পিয়ার ইতঃস্তত করিতে লাগিল। হেমেন্দ্রলাল বলিলেন ;—

"বিনা অপরাধে ফৈজীবিবির প্রাণদণ্ড হইয়াছে।"

"বিনা অপরাধে ! তবে—তবে সৈয়দ সাহেবের সম্বন্ধে যে জনরব উঠিয়াছে, তাহা মিথ্যা ?"

"তুমি অনেক কথা শুনিয়াছ ; দিদিসাহেবা কি এত কথা জানেন ?"

"সৈয়দ সাহেবের কথা সুরতবিবি শুনেন নাই, বলি নাই। ফৈজী-বিবির কথা বলিয়াছি।"

"পিয়ার, তোমার অসীম বুদ্ধি ! শুন, ফৈজীবিবির জীবন পাপময় ছিল ; তাহার গুণও অনেক ছিল, সে কথার আলোচনায় কি কাজ ?—সে অনেক পাপাচরণ করিয়াছিল ; কিন্তু যে অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে, যে দোষে তাহার জীয়ন্তে কবর হইয়াছে, সে দোষে সে দোষী ছিল না। নিরপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড হইয়াছে।—সৈয়দ সাহেবের

সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছ, তাহা মিথ্যা নহে। ফৈজীর নিমকহারাম বাঁদী মন্নুর সাহায্যে সৈয়দ ফৈজীর গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। নবাবজাদা সৈয়দের প্রতি তলোয়ার ছুড়িয়া মারিয়াছিলেন, সৈয়দ সাহেব দৌড়িয়া পালাইয়া রক্ষা পাইয়াছেন। রাত্রিতেই তিনি রাজমহলের দিকে পালাইয়া গিয়াছেন।”

“তাই বুঝি খাঁসাহেবের লোক আজ সকালে সৈয়দ সাহেবের দেখা পায় নাই।”

“তিনি শেষ রাত্রিতে সহর ছাড়িয়া পালাইয়াছেন। নবাবজাদার ক্রোধ, ধরা পড়িলে সৈয়দ সাহেবের মাথা বাঁচান দায় হইত।”

“এমন লোকের হাত হইতে সুরতবিবিকে বাঁচাইতেই হইবে।”

“আমি এখনি খাঁসাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে যাইব। সকল কথা শুনিলে তিনি আর এ বিবাহে জেদ করিবেন না।”

“আপনি তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবেন?”

“সকল কথা শুনিলে তিনি অবশ্যই ক্ষান্ত হইবেন।”

পিয়ার দাঁড়াইল, হেমেন্দ্রকে সেলাম করিয়া বলিল;—

“অনুমতি করেন তো এখন আসি। আশার কথা শুনিলেও সুরতবিবির প্রাণে সোয়াস্তি আসিবে!”

হেমেন্দ্রলালও দাঁড়াইলেন, বলিলেন;—

“যাও।”—কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করিয়া আবার বলিলেন;—“পিয়ার, একটী কথা। অনেক কাল হইতে তুমি দিদিসাহেবার কাছে কাছে আছ; তিনি তোমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন;—”

“সুরতবিবি বাঁদীকে খুব অনুগ্রহ করেন।”

“তাঁহার মন তুমি যেমন বুঝিবে, আর কেহ তেমন পারিবে না। সৈয়দের কথা ছাড়িয়া দাও। আচ্ছা,—বিবাহে তাঁহার এখনো মতি কেন নাই, বুঝিতে পার?”

"কেন যে মতি নাই, বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু—"

"পিয়ার, বসো।"

হেমেন্দ্র বসিলেন, পিয়ারও পুনরায় বসিল এবং বলিল ;—

"অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু—"

"তোমার কি সন্দেহ হয়—দিদিসাহেবা বালিকা নহেন,"— স্থির দৃষ্টিতে পিয়ারের দিকে চাহিয়া—"তোমার কি সন্দেহ হয় — এ বয়সে তাঁহার চিত্ত বিশেষ কোন—কাহারও প্রতি—?"

"তাহাও বুঝিতে পারি না। সে সন্দেহ আমারও হইয়াছিল ; আমি জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলাম। নবাব, আমীর, ওমরাহ—হিন্দু—মুসলমান, কেহই না !—সুরতবিবি আমার কথা হাসিয়া উড়াইয়া ছিলেন।"

"এমন দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি মাখা চিত্তে কি—"

"ঈশ্বর ঘরসংসার, স্বামীপুত্রকন্যার আকাঙ্ক্ষা কেন যে দেন নাই, বুঝিতে পারি না।"

"দেখিও, তুমি তাঁহার প্রিয়সঙ্গিনী—"

"পায়ের বাঁদী !"

"আমি জানি—অতি আত্মীয়, অতি প্রিয়বন্ধু। তাঁহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা তুমি আরও করিও। তাঁহার বিবাহ আমাদের বড়ই আনন্দের উৎসব হইবে।"

"পিতাসাহেবের প্রতি সুরতবিবির অসীম ভক্তি ; তাহার পরে পৃথিবীতে বোধ হয় আপনার চেয়ে সুরতবিবির শ্রদ্ধার পাত্র আর কেহ নাই। সুরতবিবি বিবাহ করিলে আপনি যে পরম সুখী হইবেন, তাহা আমি তাঁহাকে বলিব।"

হেমেন্দ্রলাল বারান্দা পর্য্যন্ত পিয়ারের আগে আগে আসিলেন। জলিম কিছুকাল চুপ করিয়া পিয়ারের নিকট বসিয়াছিল ; শেষে ভিতর বারান্দায় আসিয়া ছুটা ছুটি করিতেছিল, বাগানের শোভা দেখিতেছিল,

পিয়ারকে দেখিয়া কাছে আসিল। হেমেন্দ্রলাল রামমোহনকে ডাকিয়া পিয়ার ও জলিমকে সঙ্গে করিয়া খাঁসাহেবের বাড়ী পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবার আদেশ দিলেন। সেলাম করিয়া পিয়ার বিদায় হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতঃকালে হেমেন্দ্রলাল খাঁসাহেবের সঙ্গে দেখা করিলেন। দেখিলেন, তিনি কোথায়ও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ফৈজী বিবির দণ্ড, সৈয়দসাহেবের পলায়ন, নবাবজাদার ক্রোধ ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা কতক কতক খাঁসাহেবের কাণেও পৌছিয়াছিল। নানা সন্দেহে তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন লোকের হাতে কেমন করিয়া সুরতকে সমর্পণ করা যায়? এখন হেমেন্দ্র-লালের মুখে যথার্থ কথা বিস্তারিত শুনিয়া খাঁসাহেব মহা উদ্বিগ্ন হইলেন। হেমেন্দ্র বলিলেন ;—

"সৈয়দসাহেব লোক ভাল নহেন ; নবাবজাদা ভয়ঙ্কর রাগ করিয়াছেন। এ বিবাহে দিদিসাহেবার সুখ হইবে না। তিনি এত কথা এখনো শুনেন নাই, শুনিলে বিষম কষ্ট পাইবেন।"

খাঁসাহেব কিছুকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন ;—

"না, সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম ; কিন্তু এখন উপায়? সুরতকে কাহার হাতে দিয়া যাইব?"

"কেন, চেষ্টা করিয়া দেখুন ; সুপাত্র অবশ্যই মিলিবে।"

"এতদিন চেষ্টা করিতেছি, মিলিল কৈ? জাহাঙ্গীরনগর দেখি-

লাম, মুরসিদাবাদ দেখিলাম, পূর্ণিয়ায় অনুসন্ধান করিলাম, আজিমাবাদে তত্ত্ব করিলাম,—কোন খানেই তো যুটিল না!”

“নিরাশ হইবার কারণ নাই। আরও চেষ্টা করিতে হইবে।”

“কিন্তু সে সময় আর কৈ? আমি তো আর অপেক্ষা করিতে পারি না! দিনের পর দিন যাইতেছে, শরীর অবসন্ন হইতেছে, দেশের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইয়া উঠিতেছে, নবাব মহলে প্রকাশ্য গৃহ বিচ্ছেদের বিলম্ব নাই। দুদিনে এমন দুদ্দিন, এমন তুমুল বিবাদ কলহ উপস্থিত হইবে যে, লোকের ধন সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম রক্ষা করা বিষম হইবে। আমি তাহার পূর্ব্বেই চলিয়া যাইতে চাই, পারিব কি?”

“আপনি চেষ্টা করুন, আমরা তত্ত্ব অনুসন্ধান করি; দিদিসাহেবার মত সর্ব্বগুণবতীর বর মিলিবে না!”

“আমি দেখিব; হেমেন্দ্র, তুমিও খুঁজিও। আমি শীঘ্রই যাইব; যাইবার পূর্ব্বে সুতরকে পাত্রস্থ করিয়া যাইতে হইবে।”

আরও অনেক কথা হইল। বৃদ্ধ নবাবের প্রাণসংশয় পীড়ার কথা, ঘেসেটী বেগমের ষড়যন্ত্র, সকতজঙ্গের দুরাশা, ফিরিঙ্গীর অতিবৃদ্ধি, দেশের সর্ব্বসাধারণের অসন্তোষ—বহু কথা হইল। খাঁসাহেব স্থির করিলেন, এই অবশ্যম্ভাবী তুমুল রাজনৈতিক বিপ্লব ঝটিকার পূর্ব্বেই তিনি মক্কাসরিফে চলিয়া যাইবেন। সুরতের বিবাহে আর বিলম্ব করা যায় না। যেখানেই হউক, অতিশীঘ্র তাহা সারিয়া যাইতে হইবে।

হেমেন্দ্রের সঙ্গে কথা শেষ করিয়া খাঁসাহেব বাড়ী হইতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। হেমেন্দ্রলাল নিজ গৃহাভিমুখে যাইবার সময় সাদেককে ডাকাইয়া বলিলেন;—

“আজ আর আমার সময় নাই, বেগমসাহেবাদের সঙ্গে দেখা করিয়া যাইতে পারিলাম না। পিয়ারকে বলিও, সৈয়দ মহম্মদ খাঁসাহেবের

সঙ্গে দিদিসাহেবার বিবাহের যে প্রস্তাব চলিতেছিল, খাঁসাহেব সে প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন।”

হেমেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। সেখ সাদেক ভিতরের খবর বিশেষ কিছু জানিত না; সে এই বিবাহ ভঙ্গের কথায় দুঃখিত হইল। জলিমকে দিয়া পিয়ারকে ডাকাইল। পিয়ার আসিয়া সাদেককে বিমর্ষ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল;—

“কি হইয়াছে?”

“খবর ভাল নয়।” সৈয়দ মহম্মদ খাঁসাহেবের সঙ্গে সুরতবিবির বিবাহের প্রস্তাব ছিল, সে বিবাহ হইবে না।”

“হইবে না! বাবুসাহেব আসিয়াছিলেন?”

“এতক্ষণ খাঁসাহেবের সঙ্গে তাঁহার কি কি কথা হইয়াছে, জানি না যাইবার সময় তোমাকে এই কথা জানাইবার জন্য আমাকে বলিয়া গিয়াছেন।”

পিয়ারের মুখ ক্রমে স্মিতপ্রফুল্ল হইয়া আসিতেছিল, সে বলিল;—“শেখ সাহেব, তোমার মুখে একটা বড় সুখবর শুনিলাম; সুরতবিবিকে বলিয়া তোমার জন্য একটা বখ্‌শিসের আরজী করিব।”

“সুখবর?”

“হাঁ! এ বিবাহ যাহাতে না হয়, সুরতবিবির তাহাই ইচ্ছা। তুমি একটা মস্ত আহাম্মক, ঘরের খবর কিছুই রাখ না!—আর একটা কথা। এখনো বিবাহে সুরতবিবির প্রবৃত্তিই নাই!”

সাদেক কিছুকাল অবাক্ হইয়া রহিল,; শেষে বলিল;—

প্রবৃত্তি নাই!—তোমরা মেয়ে মানুষেরা কি এখন হইতে ফকির মোসাফের হইয়া দুনিয়ায় ফিরিয়া বেড়াইবে? মেয়ে মানুষে আর ঘর সংসার করিবে না?”

"সেদিন স্থরতবিবি তো বলিতেছিল, বিবি রাবেয়া না কি কে যেন চিরকাল ফরিরীই করিয়া গিয়াছেন।"

"মুলুকশুদ্ধ তোমরা তা-ই আরম্ভ করে, আর আমরা—"

"আর তোমরা বেসর বাউটী পরিয়া ঝেঁটা লইয়া ঘর দুয়ার সাফ্ কর,—ঘরসংসার কর।"

"তোমাদের রকম যেরূপ দেখিতেছি, আমাদের তা-ই করিতে হইবে!—তা এটা যদি স্থখবরই হয়, তবে আমার বখশিস্ চাই।"

"সে আরজ স্থরতবিবিকে জানাইব।"

"আমি স্থখবর তোমাকে দিয়াছি, তোমার কাছেই বখশিস্ চাই।"

"আমার কাছে কি বখশিস্? —মুড়ো ঝেঁটা?"

"পিয়ারবিবি. আজ এ স্থর্ম্মা কোথায় পাইলে? তোমার চোখে যে আজ বিদ্যুৎ খেল্‌ছে!"

পিয়ার খোলা দরজার দিকে চাহিয়া মৃদুধ্বনি করিল;—

"—বেসর শোহে, আউর শোহে নয়নে কাঁজরা!"

"কেবল গাহিয়া উড়াইলে চলিবে না, আজ বখশিস্ স্বীকার করিতেই হইবে।"

"বখশিসের কথা স্থরতবিবিকে জানাইব।"

"এ বখশিস্ তোমার হাতে।"

"আমি গরীব বাঁদী; মুনিবের কাছে চাহিতে হইবে।"

"তোমার মুখের একটী কথা আমার হাজার আসরফি!"

পিয়ার গুন্‌গুন্ করিয়া ধরিল;—

বিনিমূল্‌সে পিয়া মুঝে দিয়া
তখ্‌ত বাদসাহী দুনিয়াকো!—

সাদেক বসিয়া পড়িয়া পিয়ারের পদস্পর্শের চেষ্টা করিল। পিয়ার বিদ্যুৎবেগে দরজার বাহিরে আসিয়া হাসিমুখে বলিল;—

"সেখ সাহেব, আসমানের চাঁদ এখনো মাটিতে পড়ে নাই!"

পিয়ার দ্রুতবেগে অন্দর মহলে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পিয়ার সুরতকে বলিল ;—

"বাবুসাহেব বাবজানের সঙ্গে দেখা করিয়াছেন।"

সুরত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল ;—

"দাদাসাহেব কি বলিয়াছেন?—বাবা কি বলিলেন?"

"বাবুসাহেব তোমার হিত পক্ষেই ব.লয়াছিলেন।"

"বাবা মানিলেন না?"—সুরতের স্বর বড়ই ক্ষীণ। কিন্তু পিয়ারের উৎফুল্ল মুখ দেখিয়া তাহার ভরসা হইল ; সে বলিল ;—

"তুই কথা গোপন করিতেছিস্! শীগ্‌গীর বল্।"

"পিয়ার হাসিয়া ফেলিল, সুরত তাহার চুলের খোঁপা ধরিয়া টানিল। জবরদস্তি দেখিয়া পিয়ার তখন সৈয়দ মহম্মদের সঙ্গে কন্যার সম্বন্ধের প্রস্তাব যে খাঁসাহেব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহা বলিল। শুনিয়া সুরত হর্ষভরে পিয়ারকে টানিয়া নিয়া পালঙ্কে নিজের পাশে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ;—

"ভাইসাহেব কেমন করিয়া বাবার মন ফিরাইলেন?"

"সে অনেক কথা। সৈয়দ সাহেবের চরিত্র ভাল নহে, সেখানে তোমার সুখ হইবে না, বাবুসাহেব তাহা বুঝাইয়া বলাতেই বাবজানের মন ফিরিয়াছে।"

অনেক কথা হইল। হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে সুরত বলিল ;—

"ভাইসাহেব কতবার কত বিপদ হইতে আমাকে উদ্ধার করিলেন। তাঁহার মত মানুষ দুনিয়ায় দুটি নাই। মণি মুক্তা জহরাতে কি এ ঋণ শোধ হয় ?"

পিয়ারের মনে একটা কথা উঠিল, তাহা গোপন করিয়া বলিল ;—

"ঋণ শোধ ?—বাবুসাহেবের ঋণ শোধ পরে করিবে, এখন আমি যে এই খোস খবরটা আনিয়া দিলাম, আমাকে কি দিবে ?"

"তোকে ?—তুই কি চা'স ?"

"আমি আর কি চাহিব ? বাঁদী মানুষ আমি। তবে একটা জিনিস আছে—"

"কি জিনিস, বল।"

"জিনিসটা কিছুই না,—একটা আদ্না, অকেজো আধেলা মাত্র !"

"বটে !"—সুরতের মুখও হাসিময় হইয়া উঠিল।—"একটা আধেলা কেন নিবি, তোকে আমি তোড়াভরা আসরফি দিব, গা-ভরা জহরাত দিব।"

"আসরফি, মতিজহরাত তুমি রাখ ; বাঁদী মানুষ আমি, আধেলাতেই আমার কাজ চলিবে।"

"এমন গুণের আধেলাটা কোথায় দেখিলি, পিয়ার ?"

"আর কোথায় দেখিব ? এই বাড়ীতেই পড়িয়া আছে।—আজ কতকাল যাবৎ জ্বালাতন করিতেছে ; আর পারি না, এবার সেটাকে নিতেই হইবে।"

সুরত পালঙ্ক হইতে নামিল, পিয়ারের পিঠে একটী ছোট চিম্‌টি কাটিয়া বলিল ;—"সাদেককে বলিয়াছিস্ ?"

পিয়ারও নামিল, হাসিয়া বলিল ;—"আমি আর কি বলিব ? তোমরাই বলিও।"

সুরত উল্লাসভরে পিয়ারকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল ;—

"আয়, পোড়ারমুখী, তোর বেণীগুলো খুলিয়া গিয়াছে, খোঁপা বাঁধিয়া দি।"

"কবে হইতে বাঁদীগিরি শিখিয়াছ, সুরতবিবি ?"

"তা দিয়া তোর কি কাজ ?"

সুরত পিয়ারের মাথার সমস্তগুলি বেণী টানিয়া খুলিয়া এলো করিয়া ফেলিল। তাহার পিঠে বুঝি দুই একটা কিলও মারিল। পিয়ার ছুটিয়া গিয়া সুরতবিবির শয্যা ঝাড়িয়া মুছিয়া ভাল করিয়া পাতিতে গেল। সুরত তখন বলিল ;—"যাস্‌নে, আমি আসিতেছি।"

সুরত তাড়াতাড়ি সরিফন বেগমের নিকট যাইয়া পিয়ার যে সাদেকের প্রস্তাবে স্বীকার হইয়াছে, তাহা বলিল ; এবং যাহাতে অতি শীঘ্র এই বিবাহ হয়, তাহার জন্য দিদিমাকে খুব আবদার করিয়া ধরিল। পিয়ার সেবাড়ীর সকলের প্রিয় ; সংবাদে বৃদ্ধা বেগমও খুব খুসী হইলেন। কিন্তু তিনি বলিলেন ;—"বুড়ো মাগী নেকা করিতে বসিয়াছে, তাই শুনিয়া তুই ছুটোছুটি করিতেছিস্, তোর নিজের—"

সুরত সেঘর হইতে পলায়ন করিল।

এদিকে পিয়ার শয্যা-পাতি সারিতে সারিতে ভাবিতেছিল ;—"ভাই-সাহেবের মত মানুষ তুনিয়ায় নাই!" "মণি মুক্তা জহরাতে কি তাঁহার ঋণ শোধ হয় ?"—ভাইসাহেবই কি মনের মত মানুষ ? যদি তা-ই হয়, তবে উপায় ? আজ একবার আলাপ করিয়া দেখিব।

সুরত ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল ;—"পিয়ার আছিস্ ?"

পিয়ার উত্তর দিল ;—"তোমার আর কি চাই ?"

"কেন, তোর আজ এত তাড়াতাড়ি কেন রে ?"

"তাড়াতাড়ি কোথায় দেখিলে ?"

"আজ না দেখিলাম, দুদিন পরে তো দেখিব? কিন্তু শোন্‌, যে কয়দিন আমরা আছি, আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবি না।"

"তোমাকে ছাড়িয়া যাইব? কেন?"

"সাদেক যদি পৃথক বাড়ী করে?—সে যদি পৃথক বাড়ীতে যাইতে চায়?"

"যাইতে চায়, সে যাইবে?"

"তুই কি করিবি?"

"আমি তোমার বাঁদী, তোমার কাছেই থাকিব।"

"সাদেক স্বীকার হইবে?"

"স্বীকার না হইলে সে আদ্‌না আধেলাটাকে ঝাড়িয়া মুছিয়া আঁচলের কোণে বাঁধিয়া লইতে কে স্বীকার হইত?"

"তা আমরা বেশী দিন দেশে থাকিব না।"

"তুমি কোথায় যাইবে?"

"বাবা কাবা সরিফে যাইবেন, আমিও সঙ্গে যাইব।"

পিয়ারের মুখ গম্ভীর হইল, পিয়ার বলিল;—

"তিনি কি বলিয়াছেন, জান?—তিনি এবার মক্কা সরিফে যাইবেন, তাহা ঠিক; কিন্তু তোমার বিবাহ দিয়া যাইবেন।"

সুরতের মুখও গম্ভীর হইল; সুরত বলিল;—

"আমার মন তুই জানিস্‌। সম্বন্ধও তো আর উপস্থিত নাই—"

"উপস্থিত নাই, ঠিক বলিতে পারি না। তিনি বলিয়াছেন, অন্যত্র চেষ্টা করিবেন। আর শুন, আমিও অনেকবার বলিয়াছি, এখনো এবয়সে কেন তুমি বিবাহ করিবে না?"

"কেন করিবার ইচ্ছা নাই তাহা তোকে বলিয়াছি।"

"সে কথা মানি না।—বাবুসাহেব কি বলিয়াছেন, শুনিয়াছ?"

"ভাইসাহেব? ভাইসাহেব কি বলিয়াছেন?"

"তিনি আমাকে কতদিন বলিয়াছেন, কালও বলিয়াছেন, তুমি বিবাহ করিলে তাঁহার পরম আনন্দ হইবে।"

"তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন, তাই ওরূপ বলিয়াছেন।"

"তিনি যে অতি স্নেহ করেন, তাহা তুমি জান?—জানিয়া শুনিয়া এমন লোকের কথা কেন রাখিবে না?"

সুব্রত হাসিল, হাসিয়া বলিল;—"তিনি ভালবাসেন বলিয়াই ওরূপ ইচ্ছা করেন: তুই তো বরাবর বলিতেছিস্; দিদিমা, বাবজান সকলেই বলিতেছেন।"

"তিনি ভালবাসেন বলিয়া ওরূপ ইচ্ছা করেন; আচ্ছা, তুমি কি তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর না, ভালবাস না?"

সুব্রত হাসিয়া বলিল;—"তা কি আর তুই জানিস্ না?"

"জানি। এই তো তুমি বলিতেছিলে—ভাইসাহেবের মত লোক দুনিয়ায় আর নাই, সোণা মণি মুক্তায় কি তাঁহার ঋণ শোধ হয়?—দুনিয়ায় কি আর অমন মানুষ নাই?"

"আমি তো আর দেখি নাই।"

"একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব?"

"কি কথা?"

"তুমি যথার্থ উত্তর দিবে?"

"মিছা কহিতে কবে শিখিলাম?"

"তা না;—মনের কথা বলিবে?"

"তুই জিজ্ঞাসা করিলে কোন্ কথা গোপন করিয়া থাকি?"

"বিবাহে এখনো তোমার ইচ্ছা নাই?

"না; তা তুই জানিস্।"

"কেন নাই? মন—মনের মত মানুষ পাও না বলিয়া ইচ্ছা নাই?—অথবা—তুমি আর কচি খুকি নও, তাই জিজ্ঞাসা করি; রক্ত মাংস

দিয়াই বিধাতা তোমাকে গড়িয়াছিলেন ?—কোন—কাহাকেও—কোন অসম্ভব স্থলে চিত্ত হারাইয়া ফেলিয়াছ ?"

সুরত স্থির মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিল ;—

"পিয়ার, এ কথা তো তুই আরও এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলি ?"

"করিয়াছিলাম ; কিন্তু আজ আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। বাবুসাহেব—বাবুসাহেবের সহিত যদি—যদি তোমার বিবাহ "

সুরত চমকিয়া উঠিল ; একি কথা !—বলিল ;—

"ভাইসাহেব যে ভাই ! পিয়ার, তুই ক্ষেপিয়াছিস্ ? তিনি ভাই, আমি বহিন্ ! তিনি হিন্দু, আমি মুসলমান ! তুই পপাত যা। রহস্যের কি আর বিষয় পাইলি না ?"

"ভাই বহিন্‌ই বল, আর যাই বল, এ ত শুধু স্নেহভালবাসার সম্বন্ধ মাত্র ; রক্ত সম্বন্ধ তো কিছুই নাই ! তিনি হিন্দু ; কিন্তু তোমার মত রূপগুণ, ধন দৌলত, শিক্ষা সহবতের স্ত্রী পাইলে অনেক হিন্দু মুসলমান হয়।"

"তোর কথা শুনিয়া ঘৃণা পায় ; তথাপি বলি, শোন্, ভাই-সাহেব যদি মুসলমান হইতেন, যদি পবিত্র মুসলমান ধর্ম্মে তাঁহার মতি হইত, তাহা হইলে, আমরা মুসলমান, আমাদের তো পরম আনন্দের বিষয় হইত। কিন্তু শুধু ধন দৌলত অথবা রূপবতী স্ত্রীলাভের লোভে যদি কেহ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তবে সে শঠ, প্রতারক, বেইমান ! এমন লোকের কথা মনে করিতে ঘৃণা হয় ! ভাইসাহেবকে তুই এখনো চিনিস্ নাই।"

"তা হইতে পারে। কিন্তু তুমি হৃদয়ে এ আগুন পুষিয়া চিরকাল দগ্ধ হইবে কেন ?"

"কি আগুন রে, পিয়ার ?"

পিয়ার ইতস্ততঃ করিল, কিছু ভয়ও পাইল, তথাপি বলিল ;—

"তুমি রাগ করিও না,—আমার মনে হয়, তোমার চিত্ত আর তোমাতে নাই। তুমি—তুমিও তাহা বুঝিতে পার নাই ; তাহা অন্যের বশ—বাবুসাহেবকে তাহা দিয়া ফেলিয়াছ !"

লজ্জা ঘৃণা ক্রোধে সুরতের মুখ চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্ষণকালের জন্য তাহার মুখ ফুটিল না। শেষে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সুরত বলিল ;—

"দূর হ, আমার সম্মুখ হইতে দূর হ। যা মুখে আসিবে, তুই তাই বলিবি ?"

অভিমানভরে সুরত কাঁদিয়া ফেলিল ; কাঁদিতে কাঁদিতে শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। হিতে বিপরীত দেখিয়া পিয়ার অত্যন্ত অপ্রতিভ হইল, কিন্তু মাসহারা ঠিকা বাঁদীর মত বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গেল না। শয্যার কোণে বসিয়া নীরবে সুরতের রাঙ্গা পা দুখানিতে হাত বুলাইতে লাগিল।

সে দিন গভীর রাত্রিতে শয্যায় শুইয়া সুরত ভাবিতে লাগিল ;—কেন পিয়ার এ কথা বলিল ? কেন তাহার মনে এ সন্দেহ আসিল ? কেন পিয়ার এ সন্দেহ করিল ;—ভাইসাহেব রূপবান বলিয়া ? ভাইসাহেব তো পরম রূপবান, অমন রূপ তো আর দেখি নাই। ভাইসাহেব বলবান ? গুণবান ? অমন বল ক'জনের আছে ? অমন সাহস কাহার ? অমন দয়া মায়া স্নেহ মমতা কাহার আছে ? অমন চরিত্র কাহার ? দেখিতে শুনিতে চরিত্রে ব্যবহারে অমনটী তো সংসারে দুর্লভ ! ভাইসাহেবকে আমি ভালবাসি ? ভালবাসি বৈ কি; তিনি আমাকে দস্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে প্রাণে বাঁচাইয়াছেন, আমার মান ইজ্জত রক্ষা করিয়াছেন, সাহজাদীর বাঁদীগিরী হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহাকে ভালবাসিব না ?

প্রাণ দিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিব। চিরকাল—যতদিন বাঁচিব তাঁহাকে ভাল বাসিব।—কিন্তু পিয়ার কেন এ কথা বলিল? মনে করিতে লজ্জায় সুরত মরমে মরিয়া গেল, অভিমানে সুরতের চক্ষে জল আসিল। সুরত অনেক ভাবিল, নিজের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিল, হেমেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় দিন হইতে এ পর্য্যন্ত যে. দিন যাহা ঘটিয়াছে, তাহা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিল, তাহার রমণীহৃদয়ের নিভৃত কক্ষদেশ এই নূতন কথার নূতন আলোকে কত খুঁজিয়া দেখিল;- কিছু না! ভাইসাহেব তো ভাইসাহেব, আর কিছুই না। পরম শ্রদ্ধা. পরম ভক্তি, পরম প্রীতিভাজন, সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে অবিচ্ছিন্ন পবিত্র ভালবাসার পাত্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা! ভাইসাহেব—ভাই-সাহেব।

তখন রাত্রি প্রভাত হইয়া আসিতেছিল। নিষ্কলঙ্ক পবিত্রহৃদয়া সুরত তখন প্রশান্ত চিত্তে নিদ্রাভিভূত হইল।
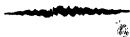
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পিয়ারের বিবাহের দিন আসিল। সেদিন খাঁসাহেবের বাড়ীতে বড় ঘটা। খাঁসাহেব পিয়ারকে স্বীয় কন্যার ন্যায় দেখিতেন। তাহার চরিত্র ব্যবহারে, তাহার বুদ্ধি বিচক্ষণতায় খাঁসাহেব তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। খাঁসাহেব স্বয়ং কন্যাকর্ত্তা। সাদকও অনেক দিনের প্রিয় চাকর : প্রভুভক্ত, বিশ্বাসী, সাহসী, বুদ্ধিমান। অনেক দিন হইতে খাঁসাহেবের ইচ্ছা, উভয়ের বিবাহ দিয়া ঘর সংসার পাতিয়া দেন। তিনি বহু ব্যয় করিয়া বড় ঘটা করিয়া এই বিবাহের উদ্যোগ করিয়াছেন। সুরতের আজ বড় আনন্দ। পিয়ার তাহার বাঁদী, কিন্তু সুরত কোন দিন তাহাকে বাঁদী বলিয়া ভাবে নাই ; প্রিয় সঙ্গিনী, অন্তরঙ্গ সখী, মর্ম্মজ্ঞা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় চিরকাল পিয়ারকে দেখিয়াছে। সুরত অনেক দিন হইতে জানে, পিয়ার সাদেককে ভালবাসে, সাদেকও অনেক দিন হইতে পিয়ারের অভিলাষী ; কিন্তু স্বয়ং সুরতের নিজের বিবাহে অনিচ্ছা বা বিলম্ব দেখিয়া তাহারাও বিবাহে বিলম্ব করিয়াছে। আজ তাহাদের বিবাহ ; সুরতের বড়ই আনন্দ। খাঁসাহেব, বৃদ্ধা বেগম সাহেবা, সুরতউন্নিসা সকলে নানাবিধ বস্ত্রালঙ্কার পিয়ারকে উপহার দিয়াছেন। হেমেন্দ্রলালও রামমোহনকে দিয়া পিয়ারের জন্য সাড়ী ও একছড়া সোণার হার পাঠাইয়া দিলেন। রামমোহন তাহা বৃদ্ধা বেগমের নিকট পৌঁছাইয়া দিল। সুরত সেখানে ছিল ; তখনই জোর করিয়া সেই সোণার হার পিয়ারের গলায় পরাইয়া দিল। ভাই-সাহেবের উপহার সুরতের চক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু অনেক সাধ্যসাধনা টানাটানি করিয়াও সুরত সাড়ী খানা তখন পিয়ারকে পরাইতে পারিল না।

বিবাহ আমোদ প্রমোদ আহার ইত্যাদি শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইল। আজ আর পিয়ার স্বাধীন নহে, আজ হইতে আধেলার বশ হইয়াই চলিতে হইবে। অন্দর মধ্যেই এক প্রকোষ্ঠ পিয়ার এবং সাদেকের শয়নগৃহ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুরত জোর করিয়া পিয়ারকে ভাল সাড়ী পরাইয়াছে, ভাল ভাল গহনায় তাহার সকল শরীর সাজাইয়াছে, সুন্দর সুর্ম্মা পরাইয়া তাহার আয়ত চক্ষুর শোভা আরও বর্দ্ধিত করিয়াছে; নিজের হাতে জোর করিয়া তাহার কেশ-পাশ বেণীবদ্ধ করিয়া তৎকাল প্রচলিত উত্তুঙ্গ খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছে।

রাত্রি অধিক হইল। সুরত একজন বাঁদীকে বলিল;—

"পিয়ারকে ঘরে লইয়া যা।—আজ আর কত দেরি করিবি, পিয়ার?"

বাক্‌বিদগ্ধা পিয়ারের মুখ আজ বন্ধ হইয়াছে। এতকালের মুক্ত পক্ষিণী আজ স্বেচ্ছায় পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছে। জ্ঞানকৃত অপরাধলজ্জিতা প্রবীণা পিয়ার সুরতের মৃদু পরিহাসোক্তির উত্তর দিতে পারিতেছে না। শেষে বলিল;—

"তোমার ঘুম পাইয়াছে? চল, তোমাকে ঘরে রাখিয়া আসি।"

"আমি একাই যাইতে পারিব। তুই তোর ঘরে যা।"

"তুমি একা যাইবে?"

"কি করিব? তোকে তো আর রোজ পাইব না!"

"কেন পাইবে না?"

"পরের ঘর করিবি, তোর স্বাধীনতা কোথায়?"

বৃদ্ধা বেগম সাহেবা সেখানে আসিলেন, হাসিয়া বলিলেন;—

"পায়ে বেড়ি পরিয়াছিস্, এখন চলা ফেরা পরের বশ, পিয়ার!"

সকলে হাসিয়া উঠিল। পিয়ার মুখভঙ্গি করিয়া বলিল;—

"এমন বেড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিব।"

সুরত বলিল ;—'তা যখন পারিস্, ভাঙ্গিস ; এখন যা। আয়, হাবি, চল্, আমরা শুইগে।"

সুরত উঠিয়া নিজের শয়ন ঘরের দিকে চলিল। হাবি পিয়ারকে বলিল ;—

"তা আমিই আছি, তুই নয় আজ একদিন না-ই গেলি।"

হাবিও চলিল। পিয়ারও উঠিল। পিয়ার শয্যা ঝাড়িয়া মুছিয়া না দিলে শয়নে সুরতের তৃপ্তি হয় না, পিয়ার কাছে বসিয়া বাতাস না করিলে শয়নেও তাহার নিদ্রা হয় না, পিয়ার সে ঘরে না শুইলে নিদ্রায়ও তাহার সোয়াস্তি হয় না ;—সেই সুরত আজ একটা নূতন বাঁদীর পরিচর্য্যায় তৃপ্ত হইবে ? আজ কিনা পিয়ার সুরতের শয্যাটীও ঝাড়িয়া মুছিয়া দিবে না !—পিয়ারও উঠিল।

সুরত নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। হাবি কক্ষের দ্বারে পৌঁছিয়া হাসিয়া বলিল ;—

"পিয়ারবিবি, তুই আর কেন আসিতেছিস্ ? সেখসাহেব আর কত রাত বসিয়া থাকিবে ?"

হাবি ঘরে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতে লাগিল। পিয়ার ছাড়িল না; সেখানে পৌঁছিয়া বাহির হইতে দরজা ঠেলিতে লাগিল। হাবি খিল আঁটিয়া দিতে পারে নাই, দিতে চেষ্টা করিল। 'খুলে দে, খুলে দে'। বলিয়া পিয়ার ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। এমন সময় ভিতর হইতে কি যেন একটা শব্দ আসিল, সুরতবিবির গলার বিকৃত শব্দ আর কেমন যেন একটা টানাটানি ধস্তাধস্তির শব্দ ! শব্দ শুনিয়া পিয়ার খুব জোরে ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল। ঘরে আলো ছিল। পিয়ার দেখিতে পাইল, কে যেন একটা বিকটাকার বলবান পুরুষ এক হাতে সুরতবিবির মুখে স্যাড়ীর আঁচলের প্রান্তভাগ গুঁজিয়া দিতেছে, এবং আর এক হাতে তাহাকে জোর করিয়া জানালার দিকে টানিয়া

নিতেছে। দেখিয়াই পিয়ার চীৎকার করিয়া উঠিল। বিকটাকার লোকটাও একটা অস্পষ্ট কাতরোক্তি করিয়া সুরতবিবিকে মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। পিয়ার চেঁচাইয়া উঠিল ;—

"তোমরা এস গো, ঘরে ডাকাত পড়িয়াছে !"

ক্ষিপ্রদৃষ্টি পিয়ার সেই মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইল যে, সুরতের হাতে একখানা ছুরিকা, কিন্তু তাহার গায়ের কাপড় রক্তময়।

পিয়ার। "তোমাকে মারিয়াছে ?"

সুরত। "না, আমি লোকটাকে ছোরার ঘা মারিয়াছি।"

পিয়ার চাহিয়া দেখিল, লোকটা জানালায় বদ্ধ একটা দড়ির সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছে ; তখন সুরতের হাত হইতে ছোরা লইয়া তাড়াতাড়ি দড়ির সিঁড়ি কাটিয়া দিল। তখনই কি যেন একটা ভারি জিনিস জানালার নীচে ভাগীরথার শানবাঁধা তীরে টাপ্ করিয়া পড়িল। এদিকে পিয়ারের চীৎকারে বৃদ্ধা বেগমসাহেবা সেঘরে প্রবেশ করিলেন, দুই তিন জন বাঁদীও আসিল। ক্ষণকালের মধ্যে খাঁসাহেব আসিলেন, সাদেক আসিল, কাদের আসিল। কি হইয়াছে ? কে খুন হইয়াছে ? কোথায় ডাকাত ? সুরত কোথায় ?—ইত্যাদি প্রশ্নে এবং উত্তরে লোকজনের চীৎকার কোলাহলে একটা ভারি গণ্ডগোল উপস্থিত হইল।

গোলযোগ থামিয়া গেলে জানা গেল যে, সুরত ঘরে প্রবেশ করিয়া শয়নার্থে খাটে উঠিবে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে যেন তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া ফেলিল। সুরত চীৎকার দিতেছিল, এমন সময় লোকটা তাহার মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজিয়া দিতে লাগিল। সুরত গদীর নীচু হইতে ক্ষুদ্র ছুরিকা বাহির করিল লোকটা তাহা দেখিতে পাইল না ; সে তাহাকে জোর করিয়া জানালার দিকে লইয়া চলিল। পিয়ার দরজা খুলিবার চেষ্টা করিতেছে, বাঁদী হাবি খুলিতে দেয় না।

অবশেষে পিয়ার খুব জোরে ধাক্কা মারাতে দরজা খুলিয়া যায়। পিয়ারকে ঘরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া লোকটা থতমত খাইল। সুরত এই অবসরে লোকটার বুকে সেই ছোরা বসাইয়া দেয়। আহত লোকটা তখন সুরতকে ফেলিয়া দিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। সুরত কোন আঘাত পায় নাই, কেবল তাহার বেশভূষা বিপর্য্যস্ত হইয়াছে এবং পরিধানের সাড়ী জামা আহত লোকটার উচ্ছ্বসিত রক্তে সিক্ত হইয়াছে। পিয়ার তাড়াতাড়ি সুরতের সাড়ী জামা পরিবর্ত্তন করাইল; সকলে মিলিয়া তাহাকে শান্ত করিতে লাগিল, বাতাস দিতে লাগিল।

পিয়ার হাবিকে তথায় দেখিতে না পাইয়া বুঝিতে পারিল যে, সেও এই ভয়ানক কাজে লিপ্ত আছে। তখন তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। পিয়ার ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার দিতেই হাবি তথা হইতে পলায়ন করে, কিন্তু অন্দরের দরজা পার হইতে পারে নাই; দরজার পাশে লুকাইয়া ছিল, অনুসন্ধানে ধরা পড়িল।

এদিকে বাড়ীর বাহিরে ভাগীরথীর তীরেও ভারি গোলযোগ। পিয়ারের বিবাহের রাত্রি, হেমেন্দ্রের বাড়ীতে থাকারই কথা; কিন্তু নবাবজাদার বিশেষ তলপে হেমেন্দ্র হিরাঝিলে গিয়াছিলেন। এত রাত্রিতে নৌকাযোগে বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন, রামমোহনও তাঁহার সঙ্গে ছিল। খাঁসাহেবের অন্দর-দরজার নিকট অন্ধকারে একখানা নৌকা বাঁধা দেখিয়া, কাহার নৌকা, এত রাত্রিতে এখানে নৌকা কেন?—ভাবিতে ভাবিতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেন। এমন সময় দোতালার উপর চীৎকার এবং শূন্য হইতে হঠাৎ একটা ভারি জিনিস্ তীরে পতনের শব্দে হেমেন্দ্রলাল বিস্মিত হইলেন। তীরবেগে নিজের নৌকা সেখানে আনিয়া লাফ দিয়া হেমেন্দ্রলাল ঘাটে বাঁধা সেই নৌকার উপর পড়িলেন। রামমোহন তীরে নামিয়া দেখিল, একটা লোক জলে পড়িয়া সাঁতরাইয়া পালাইল। এদিকে দোতালার উপর চীৎকার

আরও বৃদ্ধি পাইল। যে নৌকায় হেমেন্দ্রলাল উঠিয়াছিলেন তাহাতে তিন চারি জন মাঝি ছিল, তাহারা বিপদ দেখিয়া নৌকা হইতে জলে পড়িয়া পলায়ন করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এত ঘটনা। খাঁসাহেবের বাড়ী হইতে লোকজন সেখানে আসিয়া পৌছিল। অনুসন্ধানে অট্টালিকা সংলগ্ন অল্প পরিসর তীরভাগে আহত অবস্থায় একজন মানুষ পাওয়া গেল এবং নৌকার মধ্যে লুক্কায়িত একজন স্ত্রীলোকও দেখা গেল। হেমেন্দ্রলাল তাহাদিগকে লইয়া খাঁসাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

অল্প সময়ের মধ্যেই সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ধৃত পুরুষটীর মুমূর্ষ অবস্থা, তাহার বাক্‌শক্তি ছিল না। পিয়ারের মনে একটা প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হইল। একজন স্ত্রীলোক ধরা পড়িয়াছে শুনিয়া স্ত্রীলোকটীকে সে বাড়ীর ভিতর আনাইল। দীপালোকে তাহাকে দেখিবামাত্র পিয়ার ক্রোধে অধীর হইয়া নূতন পৈছা কাঁকন পরা হাতে তাহার মুখে এমন একটা চড় মারিল যে, স্ত্রীলোকটী ঘুরিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। তখন পিয়ার—বলিতে লজ্জা হয়—ভূমিতে পতিত সেই স্ত্রীলোকটীর মুখে আশি ভরি পেটা ও রূপার মল-পরা পায়ে একটা এমন লাথি মারিল যে, তাহার নাকের বেসর বিচূর্ণ হইয়া গেল এবং তাহার মুখ ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। অনেক দিনের শমিত ক্রোধ পিয়ার আর সংযত রাখিতে পারিল না। বাঁদী হাবি এবং ধৃত স্ত্রীলোকটীর জবানবন্দী লইতে লইতে রাত্রি ভোর হইয়া আসিল। নববিবাহিতা পিয়ারের আর সেদিন বাসরঘর করা হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মুরসিদাবাদের পথে নৌকা হইতে সুরৎ বিবিকে অপহরণের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়াও মিরজা গোলামআলি আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বাঁদা পান্না পিয়ারের কৃত অপমান ভুলিতে পারে নাই, সে অনবরত সুরতের রূপের কথা, গুণের কথা শুনাইয়া শুনাইয়া মিরজা সাহেবের উৎকট লালসা উজ্জীবিত রাখিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যে সুরতের বিবাহ হয় নাই, মিরজা এবং পান্না তাহার খবর লই য়াছে। মিরজা পান্নাকে দুই তিন বার মুরসিদাবাদ পাঠাইয়াছেন। নিকটে থাকিয়া সংবাদ দিবার এবং সুযোগ অনুসন্ধান জন্য পান্না নিজের বিশ্বস্তা বাঁদী হাবিকে খাঁসাহেবের অন্দরে প্রবিষ্ট করাইয়াছে। এই বিশ্বস্তা বাঁদীর নাম হবিব উন্নিসা কি এমনই একটা কিছু ছিল, ক্রমে হবিহন, হবি, অবশেষে হাবি এই প্রচলিত নামেই সে পরিচিত হইয়াছিল। হাবি যখন যাহা শুনিত, তাহা পান্নাকে জানাইত। মতি-ঝিলের প্রাসাদ পান্নার আশ্রয় হইয়াছিল। মিরজা সাহেবও যখন মুরসিদাবাদ আসিতেন, মতিঝিলে নোয়াজেস মহম্মদের প্রাসাদেই তিনি আতিথ্য পাইতেন। নোয়াজেস মহম্মদের মৃত্যুর পরেও মিরজা ঘেসেটী বেগমের অনুগ্রহে বঞ্চিত হন নাই। মিরজা জাহাঙ্গীর নগরের একজন বুনিয়াদি লোক। তাঁহার যোগেও ঘেসেটী বেগম রাজা রাজবল্লভ এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণবল্লভের সঙ্গে কথা চালাইতেন, সুতরাং মিরজা ঘেসেটী বেগমের অনুগ্রহ ভাজন ছিলেন। আজ একমাস হইল মিরজা মুরসিদাবাদে আছেন। পান্না আর হাবি সুযোগ খুঁজিতেছিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া পিয়ারের বিবাহ রাত্রির গোলযোগে সুরতকে

অপহরণের বুদ্ধি স্থির করিয়াছিল। অন্দর দরজা দিয়া সুরতকে স্থানান্তর করা অসম্ভব জানিয়া জানালা দিয়া সুরতকে সরাইবার পরামর্শ করিয়া তাহার আয়োজন করিয়াছিল। স্বয়ং পান্নাও আসিয়াছিল। কিন্তু যে প্রকারে তাহাদের অভিসন্ধি বিফল হয়, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

এখন পূর্ব্বকথা কিঞ্চিৎ বলিতে হইবে; সে অনেক দিনের কথা, পিয়ার তখন বালিকামাত্র। পিয়ারের পিতা একজন গায়ক ছিল। মেহেরআলি নামক এক যুবক তাহার নিকট গান বাজনা শিখিত। তখন জাহাঙ্গীরনগরে গান বাজনার খুব চর্চ্চা ছিল। মেহেরআলি সামান্য রকম কিছু লেখাপড়াও জানিত; গীতবাদ্যে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার জন্মিল। কিন্তু তাহার আয় সামান্য, বাবু-আনা বড় বেশী ছিল। সে আমীর ওমরাহের মজলিশে ফিরিত, বাইজী কালোয়াতের পাছে পাছে ঘুরিত, দুপয়সা হাতে হইলে সৌখীন ব্যয়ে তাহা উড়াইয়া দিত। পিয়ারের পিতার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে এই মেহেরআলির সঙ্গেই পিয়ারের বিবাহ হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পিয়ার স্বামীর ঘরে আসিল। অভিভাবিকা একমাত্র শাশুড়ী বৃদ্ধা, অন্ধ এবং প্রায় বধির। গৃহের সমস্ত কাজকর্ম্ম পিয়ার করে,—বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ও শুশ্রূষা করে, স্বামীর সঙ্গে দেখা সপ্তাহে দুএক দিন হইত। মেহেরআলির গতিবিধি অনির্দ্দিষ্ট। ক্রমে পিয়ার কৈশোর সীমায় আসিয়া পৌছিল। গীত সঙ্গতে তাহার স্বাভাবিক অনুরক্তি ছিল, বাহিরে বসিয়া মেহেরআলি যে গান করিত, অন্দরে নির্জ্জনে বসিয়া পিয়ার তাহার আমেজ অভ্যাস করিত। যৌবনোন্মেষে পিয়ার অপরূপ লাবণ্যবতী হইয়া উঠিল; সঙ্গীতেও সে অন্তঃপুরীকাসুলভ কিঞ্চিৎ দক্ষতা লাভ করিল। কিন্তু মেহেরআলির স্বভাব দিন দিন বিকৃত হইতেছিল, কুসংসর্গে পড়িয়া সে মদ্যপান অভ্যাস

করিল; অন্যান্য প্রকারেও তাহার চরিত্র কলুষিত হইয়া উঠিল। তখন পিয়ারের বয়স চৌদ্দ কি পোনের বৎসর মাত্র। স্বামী বাধ্য করিবার যুক্তি কৌশল তখনও সে শিখে নাই। বৃদ্ধা শাশুড়ী তো বাঁচিয়া থাকিতে মৃত। মেহের অনেক দিন রাত্রে বাড়ীতে ফিরিত না। ফিরিলেও কোন কোন দিন ভিতর বাড়ীতে যাইত না, বাহিরের ঘরেই শুইত। ক্রমে পিয়ারের সন্দেহ হইল, শেষে সে টের পাইল, তাহার কপাল পুড়িয়াছে। একদিন অনেক রাত্রিতে মেহের একজন স্ত্রীলোক লইয়া ভিতর বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সেদিন স্বামীস্ত্রীতে একটা কলহ হইল। কিন্তু পিয়ার আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। স্ত্রীলোকটা পান্না, তখন তাহার বয়স বাইস তেইস বৎসর, আলমবাজারে তাহার ঘর, ব্যবসায়ে নর্ত্তকী। পোড়ারমুখী পিয়ারের গৃহসংসারে আগুন জ্বালিয়া দিল।

বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মেহের আর গৃহে বড় আসে না; কোথায় থাকে, কে অনুসন্ধান করে?—কোন কোন দিন নেশায় ভোর মেহের সেই ডাকিনীটাকে সঙ্গে লইয়া রাত্রিতে ঘরে আসিত। এই ভাবে কতক দিন গেল। এক দিন সংবাদ আসিল, আলমবাজারের এক নর্ত্তকীর গৃহে মেহেরআলির মৃত্যু হইয়াছে। কয়েক দিনের মধ্যেই বৃদ্ধা শাশুড়ীরও মৃত্যু হইল। সহায়হীনা পিয়ার খাঁসাহেবের অন্তঃপুরে আশ্রয় পাইয়া সুরতউন্নিসার বাঁদী হইল। খাঁসাহেব তাহাকে স্বীয় কন্যার ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিতেন।

পান্না কতক দিন পরে নর্ত্তকীর ব্যবসা ছাড়িয়া বাঁদীগিরি আরম্ভ করে। কিছুকাল জাহাঙ্গীরনগরে থাকিয়া শেষে রাজধানী মুর্শিদাবাদ যায়। পরিশেষে পুনরায় তথাতে ফিরিয়া মিরজা গোলাম আলির অন্দরে প্রবেশ করে। পরে যে ভাবে খাঁসাহেবের বাড়ীতে পান্নার সঙ্গে পুনরায় তাহার দেখা হয় এবং মুর্শিদাবাদের পথে নৌকায় যে যে ঘটনা হয়, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

খাঁসাহেব বৃদ্ধা বেগমসাহেবা ও হেমেন্দ্রলাল মিলিয়া কর্ত্তব্য অবধারণ করিলেন। পিয়ারও সেখানে উপস্থিত ছিল। নবাবজাদার সাহায্যে মিরজা গোলামআলি ও পান্নার শাস্তিবিধানের জন্য হেমেন্দ্রলাল এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন; কিন্তু খাঁসাহেব তাহাতে সম্মতি দিলেন না। ঘরের খবর এইরূপে বাহিরে রাষ্ট্র করা তাঁহার উচিত বোধ হইল না। তিনি বলিলেন;—

"আমি আর বেশী দিন দেশে থাকিতেছি না। দুষ্টের শাস্তিবিধান বিধাতা করিবেন।"

"হেমেন্দ্র। "কিন্তু মিরজার উচিত শাস্তি না হইলে সে ভবিষ্যতে পুনরায় দিদিসাহেবার অনিষ্ট করিতে পারে।"

খাঁসাহেব। "তাহা আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি। আমার মত ফিরিয়াছে। কাবা সরিফে যাইবার সুরতের প্রবল আগ্রহ, আমি আর তাহাতে বাধা দিব না। তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারিলাম না; অসহায়া বালিকাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব? আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব।"

খাঁসাহেবের অভিমত শুনিয়া সকলে নীরব হইল।

রাত্রি প্রভাতে পান্না ও হাবি খাঁসাহেবের বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইল। পিয়ারের পরামর্শে সাদেক তাহাদের মাথার চুল ছাঁটিয়া কাটিয়া নিতান্ত অসমান করিয়া দিয়াছে, মুখে চুন কালী মাখাইয়া দিয়াছে। বিধ্বস্ত, অপমানিত পান্না ও হাবি বিপর্য্যস্তবেশে নীরবে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে প্রাণ লইয়া সে বাড়ী হইতে প্রস্থান করিল!

মিরজা গোলামআলি সাহেবও সেই দিনই মুরসিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন।

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

খাঁসাহেব কাশেমআলির মক্কা সরিফে যাত্রার দিন নিকটবর্ত্তী হইল। যাত্রার আয়োজন উদ্যোগ হইতে লাগিল। কন্যা সুরতউন্নিসা সঙ্গে যাইবেন, স্থির হইয়াছে। বাঁদী পিয়ারের ইচ্ছা, সুরতের সঙ্গে যায়; কিন্তু সাদেকের সেরূপ ইচ্ছা নহে। দুর্গম আরব দেশে কষ্টময় জীবন এত শীঘ্র আরম্ভ করিবার আগ্রহ তাহার মনে এখনো উপস্থিত হয় নাই; ঈশ্বর কৃপা করিলে পরে উপযুক্ত সময়ে সস্ত্রীক যাইবে। অনেক মান-অভিমান, বাদ-অনুবাদের পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি হইল। কাশেমআলী খাঁ, সরিফন বেগম এবং সুরতউন্নিসা মিলিয়া ঠিক করিয়া দিলেন, সাদেক ও পিয়ার সম্প্রতি দেশেই থাকিবে, শেষে সুবিধা মতে উভয়ে মক্কা সরিফে যাইয়া খাঁসাহেবের সঙ্গে মিলিত হইবে। সংস্কারের বন্ধন এমনি দৃঢ় বন্ধন যে, শেষে অকেজো আধেলারই জয় হইল। খাঁসাহেব তাহাদের ভরণপোষণের সমস্তব্যয়েরু বন্দোবস্ত করিলেন। খাঁসাহেব সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। ঢাকা জালালপুরের রসুলপুর দিগর বিস্তৃত জমিদারী, জাহাঙ্গীরনগরের মধ্য ইমারত প্রকাণ্ড বাগান-বাড়ী, সহর মুরসিদাবাদের বাড়ী, চাকলে মুরসিদাবাদের জমিদারী, স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তির-বিলি ব্যবস্থা তিনি শীঘ্রই শেষ করিলেন।

মক্কা সরিফে যাত্রার এক দিবস পূর্ব্বে খাঁসাহেব হেমেন্দ্রলালকে অন্তঃপুরের বৈঠকখানায় ডাকাইলেন। সেখানে খাঁসাহেব, সরিফ-

উন্নিসা বেগম এবং সুরতউন্নিসা উপস্থিত ছিলেন; বাঁদী পিয়ার, মেহের ও ছিল, সাদেক ও এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিল। সকলেই স্থির গম্ভীর, সকলের মুখেই বিষাদের চিহ্ন। আশৈশব যে দেশে যে স্থানে বাস, যে স্থানের শত লোকের সহিত শত প্রকারে ঘনিষ্ঠতা, যে স্থানের জল বায়ু, তরু লতা এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি সামান্য মূক প্রাণী পর্য্যন্তও স্নেহসূত্রে অন্তরে গাঁথা, সেস্থান চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া মহাতীর্থে—স্বর্গরাজ্যে গমন করিতেও বা হৃদয়বান্ মহাপুরুষের চক্ষে অশ্রু সঞ্চরিত হয়। মায়ার বন্ধন বড় দৃঢ় বন্ধন। খাঁসাহেবের বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে চলিল, তথাপি তাঁহার চক্ষে জল দেখা দিয়াছে। সুরতউন্নিসা সংসারের মায়ায় বদ্ধ হইবেন না, পিতৃদেবের সঙ্গে পবিত্র ভূমিতে যাইয়া ঈশ্বর চরণে জীবন উৎসর্গ করিবেন বলিয়া যে আশা এতকাল পুষিয়া আসিতেছেন, তাহা সফল হইতে চলিল; তথাপি সেই সুন্দর আয়ত চক্ষে অশ্রু সঞ্চরিত হইয়াছে। সরিফন বেগম অশ্রুমুখী, মেহের বিমর্ষ, পিয়ার নীরবে কাঁদিয়া আকুল, সাদেকের হৃদয়ও গলিয়াছে, সেও কাঁদিয়া ফেলিয়াছে।

হেমেন্দ্রলাল সেখানে উপস্থিত হইয়া খাঁসাহেব ও বৃদ্ধা বেগম-সাহেবাকে বিনম্র সেলাম করিয়া সুরতউন্নিসাকে নীরবে সস্নেহ অভি-বাদন করিলেন।

খাঁসাহেব বলিলেন;—"বাবা হেমেন্দ্র, তোমাকে ডাকাইয়াছি। কাল ভোরে যাত্রা করিব, অনেক কথা বলিবার আছে।"

হেমেন্দ্র। "অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম, কিন্তু সে বয়সে সে অভাব অনুভব করি নাই, আজ সে অভাব, সে দুঃখ বুঝিতে পারিতেছি;— আজ পুনরায় পিতৃহারা হইতেছি।"

হেমেন্দ্রের চক্ষু অশ্রুময়। খাঁসাহেবও ভগ্ন স্বরে কহিলেন;— "হেমেন্দ্র, অনেক দিন হয় আমি এক পুত্র হারাইয়াছিলাম, কিন্তু

ঈশ্বরের অনুগ্রহে এ ক'বছর হইল সেই পুত্রের স্থানে তোমাকে পাইয়াছি। তোমাকে পাইয়া আমি সে পুত্রশোক ভুলিয়া গিয়াছি; আজ তোমাকেও ছাড়িতে চলিলাম!"—ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া খাঁসাহেব আবার বলিলেন;—"হেমেন্দ্র, আমরা চলিলাম, সে দূরদেশ হইতে সংবাদ পাঠাইবার সুবিধা হইলে, এবং আমরা বাঁচিয়া থাকিলে, কখনো কখনো আমাদের সংবাদ পাইবে।"

হেমেন্দ্র নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। খাঁসাহেব বলিলেন;—"আমার বিত্ত সম্পত্তি সম্বন্ধে একটা বন্দোবস্ত করিয়াছি; তোমাকে তাহা এতক জানাই নাই, এখন জানাইতে হইবে।"

খাঁসাহেব কাগজের একটা মোড়ক বাহির করিলেন, বলিলেন;— "সুরত আমার সঙ্গে চলিল, আমাদের আবশ্যক মত টাকা কড়ি আমরা সঙ্গে লইলাম। ভবিষ্যতে যদি আরও প্রয়োজন হয়, তোমাকে জানাইব। ঢাকা জালালপুরে আমার কিছু ভূমিসম্পত্তি আছে, ধন সম্পত্তি দিয়া ফকির আর কি করিবে? তোমাকে আমি পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, আমার সে সমস্ত ভূসম্পত্তি তোমাকে দান করিয়া গেলাম। এই মোড়কের মধ্যে সেই দানপত্র আছে, তাহাতে নিজামতি মঞ্জুরী মোহর ছেপ্ত আছে। আজ হইতে তুমি আমার সে সম্পত্তির মালিক হইলে।"

ক্ষণকালের জন্য হেমেন্দ্রলালের বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শেষে গদগদ কণ্ঠে বলিলেন;—

"সহায়সম্পত্তিশূন্য, আশ্রয়হীন আমি ভিক্ষা করিতে করিতে অন্নের সংস্থান জন্য সহরে আসিতেছিলাম। আপনি আশ্রয় দিয়া, অন্ন দিয়া, হাতে ধরিয়া পথ দেখাইয়া দিয়া আমাকে স্নেহ যত্নে মানুষ করিয়াছেন। আপনার অনুগ্রহ এবং আশীর্ব্বাদে এখন আমার কোন অভাব নাই। আজ এমন আদেশ কেন করিতেছেন? আমাকে দান করা অপেক্ষা

তো অনেক উচ্চতর শত কার্য্যে এই সম্পত্তি নিয়োগ করিতে পারিতেন, তবে—"

খাঁসাহেব। "তুমি আমার পুত্র, আমার সম্পত্তিতে তোমার অধিকার।"

হেমেন্দ্র। "দিদিসাহেবা আছেন, তাঁহার জন্য—"

খাঁসাহেব। "সে কথা অনেক বার ভাবিয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে এবিষয়ে আমার আলাপও হইয়াছে। আমি যে বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা আমার ইচ্ছা এবং সুরতের আগ্রহে করিয়াছি। সুরতের জন্যও একটা বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহাও তোমাকে জানাইতেছি। তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাইতেছি, যদি কখনো সুরত এদেশে ফিরিয়া আসে—"

হেমেন্দ্র। "সমস্ত সম্পত্তি দিদিসাহেবার হইবে।"

খাঁসাহেব। "শুন, তাহা হইবে না, এ সম্পত্তি আমি তোমাকে দিয়া যাইতেছি। সুরত আমার সঙ্গে চলিল, সেখানে গিয়া তাহাকে পাত্রস্থা করিব; কিন্তু সে যদি কখনো ফিরিয়া আসে, তাহাকে দেখিবার কেহ না থাকে, তুমিই তো রহিলে;—তাহার ভরণপোষণ, তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ তুমি করিবে, তাহার আপদ বিপদে তুমি দেখিবে। সে তোমার ভগ্নী, তুমি তাহার জেষ্ঠ ভ্রাতা! আর শুন, চাক্‌লে মুরসিদাবাদ মধ্যেও আমার একটী জমিদারী আছে। বর্ত্তমানে তুমিই তাহা ভোগ করিবে। সুরত যদি ফিরিয়া আসে, তবে সে জমিদারী সুরত পাইবে; নতুবা তুমি এবং তোমার ওয়ারিসানই তাহার মালিক হইবে।"

হেমেন্দ্রলালের হৃদয় উদ্বেল তরঙ্গময় হইয়াছিল, তাহার মুখে কথা সরিল না।

খাঁসাহেব। "আর একটা কথা। পিয়ার ও সাদেক আমার অতিপ্রিয় অতি বিশ্বস্ত পরিজন। ইহাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে আমা

অতি কষ্ট হইতেছে। ইহাদের ভবিষ্যৎ জীবনোপায়ের বন্দোবস্ত আমি করিয়াছি। আজ হইতে তুমি ইহাদের আশ্রয় হইলে; রসুলপুরে ইহাদিগকে একটা বাড়ী তুমি করিয়া দিও। ইহাদিগকে আমি তোমার হাতে দিয়া গেলাম।”

পিয়ার ও সাদেক কাঁদিয়া ফেলিল।

হেমেন্দ্র। “পিয়ার আর সাদেক আমার পরম আত্মীয়। আপনার আদেশ আমি কখনো ভুলিব না।”

খাঁসাহেব। “আরও একটী কথা। রসুলপুরে পির সাহ মহম্মদের প্রাচীন দরগা আছে। দরগার কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যয় আছে। পীর, ফকির, মুসাফেরদিগের অতিথি আছে। প্রতি শুক্রবারে সেখানে কোরাণ সরিফ পাঠ হইয়া থাকে, তাহারও ব্যয় আছে। এই সকল কাজ আমি করাইতাম, আমি এদেশ ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি এই দরগার মান্য রক্ষা করিবে, উপযুক্ত ব্যয় চালাইবে, সমস্ত তত্ত্ব তালাপি করিবে;—তুমি হিন্দু, তাহাতে তোমার কোন আপত্তি আছে?”

“আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যতদিন আমি বাঁচিয়া থাকিব, দরগার সমস্ত নিয়ম প্রতিপালিত হইবে, সমস্ত ব্যয় চালাইব। আমার অভাবে আমার উত্তরাধিকারীগণও যাহাতে তাহা করে, তাহার উপযুক্ত বন্দোবস্ত আমি করিব।”

খাঁসাহেব। “তোমাতে আমার অসীম বিশ্বাস। আমার আর কিছু বলিবার নাই। আর একটী কথা বলিব। নিজামত সরকারের অবস্থা, দেশের অবস্থা অতি সঙ্কটময়। এসময় অতি সাবধানে চলিবে; এবিষয় আমি অনেকবার তোমাকে বলিয়াছি।”

হেমেন্দ্র। “আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য।”

খাঁসাহেব। “বহুদিন হইল ঘরবাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছ, হেমেন্দ্র; বাড়ীতে তোমার স্ত্রীপুত্র আছে, তাহারা অনেকদিন তোমাকে দেখিতে

পায় নাই। তোমার পিতৃব্য পিতৃব্যপত্নী আছেন, তাঁহারা তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল।”

হেমেন্দ্র। “ছুটির জন্য নবাবজাদার হুজুরে আরজী করিয়াছিলাম। এখন আপনারা চলিলেন, এখানে আর মন তিষ্ঠিবে না। মনে করিয়াছি, একবার বাড়ী যাইব।”

খাঁসাহেব। “যাইও।—সুরত, বলিয়াছিলে, হেমেন্দ্রকে কি দিবে, কি বলিবে?—এই ত সময়।”

সুরতউন্নিসা দিদিমার নিকট বসিয়াছিলেন, কথা কহিতে চাহিলেন, কথা বাধ বাধ হইয়া উঠিল। সরিফন বেগম বলিলেন;—“সুরত, রাত্রিভোরে যাত্রা করিবে; কবে ফিরিবে, ফিরিবে কিনা, ঈশ্বর জানেন! আর কবে দেখা হইবে!—যাহা বলিবার থাকে, বল।”

সুরতউন্নিসা দিদিমার হস্ত হইতে একটী ক্ষুদ্র বাক্স লইলেন, মৃদুপদে পিতার পদপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া সেই ক্ষুদ্র বাক্সটী খাঁসাহেবের হাতে দিলেন। খাঁসাহেব বাক্সটী খুলিলেন এবং বলিলেন;—

“তুমি নিজ হাতে দাও।—হেমেন্দ্র, এদিকে এস; তোমার স্ত্রীপুত্রকে সুরত সামান্য কিছু উপহার দিবে।”

হেমেন্দ্রলাল নীরবে অগ্রসর হইলেন। সুরতউন্নিসা তখন পিতার হস্ত হইতে মুক্তা বসান এক জোড়া অতি সুন্দর বালা লইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন;—

“ভাইসাহেব, শুনিয়াছি, আমার জ্যেষ্ঠ এক ভাই ছিলেন, আমি তাঁহাকে দেখি নাই, আমি সংসারে আসিবার পূর্ব্বেই তিনি স্বর্গে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।”—সুরতের স্বর মৃদুতর, আরও ক্ষীণ হইয়া উঠিল,—“তাঁহার হাতের এই বালা!”—খাঁসাহেবের চক্ষু হইতে দরবেগে অশ্রুপাত হইতে লাগিল।—“আপনিই আমার জ্যেষ্ঠ ভাই; খোকার হাতে আপনি এই বালা পরাইয়া দিবেন।”

কক্ষমধ্যে এক অতি গভীর বিষাদের স্রোত আসিয়া পড়িল, সকলেই অশ্রুপাত করিতেছিলেন। সুরত তখন পুনরায় পিতার হস্ত হইতে দীপ্তিমান মধ্যমণিবিমণ্ডিত এক ছড়া বহুমূল্য স্বর্ণহার গ্রহণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে বলিলেন ;—

"এ হার আমি অনেকবার পরিয়াছি, বৌদিদিসাহেবাকে আমি কখনো দেখি নাই, তাঁহার সঙ্গে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনাও নাই। আপনি এই হার তাঁহাকে দিবেন। বলিবেন, দূর—অতি দূরদেশে তাঁহার এবং আপনার একটী ছোট ভগ্নী চিরকাল তাঁহার এবং আপনার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে।"

ক্ষণকালের জন্য হেমেন্দ্রলাল নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। খাঁসাহেবের ইঙ্গিতক্রমে তিনি সেই স্বর্ণহার গ্রহণ করিলেন। উড়্নীর প্রান্তভাগ পাতিয়া সেই পবিত্র কণ্ঠপরিচ্যুত অমূল্য অলঙ্কার গ্রহণ করিবার সময়ও হেমেন্দ্রলালের বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, তাঁহার অধরপ্রান্ত স্ফুরিত হইতে লাগিল।

পরিশেষে হেমেন্দ্রলাল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন;—"সংসারে আমার ভাই নাই, ভগিনীও নাই। ভ্রাতৃস্নেহে আমি চিরকাল বঞ্চিত, কিন্তু ভগবানের কৃপায় ভগ্নীর পবিত্র স্নেহ আমি পাইয়াছি; সে স্নেহ, সে দয়া, সে মায়া আমি জীবনে ভুলিব না।"

সুরতউন্নিসা জলভরা চক্ষে অতিনমিত স্বীয় ক্ষুদ্র মস্তক দুই হাতে স্পর্শ করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অভিবন্দনা করিলেন।

সে রাত্রিতে আর হেমেন্দ্রলালের নিদ্রা হইল না। দেবোপম, পিতৃতুল্য সেই মহাপুরুষ এবং দেবীরূপিণী স্নেহকরুণাময়ী সেই কনিষ্ঠা ভগিনী সুদূরদেশে চলিয়া যাইবেন, এ জন্মে আর তাঁহাদের সঙ্গে দেখা হইবে না!—চিন্তা করিতে করিতে উচ্ছ্বসিতহৃদয় হেমেন্দ্রলালের রাত্রি কাটিয়া গেল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে হেমেন্দ্রলাল তাঁহাদিগকে পদ্মাবক্ষে নৌকায় উঠাইয়া দিয়া অতি ব্যথিত ম্রিয়মাণ হৃদয় লইয়া গৃহে ফিরিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাঙ্গলার রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই জটিল এবং বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠিল। নেয়াজেস মহম্মদের মৃত্যুর পরও তাঁহার পত্নী ঘেসেটী বেগমের দুরাশা প্রশমিত হয় নাই। নোয়াজেস মহম্মদ নবাবজাদা মিরজা মহম্মদখাঁর কনিষ্ঠ সহোদর এক্রামউদ্দৌলাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকেই বাঙ্গলার রাজ সিংহাসন দিয়া যাইবার অভিসন্ধি করেন। কিন্তু নোয়াজেসের জীবদ্দশায়ই এক্রামের মৃত্যু হয়। এক্রামের একটী শিশু পুত্র ছিল, নোয়াজেস সেই অপোগণ্ড শিশু মুরাদউদ্দৌলাকেই নিজের উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ঘেসেটী বেগম এখন তাহাকে বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার মছনদে বসাইয়া স্বয়ং রাজত্ব করিবার অভিসন্ধিতে প্রবল ষড়্‌যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিলেন। নিজের প্রিয় পাত্র রাজা রাজবল্লভ এই ষড়যন্ত্রে তাঁহার একজন প্রধান মন্ত্রী এবং সাহায্যকারী। হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যুর পর হইতে রাজবল্লভই প্রকৃত পক্ষে ঢাকার শাসনকর্ত্তা হইয়া নানা উপায়ে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। অবশেষে তিনি স্বীয় পুত্র কৃষ্ণবল্লভের প্রতি ঢাকার কার্য্যভার দিয়া অধিকাংশ সময় মতিঝিলের দরবারেই থাকিতেন। বৃদ্ধ নবাবের শেষ পীড়ার অবস্থায় নিকাশ পত্রের জন্য খুব তাগাদা আরম্ভ হইল, রাজবল্লভ এই সময় মুরশিদাবাদে উপস্থিত ছিলেন। নবাবজাদা মিরজা

মহম্মদ খাঁ যে তাঁহাকে বিষচক্ষে দেখিতেন, তিনি অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই তাহা জানিতেন। নবাবজাদা মছনদে বসিলে যে তাঁহার ক্ষমতা একেবারে লোপ হইবে এবং বহু কালার্জ্জিত বিপুল ধন সম্পত্তি রক্ষা করা যে কঠিন হইবে, তাহাও তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই স্বীয় পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে সমস্ত ধন রত্ন সহ সপরিবারে কলিকাতা রওনা করিলেন, এবং ইংরেজদিগের কাশীমবাজারের কুঠির গোমস্তা মেঃ ওয়াট্‌সন্ সাহেবের নিকট হইতে এক অনুরোধ পত্র লইয়া কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেবের নিকট পাঠাইলেন। ইংরেজও উৎসাহ সহকারে অনুরোধ রক্ষা করিয়া পলায়িত কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় প্রদান করিলেন।

ইংরেজেরাও তখন বেশ বুঝিতে পারিয়া ছিলেন, নবাবজাদা সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে তাঁহাদের ইষ্টলাভ দুরূহ হইবে। ঘেসেটী বেগম যে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার মছনদের জন্য চেষ্টা করিতে ছিলেন, বঙ্গের ধনী মানী ক্ষমতাপন্ন অনেক বিশিষ্ট লোক যে নবাবজাদার চরিত্রে তাঁহার প্রতি নিতান্ত অসন্তুষ্ট, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। রাজবল্লভ যে ঘেসেটী বেগমের উদ্দেশ্য সাধন জন্য মতিঝিলে সৈন্য সংগ্রহ এবং গুপ্ত পরামর্শ করিতেছিলেন, কলিকাতার ইংরেজগণ তাহা অবগত ছিলেন। মেঃ ওয়াট্‌সন্ কাশীমবাজারে থাকিয়া রাজধানীর সমুদায় সংবাদ গোপনে কলিকাতায় প্রেরণ করিতেন। বুদ্ধিমান ইংরেজ বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কোন্ পক্ষ প্রকাশ্যে অবলম্বন করিবেন, তাহা সহজে অবধারণ করিতে পারিলেন না। ভবিষ্যতে কোন্ পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিবে তাহার নিশ্চয়তা নাই, এমন অবস্থায় সুচতুর ইংরেজ উভয় পক্ষের মন রক্ষা করিয়া চলাই সঙ্গত বিবেচনা করিলেন; পরে যে পক্ষের জয় দেখা যাইবে, সেই পক্ষই অবলম্বনীয় হইবে।

বৃদ্ধ নবাবের আসন্নকাল অতি নিকটবর্ত্তী হইল। নবাবজাদা মিরজা

মহম্মদ খাঁ দিবারাত্রি মাতামহের চরণপ্রান্তে উপস্থিত; আকৈশোর দুষ্ক্রিয়ান্বিত, অবিমৃষ্যকারী, চঞ্চলচিত্ত যুবক আশু অবশ্যম্ভাবী বিপদের আশঙ্কায় স্থির স্তম্ভিত ভাব ধারণ করিয়াছেন। অন্তিম সময়েও বৃদ্ধ নবাব স্নেহপালিত দৌহিত্রের উদ্ধত আচরণ ব্যবহার সংযত রাখিবার এবং রাজ্যের অবস্থা এবং লোকচরিত্র বুঝিয়া চলিবার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। এ দিকে ঘেসেটী বেগমের চেষ্টা উৎযোগ উৎসাহের মাত্রা প্রচ্ছন্ন ভাবে অতি বৃদ্ধি হইল, বহু অর্থব্যয়ে মতিঝিলে ক্রমে বহু সৈন্যের সমাবেশ হইতে লাগিল। পূর্ণিয়ার সকতজঙ্গ অলসনিমীলিত চক্ষু উন্মীলিত করিয়া মাতামহের মছনদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। ইংরেজ, ফরাসী, দিনামার, ওলন্দাজ প্রভৃতি বিদেশ-বাসীরা শশব্যস্ত। সমস্ত বঙ্গবিহার উড়িষ্যা উৎগ্রীব হইয়া ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। এমন সময় বৃদ্ধ নবাব সুজা উল্ মুলুক্ হেসামউদ্দৌলা আলীবর্দী খাঁ মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

নবাবজাদা মিরজা মহম্মদখাঁ ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সিপাহসীলার, সামন্ত সৈন্যাধ্যক্ষ, আমির ওমরাহ, রাজা মহারাজা, জগৎ শেঠ, বঙ্গা-ধিকারী প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোককে দরবারে আহুত করিলেন; এবং নবাব মুনসুর-উল-মুলুক্ সিরাজউদ্দৌলা সা কুলী খাঁ মিরজা মহম্মদ হায়বৎজঙ্গ বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিবাদে বাঙ্গলা বিহার উড়িষ্যার সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন। বিরুদ্ধ মন্ত্রনাকারী এবং ইতস্ততঃ সন্দিগ্ধচিত্ত কেহই সে সময় কোনরূপ প্রতিকূলাচরণ করিতে সাহসী হইলেন না; কিন্তু সে সিংহাসন যে প্রচণ্ড বলশালী প্রচ্ছন্ন বারুদরাশির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল, দরবারে উপস্থিত অনেকের নিকট তাহা অবিদিত রহিল না।

সিরাজ বহু পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন, সীপাহসিলার মিরজাফরখাঁ, ধনকুবের জগৎশেঠগণ, বঙ্গাধিকারী প্রভৃতি অনেক উচ্চ রাজকর্ম্মচারী

এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজা মহারাজা আমীর ওমরাহ অনেকেই তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট। বিপদ উপস্থিত হইলে ইহাঁদের বিশ্বস্ততায় আস্থা স্থাপন করা সুসঙ্গত হইবে না। সেই জন্য রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াই তিনি আত্মপক্ষ প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে নিজের বিশ্বস্ত প্রিয়পাত্রদিগকে দরবারে উন্নত পদবী প্রদান আরম্ভ করিলেন। বীর মীরমদন দেওয়ান-ই-তন পদে উন্নীত হইলেন। দেওয়ান মোহনলাল দেওয়ান-ই-আলা-মোদার-উল্-মোহান পদ এবং মহারাজা উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, উত্তরকালে ইহাঁরা প্রাণপাত করিয়াও সিরাজের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন।

মছনদে বসিয়া সিরাজ বিশ্বস্ত প্রভুভক্ত প্রিয়পাত্র হেমেন্দ্রলালকে ভুলিলেন না। নবীন নবাব প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে রাজোপাধি, পাঁচশতী মুনসবদারী পদ এবং তদুপযুক্ত জায়গীর প্রদান করিলেন। রাজপদোচিত আশা সোটা, নাকড়া নিশান এবং ঝালরদার পালকী ব্যবহারের অনুমতিও হেমেন্দ্রলাল প্রাপ্ত হইলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই ঘেসেটী বেগমের সমস্ত ষড়যন্ত্র, সকল মন্ত্রণা ব্যর্থ হইল। সিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহার সৈন্য সেনাপতি সমস্ত বিতাড়িত করিয়া মতিঝিলের সমস্ত ধন রত্নসহ ঘেসেটী বেগমকে স্বীয় অন্তঃপুরে আনয়ন করিলেন। পিতৃব্যপত্নীর সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল।

উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্ত হইয়া সিরাজ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে হেমেন্দ্রলালের বিদায় মঞ্জুর করিলেন। হেমেন্দ্রলাল অনতিবিলম্বে বহুকালপরিত্যক্ত গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রঙ্গিল নিশান তুলিয়া ডঙ্কা মারিয়া শৌল-দাঁড়ী দুই প্রকাণ্ড ছাঁদি নৌকা জয়নগরের ঘাটে আসিয়া নোঙ্গর করিল। বাড়ীর ঘাটে পৌছিয়া ডঙ্কা মারিতে হেমেন্দ্রলাল পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাহা মানিল না। রামমোহন প্রস্তুত ছিল, নৌকা তীরে সংলগ্ন হইবামাত্র লাফ দিয়া তীরে পড়িল এবং দ্রুতপদে বাড়ী অভিমুখে চলিল।

হেমেন্দ্রলাল যে সেদিন বাড়ীতে পৌছিবেন, গ্রামের কোন লোক তাহা জানিত না। ডঙ্কার শব্দ শুনিয়া অনেকে ভাবিল দারোগা, ফৌজদারের লোক অথবা নবাবের ফৌজই বা আসিতেছে! রায়-মহাশয়ের বাড়ীতে সকাল বেলায় কাছাড়ী; আমলা, পেয়াদা, মুহুরী, পাটওয়ারী প্রজা অনেক লোক উপস্থিত। জমিদারী এখন অনেক বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রতিদিন দুই বেলা লোকের অভাব ছিল না। রায়মহাশয় স্বয়ং কাছারীতে বসিয়া প্রজার দরবার করিতেছিলেন। এমন সময় রামমোহন লোকজন প্রজা ঠেলিয়া সেখানে উপস্থিত হইল, প্রণাম করিয়া হেমেন্দ্রলালের আগমন বার্ত্তা তাঁহাকে দিল। সকল কাজ ফেলিয়া রায়মহাশয় উঠিলেন; আত্মীয়, কুটুম্ব, আমলা পেয়াদা লোকজন সকলে পুকুর পাড়ে ছুটিল। রামমোহন দৌড়াইয়া অন্তঃপুরে যাইয়া মহামায়াকে জানাইল। শ্রীমান খোকা সেখানে খেলা করিতেছিল, তাহাকে কাঁধে তুলিয়া লইয়া রামমোহন বাহিরে আসিল। রায়মহাশয় মহামায়ার নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। বাড়ীতে একটা ভয়ানক ছুটাছুটি, কোলাহল, হুলুধ্বনির রব পড়িয়া গেল।

এদিকে হেমেন্দ্রলাল আসিয়া পৌঁছিলেন; পুকুর পারেই রায়-মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ভূমিতে পড়িয়া হেমেন্দ্রলাল পিতৃব্য চরণে প্রণাম করিলেন, রায়মহাশয় হেমেন্দ্রলালকে হাত ধরিয়া তুলিয়া হর্ষভরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। চারিদিক হইতে লোকজন ছুটিয়া আসিল, সকলেই হেমেন্দ্রলালকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। এমন সময় "জয়, রাজা হেমেন্দ্রলালের জয়!" ধ্বনিতে দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। হেমেন্দ্রলাল যে নবাবসরকার হইতে রাজা খেতাব, নূতন জায়গীর পাইয়াছেন, রামমোহন তাহা ইতিমধ্যেই প্রচার করিয়া দিয়াছে। শ্রীমান খোকাকে কাঁধ হইতে নামাইয়া রামমোহন তাহাকে হেমেন্দ্রলালের সম্মুখে খাড়া করিল। কাপড়-পরা তখনও খোকার অভ্যাস হয় নাই, লক্ষ্মীপ্রিয়া তাড়াতাড়ি একখানা কাপড় একজন দাসীকে দিয়া রামমোহনের হাতে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাল করিয়া তাহা পরাইয়া দিবার সময় রামমোহনের হয় নাই; তাড়াতাড়ি কোনরূপে কাপড়ের এক প্রান্ত খোকার কোমরে জড়াইয়া দিয়াছিল মাত্র। রায়মহাশয় খোকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া হেমেন্দ্রকে দেখাইয়া বলিলেন;—"এই আমাদের বাবা আসিয়াছে, বাবার কোলে যাবি?" শ্রীমান খোকা সেই বিশালদেহ, অপরিচিত লোককে দেখিয়া কোলে যাইবার বিশেষ কোন আগ্রহ প্রকাশ করিল না। হেমেন্দ্রলাল একবার মাত্র খোকার দিকে চকিত স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া অবনত মস্তকে মাতৃঠাকুরাণী, ঠাকুরমা রক্ষাকালী, ধাইমা কল্যাণী—সকলের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রামমোহন খোকাকে লইয়া অন্যত্র প্রস্থান করিল।

সেখান হইতে হেমেন্দ্রলাল ঠাকুর আঙ্গিনায় আসিয়া গৃহ-বিগ্রহকে প্রণাম করিলেন। মহামায়া, রক্ষাকালী ঠাকুরাণী প্রভৃতি বয়োবৃদ্ধারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন; হেমেন্দ্র একে একে সকলকে প্রণাম

করিলেন। বিস্মিত, আনন্দে বিস্ফারিতনেত্র কল্যাণীও সেখানে উপস্থিত ছিল, হেমেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। কল্যাণী রাজার প্রণাম লইবে? সরিয়া গিয়া হর্ষে কান্নাময় হাসি হাসিয়া ফেলিল! তাহার পর হেমেন্দ্রলাল বৈঠকখানায় যাইয়া পিতৃব্যের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

নৌকা হইতে জিনিসপত্র ভিতর বাড়ীতে আনীত হইতে লাগিল। সেখানে বালক বালিকা যুবতী বৃদ্ধা বহু লোকের সমাগম। এমন সময় ভূমিতলবিলম্বী দীর্ঘ শ্মশ্রুরাশিপরিশোভিত বিশালকায় এক রামছাগলের গলার দড়ি ধরিয়া রামমোহন খোকাকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। মুরসিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া রামমোহন বহু অনুসন্ধানে এই অজকুলশ্রেষ্ঠকে সংগ্রহ করিয়াছিল। বাড়ীতে পৌঁছিয়াই তাহার সম্পূর্ণ স্বত্ব শ্রীমান খোকাকে প্রদান করিয়াছে। শ্রীমান খোকাকে এই প্রকাণ্ড ছাগলের পিঠে চড়াইবার জন্য রামমোহন অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অজবর তাহাতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করাতে অবশেষে খোকার আদেশে তাহাকে ফুলবাগানে লইয়া গিয়া তাহার গলায়, শৃঙ্গে ফুলের মালা পরাইয়া দিয়াছে। ফুলের মালা শরীরের শোভা বর্দ্ধন অপেক্ষা জঠরাগ্নি নির্ব্বাপনেরই অধিক উপযোগী বিবেচনা করিয়া অজবর অনেক কায়দা কৌশল করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে পূর্ণমনোরথ হইতে পারে নাই। পুষ্পমাল্যধারী, কিম্ভূত কিমাকার প্রকাণ্ড রামছাগলের শৃঙ্গ সঞ্চালন দেখিয়া অনেক বালক বালিকা যুবতী বৃদ্ধা স্থান ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিল। কিন্তু শ্রীমান খোকার হর্ষধ্বনি তাহাতে আরও বৃদ্ধি পাইল।

গৃহে ফিরিতেই রামমোহনের আর একটী অনুচর যুটিল। বাঘা এখন বয়সে বৃদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু এত দিন পরে রামমোহনকে পাইয়া

তাহার নবীন বয়স যেন ফিরিয়া আসিল, তাহার আনন্দের আর সীমা নাই।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় স্বয়ং মহামায়া পরিবেশনে গেলেন। খাবার ঘরে রায়মহাশয়, হেমেন্দ্রলাল ও শ্রীমান খোকার আসন পড়িয়াছে। খোকা নিজের আসন পরিত্যাগ করিয়া দাদামহাশয়ের আসনের অর্দ্ধ-ভাগ জবর দখল করিয়া বসিল। মহামায়া রূপার পৃথক পৃথক থালা বাটিতে অন্ন ব্যঞ্জন সাজাইয়া আনিলেন।

রায়মহাশয় বলিলেন ; —

"ওগো, আমার সরিক জুটিয়াছে, তোমার আপত্তি থাকে ত বল।"

পাশে দাঁড়াইয়া কল্যাণী হাসিয়া উঠিল।

মহামায়া বলিলেন ;—"অনেক দিন হইল তোমার অর্দ্ধ স্বত্ব গিয়াছে। শীঘ্রই খোকা বাবুর বিবাহ দিতে হইবে, নতুবা তোমার ষোলআনা স্বত্বই লোপ পাইবে!"

হেমেন্দ্রলালের সম্মুখে অন্নপূর্ণ থালা রাখিয়া মহামায়া বলিলেন ;—

"হিমু, অনেক দিন পরে আজ আবার তোর পাতে ভাত দিলাম। ঘর হইতে না বলিয়া চলিয়া যাইবার দিন বলিয়াছিলি, উপার্জ্জন করিয়া পয়সা কড়ি করিয়া রূপার থালা বাটিতে খাইবি, আজ সেই দিন!"

মহামায়ার দুই চক্ষু আনন্দাশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, জলভরা চক্ষে হাসিমুখে আবার বলিলেন ;—

"আজ আমি রাজার মা, আমাদের আনন্দের কি আর সীমা আছে রে, হিমু?"

রায়মহাশয় বলিলেন ;—

"হিমু, তুই জয়নগরের নাম উজ্জ্বল করিয়াছিস্, রায়বংশের মান মর্য্যাদা শতগুণে বৃদ্ধি করিয়াছিস্। আমরা কত ভাগ্যবান, তোর ক্ষমতায় আজ আমরা রূপার থালা বাটিতে ভাত খাইতেছি!"

হেমেন্দ্রলাল নিরুত্তর। হর্ষে লজ্জায় তাঁহার মুখে বাক্য সরিতেছে না।

বিকাল বেলায় অন্তঃপুরে মেয়ে-মহলে মহা সমারোহ। রক্ষাকালী, বগলা, বিশখা, হরমণি, কৌশল্যা প্রভৃতি বৃদ্ধা এবং প্রৌঢ়ারা দরদালানে বসিয়া মহামায়ার সঙ্গে কথা বার্ত্তায় রত। নবদুর্গা, তারা বামা, শ্যামা, কুন্দ, কালিন্দী, সরলা প্রভৃতি যুবতী ও তরুণীরা লক্ষ্মীপ্রিয়ার ঘরে বৈঠক দিয়া আমোদ প্রমোদ, হাস্য পরিহাস, শ্লেষ কৌতুকে ঘর সরগরম করিয়া তুলিলেন। বুঁচি, ফেলি, কাণী, হাবী, দাসুর মা, বঙ্কার পিসী, কার্ত্তিকের মাসী প্রভৃতি হরকছমের তরুণী, যুবতী, অর্দ্ধবয়স্কারা উভয় বৈঠকে অথবা তাহার আশপাশ বারান্দায় উঁকি মারিয়া হাঁটিয়া, ফিরিয়া কৌতূহল তৃপ্ত করিতেছিল। আর বালক বালিকারা আঙ্গিনায় বাঁধা পুষ্পমাল্যধারী সেই বৃহৎ রামছাগলকে ঘিরিয়া, হাসিয়া খেলিয়া, ছুটাছুটি মারামারি করিয়া, আছাড় পড়িয়া, গালি খাইয়া আনন্দের উৎসব করিতেছিল।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার ঘরের বৈঠকে তারা বলিল ;—

"দাদা সহর হইতে তোর জন্য নূতন কি গহনা আনিয়াছে, আমাদিগকে দেখাইবি না, বৌ ?"

নবদুর্গা। "তোদের কথা শুনিয়া হাসি পায়। দাদা এখনো ভিতর বাড়ীতে আসেন নাই, দেখা-ই হয় নাই ; তা বৌ গহনার কথা কি জানিবে ?"

পশ্চাৎ হইতে এক রসিকা বলিলেন ;—

"সূর্য্যিঠাকুর কি আজ আর অস্ত যাইবেন ?"

তখন সে ঘরে একটা হাসির গর্‌রা পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীপ্রিয়া পাণ সাজিয়া প্রতিবেশিনীগণকে দিতেছিলেন, অবগুণ্ঠনে অর্দ্ধ-আবৃত তাঁহার মুখও হাসিময় হইয়া উঠিল।

শ্যামা। "আমি তো অনেক দিন আগেই বলিয়াছি, বৌয়ের পাথরে পাঁচ কিল—মতির মালা ঘরে আসিবে! নবাব বেগমের সুদৃষ্টি কি যেমন তেমন কথা?"

বামা। "তুই বলিতেছিস্ সেই নাচওয়ালীটার কথা; নবাবের আদেশে তো তার গর্দ্দান কাটা গিয়াছে। আমি বলি, বৌয়ের কপালের বড় জোর। সেই যে কোন্ আমীরের মেয়ে নাকি হিমুদাদাকে চোখে চোখে রাখিত, তার রূপের ফাঁদ কাটিয়া দাদা যে ঘরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে, তা কেবল বৌয়ের কপালের জোরে!"

লক্ষ্মীপ্রিয়া চিবুকের নীচু পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠন টানিয়া নামাইলেন।

নবদুর্গা। "তোদের কাছে যত আজগুবি গল্প। দেখিস্, যাত্রার লে তোদের দূতী সাজিবার ডাক পড়িবে!"

শ্যামা। "তা পড়ে, পড়িবে; দূতীর কথা শুনিবার জন্য তোদের নিমন্ত্রণ পাঠাইব।"

বামা। "বৌ তো আর মতির মালা ভাগ করিয়া দিবে না, তুই কথা চাপা দিতে চাহিস্ কেন?"

তারা। "বিদেশে কে কোথায় কি করেছে, কে জানে? তার আলোচনা দিয়াই বা কি কাজ? মতির মালাই হউক, আর সোণার বাজু বাউটীই হউক, একদিন দেখাই যাইবে।"

এমন সময় শাশুড়ীর ঘরে বৌয়ের ডাক পড়িল। পাড়ার অনেক বৃদ্ধারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের প্রণাম করিতে হইবে। হাসিতে হাসিতে যুবতীমণ্ডলী বৌয়ের সঙ্গে ঘর হইতে বাহির হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রাত্রিতে আহারান্তে শয়ন ঘরে হেমেন্দ্রের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সাক্ষাৎ হইল।

রোগ শোক, আপদ বিপদ, সুখ দুঃখ, চিন্তা বিরহ—কত বিষয়ের কথা; কথা কি শেষ হয়?

হেমেন্দ্রলাল সিন্দুক খুলিয়া একটী ছোট বাক্স বাহির করিলেন। বাক্সের মধ্য হইতে এক ছড়া স্বর্ণহার বাহির করিলেন। তাহার পর হেমেন্দ্রলাল সেই হার লক্ষ্মীপ্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। সলজ্জ হর্ষে লক্ষ্মীপ্রিয়ার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। দীপের আলোকে স্বর্ণহার দীপ্তি পাইতেছিল; বিশেষতঃ বক্ষসংলগ্ন তাহার দ্যুতিমান মধ্যমণি স্ফুরদুজ্জ্বল ছটা বিকীর্ণ করিতে লাগিল। আলোর দিকে কিঞ্চিৎ সরিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া বিস্মিত উৎফুল্ল নেত্রে সেই মধ্যমণির অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে লাগিলেন। মণির চারিদিকে স্বর্ণাসনে কি যেন কয়েকটী অক্ষর খোদিত ছিল। সামান্যরূপ বাঙ্গলা অক্ষরপরিচয় লক্ষ্মীপ্রিয়ার ছিল, কিন্তু এ তো বাঙ্গলা অক্ষর নহে। স্বামীর দিকে চাহিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন;—

"ইহাতে এ কি লেখা?"

হারে যে কোন অক্ষর খোদিত ছিল, হেমেন্দ্রলাল পূর্ব্বে তাহা লক্ষ্য করেন নাই। স্ত্রীর বক্ষলগ্ন হার কিঞ্চিৎ উঁচু করিয়া ধরিয়া দীপের আলোকে পড়িয়া দেখিলেন—পারস্য অক্ষর।

লক্ষ্মী। "কি লেখা?"

হেমেন্দ্র। "যিনি তোমাকে এই বহুমূল্য হার উপহার দিয়াছেন, তাঁহার নাম লেখা।"

লক্ষ্মী। "কি নাম?"

হেমেন্দ্র। "সুরতউন্নিসা।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া ধীরে ধীরে কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া বলিলেন;—

"আমি এ হার পরিব না।"

হেমেন্দ্র। "পরিবে না! কেন?"

লক্ষ্মীপ্রিয়া শয্যার পাশে হার রাখিয়া দিলেন।

হেমেন্দ্র। "বহুমূল্য সুন্দর হার, আত্মীয়ের উপহার; কেন পরিবে না?"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন;—

"সুরতউন্নিসা কি নবাবের বেগম?"

হেমেন্দ্রলাল বিস্মিত হইলেন; বলিলেন;—

"না।—বেগম বলিয়া কেন তোমার সন্দেহ হইল?"

লক্ষ্মী। "সুরতউন্নিসা কে?"

উত্তর দিতে হেমেন্দ্রলালের ক্ষণকাল বিলম্ব হইল। লক্ষ্মীপ্রিয়া মুখ নত করিয়া রহিলেন; হেমেন্দ্র ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন;—

"সুরতউন্নিসা মহাত্মা কাশেমআলি খাঁ আমির সাহেবের কন্যা।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া কোন উত্তর করিলেন না; নতমুখে গাত্র সঙ্কুচিত করিয়া রহিলেন। হেমেন্দ্রলাল অতি যত্নে স্ত্রীর হাত ধরিয়া বলিলেন;—

"কেন তুমি কথা কহিতেছ না?"

মুখ নত রাখিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন;—

"মুরশিদাবাদের আমির সাহেবের কন্যা, আমাকে হার উপহার দিলেন কেন?"

হেমেন্দ্র। "তুমি কি কিছুই শুন নাই!—সব বলিতেছি, শুন।"

হেমেন্দ্রলাল অতি আদরে দুই হাতে মৃদু মৃদু স্ত্রীর নতমুখ উঁচু করিয়া তাঁহার ম্রিয়মাণ চক্ষের দিকে চাহিয়া বলিলেন;—"নিঃসহায়

নিঃসম্বল আমি অবস্থা পরিবর্ত্তনের অভিলাষে পথের ভিখারীর ন্যায় বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলাম। বহুপুণ্যে, বহু ভাগ্যে পথীমধ্যেই এই মহাত্মার সাক্ষাৎ পাই। প্রথম দিন হইতেই তিনি আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ চক্ষে দেখেন। তিনিই আমাকে আশ্রয় দিয়া, সঙ্গে করিয়া মুরশিদাবাদ লইয়া যান। সেখানে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই স্নেহ দয়া অনুগ্রহে আমার যে কিছু উন্নতি হইয়াছে। আমি অনাহারে রাস্তায় পড়িয়া মরিতাম, যদি তিনি আমাকে থাকিবার গৃহ, আহারের অন্নের সংস্থান করিয়া না দিতেন। মহাত্মা কাশেমআলী খাঁ আমার অন্নদাতা আশ্রয়দাতা, আমার সকল প্রকার ঐহিক উন্নতির মূল। তিনি আমাকে পুত্র বলিয়া জানিতেন, আমিও তাঁহাকে পিতৃবৎ মানিয়াছি।"

লক্ষ্মীপ্রিয়ার চিত্তে করুণ কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল। তিনি স্বামীর দিকে হেলিয়া বসিয়া আপনার ক্ষুদ্র হস্ত স্বামীর উরুদেশে রাখিয়া সাগ্রহে শুনিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্র বলিতে লাগিলেন ;—

"তাঁহার এক পুত্র ছিল, বাঁচিয়া থাকিলে সে পুত্রের বয়স আমার সমান হইত; পাঁচ বৎসর বয়সে সে পুত্র মরিয়া যায়। খাঁসাহেব আমার চেহারায় তাঁহার সেই মৃত পুত্রের সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। খাঁসাহেব আর এদেশে নাই। এদেশ ছাড়িয়া যাইবার সময় বহুধন সম্পত্তি আমাকে দান করিয়া গিয়াছেন। রসুলপুর কাছারীর নাম তুমি শুনিয়াছ, খাঁসাহেব কাছারীসহ সমস্ত পরগণা, জাহাঙ্গীরনগরের অট্টালিকা, বাগানবাড়ী আমাকে দিয়া গিয়াছেন। আমি হিন্দু, তিনি মুসলমান; কিন্তু তিনি আমাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপুরুষ সমস্ত ধন সম্পত্তি বিলাইয়া দিয়া পবিত্র মক্কা সরিফে চলিয়া গিয়াছেন।"

লক্ষ্মীপ্রিয়ার চিত্ত আর্দ্র হইয়াছিল, তিনি মৃদু মৃদু জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"আর তাঁহার কন্যা ?"

হেমেন্দ্র। "কন্যা সুরতউন্নিসা বিবি পিতার সঙ্গে সেই পবিত্র ধামে চলিয়া গিয়াছেন। সুরতউন্নিসা মানবীরূপে দেবী। পিতার সঙ্গে পবিত্র ধামে যাইয়া ঈশ্বর চিন্তায় দিন যাপনের অভিলাষ তাঁহার প্রবল হইয়া উঠে। ধনী মানী অনেক সম্ভ্রান্ত আমীর ওমরাহের সঙ্গে ক্রমে বিবাহ প্রস্তাবে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন। খাঁসাহেব অবশেষে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নিয়াছেন। সে দেশে সৎপাত্রের অনুসন্ধান করিয়া কন্যার বিবাহ দিবেন, খাঁসাহেবের এইরূপ অভিপ্রায়। সুরতউন্নিসা আমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া মানিতেন, শ্রদ্ধা করিতেন; আমিও তাঁহাকে কনিষ্ঠা ভগ্নী বলিয়া স্নেহ করিতাম।"—বলিতে বলিতে হেমেন্দ্রলালের চক্ষু ভরিয়া জল আসিল।—"শুন, আমার সহোদরা কোন ভগ্নী নাই, থাকিলেও তাহাকে সুরতউন্নিসা বিবির অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতাম কি না সন্দেহ। আমরা এক পিতা মাতার সন্তান নহি, কিন্তু সুরতউন্নিসা সহোদরা অপেক্ষাও আমার অধিক স্নেহপাত্রী!"

আর্দ্রহৃদয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া স্বামীর বলিষ্ঠ বিশাল বাহু ধীরে ধীরে স্বীয় কোমল স্কন্ধে স্থাপন করিলেন এবং আপনার ক্ষুদ্র মস্তক স্বামীর বিশাল বক্ষ সংলগ্ন করিয়া সাগ্রহে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

হেমেন্দ্র। "দেবী দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দয়া মায়া স্নেহ ভক্তি, তাঁহার শত গুণ আমি কখনো ভুলিতে পারিব না। যাইবার সময় পিতা আত্মীয় স্বজন দাস দাসী সকলের সাক্ষাতে তিনি তোমার জন্য এই হার আমার হাতে দিয়া গিয়াছেন। তিনি তোমাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ বলিয়া মানিতেন; তোমাকে দেখিবার তাঁহার বড় সাধ ছিল, সে সাধ পূর্ণ হয় নাই। বলিয়া গিয়াছেন, সুদূর সাগরপারে সেই দুর্গম দেশে থাকিয়া কনিষ্ঠা ভগ্নীর ন্যায় তিনি চিরকাল তোমার এবং আমার আশীর্বাদ কামনা করিবেন!"

হাত বাড়াইয়া লক্ষ্মীপ্রিয়া শয্যার পাশ হইতে হার তুলিয়া লইলেন। দুই হাতে অতি আদরে সেই বহুমূল্য হার নিজের গলায় পরিলেন; বলিলেন ;—"এ হার আমি চিরকাল পরিব।"

স্ত্রীর মুখ পরিচুম্বিত করিয়া হেমেন্দ্র বলিলেন ;—

"পরিও; এ পবিত্র হার তোমার গলায় অতি সুন্দর মানিয়াছে।—আরও দেখ, সুরতউন্নিসা আর কি দিয়াছেন।"

বাক্স হইতে এক জোড়া বালা বাহির করিয়া হেমেন্দ্রলাল স্ত্রীর হাতে দিলেন। মণিমুক্তায় জড়িত বালা; দীপালোকে দীপ্তিময় হইয়া উঠিল।

হেমেন্দ্র। "এই বালা সুরতউন্নিসার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ছিল, শৈশব কালে সুরতউন্নিসাও ইহা হাতে পরিয়া ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভাই বলিয়া জানিতেন; তোমার খোকাকে তিনি এ বালা দিয়া গিয়াছেন।"

বালা দেখিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার মুখ হর্ষফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন ;—"কাল খোকার হাতে বালা পরাইয়া দিব।

হেমেন্দ্র। "হার আর বালা কাল আমি মা'র কাছে দিব, তিনি তোমাদিগকে পরাইয়া দিবেন। তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে আমি নিজ হাতে স্ত্রীপুত্রকে গহনা দিলে লোকে কি বলিবে?"

লক্ষ্মীপ্রিয়া হাসিয়া বলিলেন ;—"মা'র হাতে পাওয়াই ঠিক। আমি অতি আনন্দে আগে তাহা বুঝিতে পারি নাই।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া বারংবার বিস্মিত নেত্রে সেই বালা দেখিয়া লইয়া সেই ক্ষুদ্র বাক্সে তাহা রাখিয়া দিলেন, কিন্তু গলার হার সে রাত্রিতে আর খুলিলেন না।

হেমেন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ;—

"হার পরিতে তুমি প্রথমে আপত্তি করিলে কেন?"

লক্ষ্মীপ্রিয়ার মুখ লজ্জায় অবনত হইল। প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ?—তখন আর এক কথা তাঁহার মনে পড়িল। ধীরে ধীরে বলিলেন ;—

"আর একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব ?"

হেমেন্দ্র। "পাগল তুমি, অনুমতি চাহিতেছ! কি কথা ?"

কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া নতমুখেই লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন ;—

"মুরসিদাবাদে নবাবের এক নাচওয়ালী বেগম ছিল ?"

হেমেন্দ্রলালও বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন ;—

"হাঁ, ছিলেন। নবাবজাদা লক্ষ টাকা বায়না দিয়া তাঁহাকে দিল্লী হইতে আনিয়াছিলেন ; তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া নবাবজাদা শেষে তাঁহাকে বেগম করেন।"

লক্ষ্মীপ্রিয়ার মুখ বাধ বাধ হইল। হেমেন্দ্র বলিলেন ;—

"তাঁহার কথা কেন ?"

লক্ষ্মী। "তাহাকে তুমি চিনিতে ?"

হেমেন্দ্র। "আগে চিনিতাম না। ফৈজীবিবি নৃত্যগীতে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। নবাবজাদার মজলিসে প্রথম মুজরার রাত্রিতে আমিও উপস্থিত ছিলাম। ফৈজীবিবির গানের ত্রুটি ধরিয়া আমি হঠাৎ একটা কথা বলাতে আমার বে-আদপি হয়। নবাবজাদা সেই অপরাধে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া চমকিয়া উঠিলেন।

হেমেন্দ্র। "ফৈজীবিবি স্বীয় যশের দিকে না চাহিয়া, নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করেন। সেই হইতে তাঁহার সঙ্গে আমার পরিচয়। গীতবাদ্যে আমার পারদর্শীতা দেখিয়া নবাবজাদা নিজের খাসদরবারে আমাকে কাজ দেন ; সেই হইতেই আমার উন্নতির সূচনা। ফৈজীবিবি আমার বহু উপকার করিয়াছেন।"

লক্ষ্মী। "ফৈজীবিবি ভাল লোক ছিলেন ?"

হেমেন্দ্র। "তাঁহার অনেক গুণ ছিল; কিন্তু প্রথম বয়স হইতেই তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না। পরিণামে নবাবজাদার ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হয়। শাস্তিস্বরূপ নবাবজাদা জীবন্তে তাঁহার কবর দেওয়াইয়াছিলেন।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।—"জীবন্তে কবর!"

হেমেন্দ্র। "জীবন্তেই ফৈজীবিবির কবর হইয়াছিল।"

লক্ষ্মী। "তিনি তোমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন?"

হেমেন্দ্র। "প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আরও অনেক উপকার করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ রূপবতী এবং নৃত্যগীতে অসামান্য গুণবতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্র ভাল ছিল না।—একটী কথা তোমাকে বলিব, বলা-ই ভাল—"

লক্ষ্মীপ্রিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন;—

"তাঁহার রূপের ফাঁদে তো পড়িয়াছিলে না!"

হেমেন্দ্র। "পড়ি নাই, ঈশ্বর আশীর্ব্বাদে আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। সেই হইতে ফৈজীবিবিরও আত্মসংযম অভ্যাস আরম্ভ হইয়াছিল।"

লক্ষ্মী। "তবে আর কেন তাঁহার জীবন্তে কবর হইল?"

হেমেন্দ্র। "যে অপরাধের সন্দেহে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়, তিনি তাহাতে অপরাধিনী ছিলেন না। সে আর এক কথা; আর একদিন বলিব। রাজরাজড়া, নবাব বাদসাহের ক্রোধ, সুবিচার কবে হইয়া থাকে?—ফৈজীবিবি আমাকে শ্রদ্ধা করিতেন, আমিও তাঁহাকে অন্নদাতা, প্রতিপালনকর্ত্তা মুনিরের বেগম বলিয়া মান্য করিতাম। তাঁহার দোষের বিচার ঈশ্বর করিবেন, তাঁহার গুণের কথা আমি কোন দিন বিস্মৃত হইব না।"

স্বামীর দ্বিধাশূন্য সরল উক্তিতে স্ত্রীর মনে সন্দেহের লেশমাত্র রহিল না। লক্ষ্মীপ্রিয়া নিজে বলিয়াছিলেন, সন্দেহের ঠাঁই তাঁহার হৃদয়ে নাই,

তথাপি লোকের কথাবার্ত্তায়, ইঙ্গিত প্রসঙ্গে তাঁহার মন আন্দোলিত হইয়াছিল। স্বামীর মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় স্থির, শান্ত হইল। কিন্তু অত জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছেন, লজ্জায় তাঁহার মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। লক্ষ্মীপ্রিয়া বলিলেন ;—

"আমাকে ঘৃণা করিবে না ?"

হেমেন্দ্র। "ঘৃণা করিব ! কি বলিতেছ ?"

লক্ষ্মী। "আমি এত কথা জিজ্ঞাসা করিলাম ; আমাকে ঘৃণা করিবে না তো ?"

"হেমেন্দ্র। "তোমাকে ঘৃণা করিব না তো সংসারে আর কাহাকে করিব ?"

হেমেন্দ্রলালের চক্ষু হইতে তাঁহার হৃদয়ভরা প্রেমের বিদ্যুৎ ছটা বিকাশ পাইল। লক্ষ্মীপ্রিয়ার শরীর পুলকিত হইয়া উঠিল।

হেমেন্দ্র। "দেখিতেছি, তুমি অনেক কথাই শুন নাই, কিন্তু সুরত-উন্নিসা ও ফৈজীবিবির কথা কিছু কিছু শুনিয়াছ। কে তোমাকে বলিয়াছে ? কি বলিয়াছে ?"

লক্ষ্মী। "লোকের কথায় আমার কি হইবে ?"

হেমেন্দ্র। "কেহ অবশ্যই কিছু বলিয়াছে। কি বলিয়াছে ? কে ?"

লক্ষ্মী। "বামা ও শ্যামা ঠাকুরঝিরা নানা কথা বলে ; নবাবের কোন্ বেগম নাকি তোমার খুব বাধ্য ছিল, কোন্ আমিরের মেয়ে নাকি তোমাকে চোখে চোখে রাখিত, আমার না কি মতির মালা হইবে—কত কথা. কত ঠাট্টা করে !"

হেমেন্দ্র। "তাহারা আমার নিন্দা কি তোমাকে ঠাট্টা করে, তাহাতে তোমার আমার কি ? তুমি যে আমার প্রাণের লক্ষ্মী, সেই লক্ষ্মীই চিরকাল থাকিবে।"

লক্ষ্মীপ্রিয়ার মুখ হর্ষপ্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে কহিলেন ;—

"তুমি আমার যে প্রাণের প্রাণ, যে আরাধ্য দেবতা, সেই প্রাণাধিক, সেই আরাধ্য দেবতাই আছ, চিরকালই থাকিবে!"

হেমেন্দ্র। "মাকে বলিয়া আমি পাড়ার সমস্ত মেয়ের নিমন্ত্রণ করাইব। তুমি এই হার পরিয়া তাহাদের পরিবেশন করিবে; কেমন?"

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সুন্দর মুখ হাসিময় হইয়া উঠিল।

"তা আমি করিব।"

হেমেন্দ্র। "আমি বালুচরের জগন্নাথ-মজলিশ সাড়ী কিনিয়া সঙ্গে আনিয়াছি; শ্যামা, বামা, তারা সকলকে তুমি এক এক থানি করিয়া দিবে।"

লক্ষ্মীপ্রিয়া হাসিয়া ফেলিলেন।

"নবদুর্গা ঠাকুরঝিকে আরও ভাল কাপড় দিব।"

হেমেন্দ্র। "কেন, নবদুর্গাকে আরও ভাল কাপড় কেন?"

লক্ষ্মী। "নবদুর্গাকে আমি ভালবাসি।"

হেমেন্দ্র। "নবদুর্গা তো প্রায় আমাদের ঘরের মেয়ে; তুমি তাহাকে সাচ্চা কামদার বানারসী সাড়ী দিও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আমাদের আখ্যায়িকা শেষ হইল। শুধু দুই একটী কথা মাত্র বলিবার আছে।

হেমেন্দ্রলাল নবাবসরকার হইতে যে সকল নূতন জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই তিনি নিজ পিতৃব্যঠাকুরের নামে বন্দোবস্ত করিয়া আনিয়াছিলেন; কিন্তু খাঁসাহেব কাশেমআলি খাঁর দত্ত পরগণা রসুলপুরদিগর তাঁহার নিজ নামেই ছিল। সমস্ত সম্পত্তির শাশন সংরক্ষণ এবং সংসারের সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্বভার রায় মহাশয়ের হস্তেই রহিল। রসুলপুরদিগর সম্পত্তি সম্বন্ধে রায়মহাশয়ের অনুমতি লইয়া হেমেন্দ্রলাল নিম্ন লিখিত মত বন্দোবস্ত করিলেন।

এই সম্পত্তির আয় হইতে অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা সর্ব্বদা নগদ মজুত রাখিতে হইবে। যখনই মক্কা সরিফে খাঁসাহেব কি বিবি নুরত-উন্নিসার অর্থের প্রয়োজন পড়িবে সংবাদ আসিবে, তখনই উক্ত পরিমাণ টাকা সেখানে পাঠাইতে হইবে।

পির সাহ-মহম্মদের প্রাচীন দরগার নিয়মিত ব্যয় পরিচালন এবং দরগার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহের উপযুক্ত একজন মুসলমান সেবাইতের সপরিবারের স্বচ্ছল ভরণপোষণের জন্য মৌজে নিজ রসুলপুরের সমস্ত আয় নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

সেখ সাদেক এবং বিবি পিয়ারউন্নিসা মুরসিদাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিলেই সেখ সাদেককে দরগার সেবাইত নিযুক্ত করা হইবে। সাদেকের উপযুক্ত বংশধরগণই উত্তরাধিকারক্রমে চিরকাল এই দরগার সেবাইত হইবে।

যদি কোনকালে খাঁসাহেব, কি বিবি সুরতউন্নিসা, কিংবা বিবি সুরতউন্নিসার পুত্র কন্যা, পৌত্র পৌত্রী, কি দৌহিত্র দৌহিত্রী যে কোন প্রকৃত উত্তরাধিকারী বঙ্গদেশে উপস্থিত হন, চাক্‌লে মুরসিদাবাদের অন্তর্গত সম্পূর্ণ জমিদারী এবং পরগণা রসুলপুর দিগরের অর্দ্ধাংশ তিনি পাইবেন। হেমেন্দ্রলাল এবং তাঁহার পরবর্ত্তী ওয়ারিসান এই সর্ত্তের নিয়ম পালনে বাধ্য থাকিবেন।

* * * *

রসুলপুরের নূতন বাড়ী প্রস্তুত হইলে হেমেন্দ্রলাল সংবাদ দিয়া পিয়ার এবং সাদেককে মুরসিদাবাদ হইতে আনাইলেন। পিয়ারের সহিত আলাপ করিয়া লক্ষ্মীপ্রিয় পরম প্রীতিলাভ করিলেন। তাহার মুখে খাঁসাহেব এবং বিবি সুরতউন্নিসার পুণ্য কাহিনী শুনিয়া লক্ষ্মীপ্রিয়ার কৃতজ্ঞ হৃদয় আর্দ্র, চক্ষু সজল হইয়া আসিত। সুখে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, আনন্দ উৎসবে পিয়ার চিরকাল হেমেন্দ্রলালের গৃহে সাদরে আমন্ত্রিত হইত।

পিয়ারের বংশধরগণই এখন রসুলপুরের সম্ভ্রান্ত মুনশী তালুকদার এবং পির সাহ মহম্মদের দরগার সেবাইত।

বড় ঘটা করিয়া রায়মহাশয় রামমোহনের বিবাহ দিলেন। হেমেন্দ্রলাল তাহার বাসের জন্য উত্তম বাড়ী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন, এবং নিজ এলাকা মধ্যে বিস্তৃত জোত জমি তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিন্তু কল্যাণী হিমুরায়ের বাড়ী ছাড়িয়া নিজ পুত্রের নূতন বাড়ীতে যাইয়া বাস করিতে বড় আপত্তি করিল।

হেমেন্দ্রলাল পরম সুখস্বচ্ছন্দে গৃহসংসার আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যখনই খাঁসাহেব কাশেমআলি খাঁ এবং বিবি সুরতউন্নিসার কথা তাঁহার মনে পড়িত, তখনই তাঁহার চক্ষু সজল হইয়া আসিত, হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। কখনো কি সেই পুণ্যাত্মা মহাপুরুষের সঙ্গে, সেই অগাধস্নেহশালিনী দেবীপ্রতিমার সঙ্গে আর দেখা হইবে!

আরও একজনের কথা অনেক সময় হেমেন্দ্রলালের মনে পড়িত। মন্দভাগিনী ফৈজীবিবি আর এজগতে নাই; কিন্তু তাহার লোকাতীত রূপ, অসাধারণ গুণ এবং শোচনীয় পরিণামের কথা হেমেন্দ্রলাল কখনো ভুলিতে পারিলেন না। সেই ভয়ঙ্কর রজনীতে ফৈজীর আসন্নবিপদ-ক্লিষ্ট হৃদয়ের অপকট অভিব্যক্তি চিরকাল তাঁহার অন্তরে শেল সম বিদ্ধ হইয়া ছিল।

সমাপ্ত।
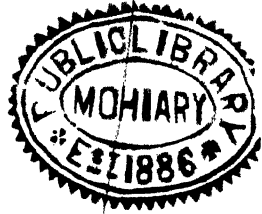
পরিশিষ্ট

সেখ ফরিদউদ্দিন আত্তার (ঔষধ বিক্রেতা) ছঞ্জার বাদসাহের রাজত্ব কালে হিজিরী ৫১৩ সালের শাবণ মাসে নেশাপুর সহরে জন্মগ্রহণ করেন। হিজিরী ৬২৭ সালে এক শত চৌদ্দ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক প্রাপ্ত হন। ইনি অতি অমায়িক, সদাশয়, ঈশ্বরভক্ত পরম সাধু পুরুষ ছিলেন। ইঁহার রচিত স্তুতিগীতিগুলি অতি উচ্চ শ্রেণীর ভক্তি এবং ঈশ্বরপরায়ণতার পরিচয় প্রদান করে। এই আখ্যায়িকায় ইঁহার রচিত কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, নিম্নে তাহার মর্ম্মার্থ সন্নিবিষ্ট হইল।

৪৭ পৃষ্ঠা :—

বাদসাহা জোর্‌মে মারা দর্ গোজার।
মা গোণাহগারেম্ তু আমর্‌জগার॥

হে রাজন্ (ঈশ্বর), আমাদের পাপ মার্জ্জনা কর, আমরা পাপী, তুমি ক্ষমাকর্ত্তা।

৬৫-৬৬ পৃষ্ঠা :—

তু নে কোকারী ও মা বদ কারদায়েম।
জোর্‌মে বে আন্দাজা বেহদ্ কারদায়েম॥

তুমি পবিত্র, আমরা পাপী এবং অত্যধিক পরিমাণে পাপ কার্য্য করিয়াছি।

বে-গোনাহ্ নাগজাস্ত বর্‌মা ছাআতে।
বা হুজুরে দেল্ না কারদাম তাআতে॥
বর্ দর্ আমদ বান্দায়ে বিগরিখ্‌তা।
আবরুয়ে খোদ বো এস্‌য়াঁ রেখ্‌তা॥

ক্ষণকালের জন্যও আমরা পাপকার্য্যে বিরত ছিলাম না; কায়মনো-বাক্যে কোন উপাসনাও করি নাই।

আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মান হারাইয়া পলাতক ভৃত্য তোমার দ্বারে উপস্থিত।

আন্দরাঁ দম কাজ্ বদন্ জাঁনম্ বুরি।
আজ জাঁহা বাস্যুরে ইমানম্ বুরি॥

যে সময় তুমি আমার দেহ হইতে প্রাণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লইবে, সে সময়ও যেন তোমার প্রতি আমার প্রগাঢ় ভক্তি এবং বিশ্বাস থাকে।

১৯০ পৃষ্ঠা;—

ছালেহা দর কেছক্ এসঁয়া মান্দায়েম্।
হাম্ করিলে নাকশওশয়তাঁ মান্দায়েম॥

বহুকালাবধি কুপ্রবৃত্তি ও সয়তানের সংসর্গে থাকিয়া পাপকার্য্য এবং আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়াছি।

১৯১ পৃষ্ঠা;—

রোজওসব আন্দর মাআছি বুদায়েম।
গাফেল আজ্ আম্রো নায়োহায়ি বুদায়েম্

দিবারাত্রি আজ্ঞালঙ্ঘনে রত ছিলাম বলিয়া আদেশ এবং নিষেধ আজ্ঞার প্রতি দৃষ্টিপাত করি নাই।